Scanned with CamScanner

লেখক পরিচিতি

ড. খোন্দকার আ. ন. ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)
জন্ম: ঝিনাইদহ জেলায় ১৯৫৮ সালে।
মৃত্যু: ১১ই মে ২০১৬।

পিতা মরহুম খোন্দকার আনোয়ারুজ্জামান। মাতা বেগম লুৎফন্নাহার।

ঝিনাইদহ আলিয়া মাদ্রাসায় ফাজিল পর্যন্ত অধ্যয়নের পর ১৯৭৯ সালে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে প্রথম শ্রেণীতে অষ্টম স্থান অধিকার করে হাদীস বিষয়ে কামিল পাশ করেন। সৌদি আরবের রিয়াদস্থ ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৬, ১৯৯২ ও ১৯৯৮ সালে যথাক্রমে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পি-এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন । দেশ ও বিদেশে যে সকল প্রসিদ্ধ আলিমের কাছে তিনি পড়াশোনা ও সাহচর্য গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন খতীব মাওলানা ওবাইদুল হক (রাহ.), মাওলানা মিয়া মোহাম্মাদ কাসিমী (রাহ.), মাওলানা আনোয়ারুল হক কাসিমী (রাহ.), মাওলানা আব্দুল বারী সিলেটী (রাহ.), মাওলানা ড. আইউব আলী (রাহ.), মাওলানা আব্দুর রহীম (রাহ.), আল্লামা শাইখ আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল আযীয ইবন বায (রাহ.), আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান আল-জিবরীন (রাহ.), আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন সালিহ ইবন মুহাম্মাদ আল-উসাইমীন (রাহ.), শাইখ সালিহ ইবন আব্দুল আযীয আল শাইখ, শাইখ সালিহ ইবন ফাওযান ইবন আব্দুল্লাহ আল ফাওযান।

কর্ম জীবনে তিনি কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে হাদীস বিভাগে শিক্ষকতা শুরু করেন ১৯৯৮ সালে। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৬ সালের ১১ই মে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু বরণ করার আগ পর্যন্ত তিনি উক্ত বিভাগে অধ্যাপক পদে কর্মরত ছিলেন।

দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বাংলা ইংরেজী ও আরবি ভাষায় তাঁর প্রায় অর্ধশত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত গবেষণামূলক গ্রন্থের সংখ্যা ত্রিশের অধিক।

গবেষণা কর্মের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন। নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ের লক্ষ্যে ১৯৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি 'আল ফারুক একাডেমী' নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। বিশুদ্ধ ইসলামী জ্ঞান ও মূল্যবোধ প্রচার ও মানব সেবার উদ্দেশ্যে ২০১১ সালে 'আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট' নামে একটি সেবা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন এবং ২০১২ সালে Education and Charity Foundation Jhenaidah নামে একটি শিক্ষা ও সমাজ সেবাসংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ সকল প্রতিষ্ঠান শিক্ষাপ্রচার, ধর্ম প্রচার, দুস্থ নারী ও শিশুদের সেবা ও পুনর্বাসনে বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করছে।

জিজ্ঞাসা ও জবাব

(৩য় খণ্ড)

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স

মোবাইল:০১৭৮৮৯৯৯৯৬৮

dr.khandakerabdullahJahangir sunnahtrust

www.assunnahtrust.com

জিজ্ঞাসা ও জবাব (৩য় খণ্ড)
ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)

সম্পাদনা
শাইখ ইমদাদুল হক

অনুলিখন
সাব্বির জাদিদ

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ২০১৮ ঈসায়ি
সফর ১৪৪০ হিজরি

প্রকাশক
উসামা খোন্দকার
আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট, পৌর বাস টার্মিনাল, ঝিনাইদহ-৭৩০০

প্রচ্ছদ
সাইফ আলি

বিক্রয় কেন্দ্র:
আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঢাকা। মোবাইলঃ ০১৭৮৮৯৯৯৯৬৮
আস-সুন্নাহ টাওয়ার, ঝিনাইদহ। মোবাইলঃ ০১৭৯১৬৬৬৬৬৩, ০১৭৯১৬৬৬৬৬৪
৬৬, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। মোবাইলঃ ০১৭৯১৬৬৬৬৬৫
ফুরফুরা দরবার, দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা। মোবাইলঃ ০১৭৮৮৯৯৯৯২৬

ISBN: 978-984-93633-2-3
হাদিয়াঃ ১৮০ (একশত আশি) টাকা মাত্র।

Jiggasa O Jawab (Volume-3) (Question & Answer) by Professor Dr. Kh. Abdullah Jahangir.(Rahimahullah). First Published by As-Sunnah Publications, As-Sunnah Trust Building, Bus Terminal, Jhenidah-7300 in October-2018.

চেয়ারম্যান এর বাণী

প্রশংসা আল্লাহর এবং সালাত ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবিদের উপর। ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর জীবদ্দশায় বিভিন্ন মাহফিলে ও টিভি চ্যানেলে বহুমানুষের যুগজিজ্ঞাসার জবাব কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রদান করেছেন। তাঁর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি মাহফিলগুলো ভিডিও ক্যাসেটবদ্ধ করতেন। ফলে তাঁর প্রশ্নোত্তর ও বক্তৃতা যেমন সংরক্ষিত রয়েছে; তেমনি তা সংযোজন ও বিয়োজনের হাত থেকেও রক্ষা পেয়েছে। তিনি তাঁর মৌলিক রচনাগুলো যেমন তথ্য নির্ভর করে সাজিয়ে গেছেন, তেমনি তাঁর যুগজিজ্ঞাসার জবাবগুলোও কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে প্রদান করে গেছেন। বর্তমান জটিল জীবনধারায় তাঁর প্রদত্ত বহুজিজ্ঞাসার জবাব মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলকে ইসলামের আলোর পথ দেখাবে বলে আমরা আশা রাখি। বিভিন্ন ভিডিও ক্যাসেট, টিভি চ্যানেল ও ইউটিউবে থাকা তাঁর প্রশ্নোত্তরমালা সংগ্রহ করে *'জিজ্ঞাসা ও জবাব'* নামে সিরিজ আকারে আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স তা প্রকাশ করছে বলে আমরা মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাই। মহান আল্লাহ যেন লেখকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম জাযা প্রদান করেন এবং লেখকের রচনাগুলোকে তাঁর জন্য কবুল করেন। পরিশেষে সকলের নিকট দুআ কামনা করি।

উসামা খোন্দকার
চেয়ারম্যান
আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট

সম্পাদকের কথা

সকল প্রশংসা মহান দয়াময় আল্লাহর নিমিত্ত। সালাত ও সালাম তাঁর বান্দা ও রাসূল, তাঁর হাবীব মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিজন, সহচর ও কল্যাণ কামনায় প্রলয়দিবস পর্যন্ত তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীদের উপর।

আমাদের রব মহান দয়াময়। তাঁর দয়ার অন্যতম নিদর্শন, দুনিয়ার অন্ধকারে কল্যাণপথে চলবার জন্য তিনি আপন বান্দাকে শিক্ষা দিয়েছেন ওহির জ্ঞান এবং আপন শরীআতে জ্ঞানার্জনকে দিয়েছেন সর্বোচ্চ মর্যাদা। বান্দার কথা ও কর্ম, এমনকি চিন্তাকে পর্যন্ত সঠিকভাবে চালিত করবার জন্য জ্ঞানকে করেছেন সকল বিধানের উপর অগ্রগামী। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন বিশ্বমানবতা ছিল ধ্বংস ও সর্বনাশের একেবারে দ্বারপ্রান্তে, যেখান থেকে আর এক পা ফেললেই সে হারিয়ে যাবে চিরপতনের অতল তলে– যদি আমরা চিন্তাশক্তির সবটুকু প্রয়োগ করে মানুষের দ্বারা সম্ভব এমন সকল পাপ ও অপরাধের তালিকা প্রস্তুত করি এবং ইতিহাসের পাতা উল্টে ফিরে যাই খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পৃথিবীতে, তবে সেখানে কোনো একটি জনপদ এমন পাওয়া সম্ভব নয়, যেখানে আমাদের প্রস্তুতকৃত অপরাধ ও পাপের তালিকার কোনো একটি পাপ অনুপস্থিত; সেসময়ে মানবতা যেন নিজেদেরকে ধ্বংস ও সর্বনাশের খেলায় ও নেশায় মেতে উঠেছিল, এই ধ্বংস-উন্মুখ, মুমূর্ষু মানবতাকে মুক্তি ও চিকিৎসার জন্য এই মঙ্গলময় কল্যাণকামী সর্বজ্ঞ সত্তা আমাদের উম্মি নবী ﷺ এর নিকট যে আসমানি ব্যবস্থাপত্র পাঠালেন তার সর্বপ্রথম অবতারণ যে মাত্র পাঁচটি আয়াত, সেখান একটি মাত্র আদেশ 'পড়ো'। এই অবতারণ-দস্তুরই বলে দেয়– মানবতার মুক্তি, সুস্থতা, চিকিৎসা ও সফলতার জন্য 'সর্বস্রষ্টা রবের নামে' পড়ার গুরুত্ব কতটুকু।

পথ-পদ্ধতির ভিন্নতা থাকতে পারে, কিন্তু ইসলামে জ্ঞানার্জনের কোনো বিকল্প রাখা হয় নি। ইমাম বুখারি রাহ. তাঁর *'কিতাবুস সহীহ'*র একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন, 'কথা ও কর্মের পূর্বে জ্ঞানার্জন'। মহান আল্লাহ বলেন, "অতএব তোমাদের জানা না থাকলে যারা জানে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও"।[১] নবীজি ﷺ বলেন, "তোমরা সেভাবে সালাত আদায় করো যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখ"।[২] অতএব পড়া, শোনা ও দেখা– যে কোনো পথ ও পদ্ধতিতে আমাদেরকে জ্ঞানার্জন করতে আদেশ করা হয়েছে।

---

[১] সূরা: [১৬] নাহল, আয়াত: ৪৩; সূরা: [২১] আম্বিয়া, আয়াত: ৭।

[২] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-৬৩১; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস নং-১৬৫৮।

জ্ঞানার্জন তাই মুসলিম উম্মাহর কাছে এক মহান ইবাদত। এই উম্মাহর মনীষী পুরুষগণ জ্ঞানের সন্ধানে ছুটে বেড়িয়েছেন জনপদের পর জনপদ। জ্ঞান তাদের কাছে হারানো সম্পদ, জ্ঞানের অন্বেষায় কদম উঠানো 'আল্লাহর রাস্তা', জান্নাতের সহজতম পথ। মহান আল্লাহ বলেন, "আমি এ উপদেশগ্রন্থ নাযিল করেছি আর আমিই তার সংরক্ষক"।[৩] যেখানে অন্যান্য উম্মাত তাদের নবীদের তিরোধানের সাথেসাথেই বড় অবহেলায় নিজেদের কিতাব হারিয়ে ফেলেছে, বিস্মৃত হয়েছে, অপসারণ ও বিকৃত করেছে, সেখানে মুসলিম উম্মাহ আল্লাহর কিতাব ও নবী ﷺ এর হাদীস অবিকল সংরক্ষণের জন্য সাধ্যের সবটুকু করেছে। এভাবেই মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবের শব্দ, অর্থ ও মর্ম সংরক্ষণ করেছেন। আর চৌদ্দশত বছর পরে এই পতনুম্মুখ কালেও উম্মাতের অসংখ্য সদস্য কুরআন-সুন্নাহর বিধান জেনে জীবনে তা প্রতিপালনের জন্য পাগলপারা। যারা নানান কারণে ইসলামকে অ্যাকাডেমিকভাবে জানার সুযোগ পান নি তারা বিভিন্নভাবে আলিমদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে শরীআত পালনের চেষ্টা করেন। ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহ. ছিলেন এমন অসংখ্য মানুষের জিজ্ঞাসাস্থল।

দিনদুপুরে মেঘমুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে সূর্যের পরিচয় দানের জন্য একটি শব্দও উচ্চারণ করা যেমন বাহুল্য ও বোকামি, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহ.কে পাঠক মহলের কাছে পরিচিত করবার জন্য বাক্য ব্যয় করাও তেমনই। আমরা শুধু মহান আল্লাহর দরবারে সকৃতজ্ঞ শুকরিয়া আদায় করছি, তিনি আমাদেরকে এই সূর্যসম মহান মনীষীর ইলমি খেদমতের সাথে কোনোভাবে শরীক হওয়ার সুযোগ দান করেছেন। আর তাঁর নিকট সকাতর প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদেরকে এই কল্যাণকর্মটি সমাপ্তিতে নিয়ে যাওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন।

পাঠক, *'জিজ্ঞাসা ও জবাব'* সিরিজের যে বইটিতে আপনি এখন চোখ রেখেছেন তা কোনো লিখিত পুস্তক নয়– এর কিছু প্রশ্ন হয়ত লিখিত, যে প্রশ্ন আপনারা বিভিন্ন সময়ে মিম্বারে, ময়দানে ও টিভিতে করেছিলেন। আর জবাবগুলো সবই মৌখিক। তখন স্যার রাহ. আপনাদের জিজ্ঞাসার জবাব আর মুখভরা হাসি নিয়ে আপনাদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। তখন আপনারা ছিলেন শ্রোতা আর এখন পাঠক।

আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো তথ্য প্রেরক আর অনুধাবনকারী হচ্ছে মস্তিষ্ক। এক্ষেত্রে চক্ষু ও কর্ণের বিরোধ সুস্পষ্ট। কানের পাঠানো যে তথ্যগুলো মস্তিষ্কের জন্য সুখকর ও সহজবোধ্য, ঠিক সে তথ্যগুলোই যখন চোখ পাঠায় অবিকলভাবে তখন অনেক সময় তা হয়ে পড়ে বিরক্তিকর ও দুর্বোধ্য। উচ্চসাহিত্যমান সম্পন্ন সুলিখিত কোনো প্রবন্ধ, যার পাঠ আপনাকে মুগ্ধ, মোহিত ও আনন্দিত করেছে, সেটি একই গাঁথুনিতে

---

[৩] সূরাঃ [১৫] হুজর, আয়াতঃ ৯।

যখন কোনো মঞ্চের বয়ান বা ওয়াযে আপনাকে শোনানো হবে আপনি বিরক্ত হয়ে পড়তে পারেন। তেমনি কোনো মঞ্চ কাঁপানো, দর্শক মাতানো বক্তব্য যখন হুবহু লিখিত হয়ে চোখের সামনে আসে তখন তা সম্পূর্ণ অখাদ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। এজন্যই লেখা ও বলার রয়েছে আলাদা আলাদা ধাঁচ।

পাঠক, স্যার রাহ.র হাসিমুখ দেখতে দেখতে যে জবাবগুলো এক সময় আপনারা শ্রবণ করেছেন এখন হতে যাচ্ছেন তার পাঠক। কিন্তু এক্ষেত্রে চক্ষু-কর্ণের বিরোধ যেন আপনার মস্তিষ্ককে পীড়িত না করে সে জন্য আমরা আমাদের সীমা ও সাধ্যের ভেতর থেকে চেষ্টা করেছি। তবে এদিকেও ষোলোআনা খেয়াল রাখা হয়েছে, যেন মূল বক্তব্যের মর্ম কোনোভাবেই ব্যাহত না হয়, আবার বক্তব্যের কথ্য আমেজ হারিয়ে সম্পূর্ণ লেখ্যাকৃতে পরিণত না হয়। আমরা চেয়েছি, এই সঙ্কলনটি পাঠ করতে গিয়ে আপনি একই সাথে পাবেন বক্তব্য শ্রবণ ও প্রবন্ধ পঠনের স্বাদ।

'জিজ্ঞাসা ও জবাব' সঙ্কলনটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নজনের করা প্রশ্নের জবাবের সঙ্কলন হওয়ার কারণে একই প্রশ্নোত্তরের রিপিট হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে একই বিষয়ের একাধিক প্রশ্নের জবাবগুলোতে অতিরিক্ত ভিন্নভিন্ন কিছু তথ্য বা বিষয় থাকলে আমরা সবগুলো প্রশ্নোত্তরই অবিকল রেখে দিয়েছি। তবে এক্ষেত্রে একটি প্রশ্নোত্তরকে মূল রেখে অন্য উত্তরগুলোর অতিরিক্ত উপকারী অংশগুলো তার সাথে বিন্যাস্ত করে দেওয়া যেত। চূড়ান্ত সংস্করণের জন্য আমরা এই চিন্তাটা তুলে রাখছি এবং পাঠকের সুচিন্তিত পরামর্শ কামনা করছি। পাঠকের জন্য সুবিধাজনক ও উপকারী হত প্রশ্নোত্তরগুলো বিষয়ভিত্তিক সাজাতে পারলে। সেজন্য প্রয়োজন প্রশ্নোত্তরের পুরো ভাণ্ডারটা লিখিত হয়ে যাওয়া। তাই এই বিষয়টাও আমরা চূড়ান্ত সংস্করণের জন্য রেখে দিচ্ছি। তবে এ খণ্ডের ভেতরের বিষয়গুলোকে বিষয়ভিত্তিক সাজিয়ে শুরুতে একটা সূচিপত্র সংযোজন করে দেওয়া হয়েছে।

কোথাও কোথাও পাঠক দেখতে পাবেন, প্রশ্নে লিখিত বিষয়ের অতিরিক্ত কিছু পয়েন্ট স্যার উত্তরে আলোচনা করেছেন। প্রধানত তিনটি কারণে এমনটি হয়েছে। টেলিভিশনের লাইভ প্রোগ্রামে স্যার কোনো প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন, তখন হয়ত কোনো দর্শক-শ্রোতা ফোনে প্রশ্ন করলেন। উপস্থাপক প্রশ্নটির কিছু পয়েন্ট ইঙ্গিতে লিখে রাখলেন এবং চলমান প্রশ্নের জবাব শেষ হলে স্যারকে তার লেখা ইঙ্গিতের আলোকে প্রশ্নটি করলেন। কিন্তু কোনো পয়েন্ট হয়ত বাদ পড়ে গেছে। যেটা স্যার নিজের স্মৃতি থেকে জবাব দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের লিখিত প্রশ্নে আসে নি। স্যারকে লিখিতভাবে প্রশ্ন করলে সবসময় তিনি পুরোটা প্রশ্ন শব্দ করে পড়তেন না, কিন্তু জবাব দিতেন। প্রশ্নের সেই নিঃশব্দে পঠিত অংশ আমরা লিখতে পারি নি। কেননা আমরা তো লিখেছি রেকর্ড থেকে শুনে। আবার কখনো স্যার রাহ. মনে করেছেন, এই প্রশ্নের মৌলিক জবাবের সাথে অতিরিক্ত কিছু কথা না বললে শ্রোতার

জন্য বিষযটি বোঝা কষ্টকর হবে অথবা শ্রোতা ভুল বুঝতে পারেন। কখনো তিনি প্রশ্ন শুনে ভেবেছেন, সমাজে এ সম্পর্কে ব্যাপক ভুল ধারণা বিদ্যমান। যে কারণে শুধু প্রশ্নের উত্তরটুকু যথেষ্ট নয়। তখন তিনি অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় কথা বলে সমাজের ভ্রান্তি দূর করতে চেয়েছেন। কেননা পর্দার সামনে শুধু একজন প্রশ্নকর্তা নয়, বরং সেখানে বসে আছে গোটা একটি সমাজ।

সাধারণতই লিখিত বক্তব্যের মতো মৌখিক বক্তব্য উদ্ধৃতিসমৃদ্ধ হয় না। তবে স্যার রাহ. এক্ষেত্রে ছিলেন অনেকটা ব্যতিক্রম। এসব প্রশ্নের মৌখিক জবাবেও যথেষ্ট কোটেশন তিনি উল্লেখ করেছেন। তবে সাধারণত রেফারেন্স দেন নি। আমরা তাঁর উদ্ধৃতিগুলোর পাশে রেফারেন্স সংযুক্ত করে দিয়েছি। তবে তার অর্থ এই নয় যে, উদ্ধৃতিটি শুধু আমাদের উল্লেখিত রেফারেন্স গ্রন্থের মাঝেই সীমাবদ্ধ, এছাড়াও এক বা একাধিক গ্রন্থে তা থাকতে পারে।

বিভিন্ন হাদীসের বইয়ের একাধিক অনুবাদ বাজারে আছে। সেসব অনুবাদের একটার সাথে আরেকটার হাদীস নাম্বারের অনেক অমিল রয়েছে। তাই পাঠক, বাজারের যেকোনো অনুবাদ হাতে নিয়ে যদি আমাদের উদ্ধৃতির সাথে মেলাতে যান হয়ত মিলবে না। আমরা হাদীসের মতন ও নাম্বার সংযোজন করেছি *'মাকতাবা শামিলা'* থেকে। একই হাদীস যখন একাধিক সঙ্কলক তাদের নিজনিজ সঙ্কলনে বা একই সঙ্কলক তার কিতাবের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করেছেন সেক্ষেত্রে শব্দের তারতম্য ঘটেছে এবং কোথাও অংশবিশেষ, কোথাও পূর্ণ হাদীস উল্লেখিত হয়েছে। পাঠক সাধারণকে কোটেশন মেলানোর ক্ষেত্রে এই বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে।

কুরআন-হাদীসের কোটেশন উল্লেখ করে স্যার রাহ. সর্বত্র হুবহু অনুবাদ করেন নি। আগে বা পরের বক্তব্যের মধ্যে মর্ম উল্লেখ করেছেন। আমরাও সবক্ষেত্রে অনুবাদ সংযোজনের প্রয়োজন মনে করি নি। কোথাও সংযোজন করলে তা তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে রেখেছি। পাঠক দেখতে পাবেন, তিনি কখনো পূর্ণ কোটেশন উল্লেখ করে অংশবিশেষের অনুবাদ বা মর্ম উল্লেখ করেছেন, আবার কখনো আয়াত বা হাদীসের অংশবিশেষ উল্লেখ করে সম্পূর্ণ অনুবাদ বা মর্ম উল্লেখ করেছেন। আমরাও তেমনই রেখে দিয়েছি। তবে দুআর ক্ষেত্রে স্যার যেখানে আংশিক বলে ইঙ্গিত করে থেমে গেছেন, পাঠকের সুবিধার্থে আমরা সেখানে হাদীসের কিতাব থেকে পূর্ণ দুআ সংযোজন করে দিয়েছি।

স্যার রাহ. ছিলেন অত্যন্ত শরীফ তবিয়তের মানুষ। ছোটবড়, দূরের, কাছের সবাইকেই 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন এবং হাসি মুখে কথা বলতেন। কিন্তু পাঠক, দেখবেন অনেক জবাবের ক্ষেত্রে স্যার প্রশ্নকর্তাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন

করেছেন। তিনি এমনটি করেছেন যখন বুঝতে পেরেছেন, এই প্রশ্নকর্তা তাঁর ছাত্র বা সন্তানতুল্য অত্যন্ত স্নেহভাজন কেউ।

উলামা ও আয়িম্মায়ে কিরামের প্রশ্নোত্তর সঙ্কলনের ধারা অনেক প্রাচীন। অনেকেরই প্রশ্নোত্তর সঙ্কলিত হয়ে উম্মাতের কাছে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে এবং ইলমি আকাঙ্ক্ষার পিপাসা মিটিয়েছে। তার ভেতর শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রাহ.র *'মাজমুউল ফাতাওয়া'* সমাদর, গ্রহণযোগ্যতা ও উপকারিতায় অনন্য। ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহ. যে দরদ ও কল্যাণেচ্ছা নিয়ে দাওয়াতের ময়দানে ছুটে বেড়িয়েছেন এবং উম্মাতের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছেন, আমাদের আশা, মহান আল্লাহ তাঁর এ প্রশ্নোত্তর সঙ্কলনকেও সমাদৃত, উপকারী ও দীর্ঘস্থায়ী করবেন।

'জিজ্ঞাসা ও জবাব' সিরিজির এখণ্ডটির শ্রুতিলিখন করেছে স্নেহাস্পদ ***সাব্বির জাদিদ*** আর এর সম্পাদনায় আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে ***আল মাসুদ আব্দুল্লাহ***। মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন দয়া করে এ সঙ্কলনটির ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করে কবুল করে নেন। একে অনুলেখক, সম্পাদক, ব্যবস্থাপক, প্রকাশক, শুভাকাঙ্ক্ষী ও পাঠক- সকলের নাজাতের ওয়াসীলা বানিয়ে দেন। একাজের মূল ব্যক্তিত্ব ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহ.র সকল উত্তম কর্মকে কবুল করেন, তাকে উম্মাতের জন্য কল্যাণকর করেন, তাঁর সকল ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করে আপন রহমতের কোলে আশ্রয় দেন, তাঁর প্রিয় বান্দাদের সর্বোচ্চদের কাতারে শামিল করে নেন এবং আমাদেরকে জান্নাতে তাঁর সাথে একত্রিত করেন। আমীন! সালাত ও সালাম আল্লাহর খলীল ও হাবীব মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিজন ও সহচরগণের উপর।

ইমদাদুল হক
মাদরাসাতুত তাকওয়া
আনন্দধাম, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।

সূচিপত্র

ঈমান/আকীদা

প্রশ্ন-০১: 'নিশ্চয় যারা ঈমান আনার পর পুনরায় কুফরিতে ফিরে যায় তাদের তাওবা কখনোই কবুল হবে না'– এদের জন্য কি কোনো মাসআলা আছে?

উত্তর: এটা কোনো ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করা যাবে না। কেউ ঈমান আনে কুফরি করে, আবার ঈমান আনে কুফরি করে, এতে প্রাকৃতিকভাবে তাদের মধ্যে কুফরিটা বেড়ে যায়। আবার ওইরকম মানুষের ব্যাপারেও আল্লাহ বলেছেন, তাদের তাওবা কবুল করবেন।

প্রশ্ন-০২: মুহাম্মাদ ﷺ বিশ্বনবী কি না? কুরআনের (দাবি) অনুসারে তিনি যদি বিশ্বনবী হয়ে থাকেন তাহলে রিসালাতের দায়িত্ব নিয়ে তিনি কোন কোন দেশে গেছেন?

উত্তর: বিশ্বনবী হতে গেলে সব দেশে যেতে হবে? তাহলে বিশ্বনবী কে? বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি কয় দেশে গেছেন? যিশুখ্রিস্ট কোনো দেশে যান নি, কোনো লোকে যান নি, ইতিহাসে তার নাম নেই, কেউ চেনে না। বিশ্বের কোনো ইতিহাসে নেই। এমনকি খ্রিস্টানরা বলে, এই নামে কেউ ছিলই না। এটা কাল্পনিক। একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশ্বনবী। কুরআন বারবার বলেছে, তিনি বিশ্বের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। এবং তিনিই একমাত্র নবী, যিনি তার জাতির বাইরে অন্যদের কাছে দাওয়াত পাঠিয়েছেন।
তখনকার দিনের বিশ্ব কী ছিল? একটু পড়াশোনা করেন। তখনকার দিনের বিশ্ব ছিল ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা। ইউরোপ শাসন করত রোমান সাম্রাজ্য। পরে ভেঙে দুটো হয়। ওটায় আর যাব না। আফ্রিকার ভেতর পুরোটা জঙ্গল, শুধু আফ্রিকার শেষ মাথায় উত্তরে এসে মিশরটা ছিল সভ্য। আর এশিয়া মহাদেশের ভেতর পারস্য থেকে চীন, ভারত পর্যন্ত সভ্যতা ছিল। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহই একমাত্র মানুষ, একমাত্র নবী, যিনি নিজের জাতির বাইরে রোমান সম্রাটের কাছে, অর্থাৎ ইউরোপে দাওয়াত পাঠিয়েছেন। আফ্রিকায় দাওয়াত পাঠিয়েছেন। চিঠি দিয়ে লোক পাঠিয়েছেন মিশরের বাদশাহর কাছে। চীন থেকে ভারত পর্যন্ত এশিয়ার মূল ক্ষমতা যার হাতে ছিল, সেই পারস্যের সম্রাটের কাছে দাওয়াত পাঠিয়েছেন। আর কাউকে দেখান তো? নেই। তিনি বিশ্বনবী এবং নবুওয়াতের দায়িত্ব তিনি পালন করে গেছেন। বাকিটা আমাদের দিয়ে গেছেন। বিশ্ব বড় হবে আমরা দাওয়াত দেব। আর কেউ নিজের জাতির বাইরে, বিশ্বের সকল মহাদেশে দাওয়াত পাঠান নি। যিশুখ্রিস্ট যান নি। বরং যিশুখ্রিস্ট উল্টো বলেছেন। তিনি বলেছেন, আমার

জাতি বনী ইসরাঈল ছাড়া সবাই শিয়াল-কুকুর। তাদেরকে দাওয়াত দেয়া যাবে না। এটা ইঞ্জিলের কথা বলছি। আমি বানিয়ে বলছি না।

প্রশ্ন-০৩: রাসূলুল্লাহ ﷺ বিচারের দিনে সুপারিশ করতে পারবেন কি না? কুরআন থেকে জবাব দেবেন।

উত্তর: কুরআন থেকেই দিতে হবে? ইঞ্জিল থেকে দিলে সমস্যা কী? এটাও খ্রিস্টানরা প্রচার করে। খ্রিস্টানরা প্রচার করে যে, মুহাম্মাদ ﷺ পাপী। 'নাউযুবিল্লাহ' একজনও বললেন না! কাজেই উনি পাপীদের সুপারিশ করতে পারবেন না। আর ঈসা মসীহ নিষ্পাপ। উনি সুপারিশ করবেন। অথচ আমি চ্যালেঞ্জ করব, তোমরা যে কেউ কুরআন থেকে প্রমাণ করো যে, মুহাম্মাদ ﷺ একটা গোনাহ করেছেন, মিছে কথা বলেছেন, জিনা করেছেন, মদ খেয়েছেন, পরের হক নষ্ট করেছেন, পরের গরু চুরি করেছেন, পরের গাছ পুড়িয়ে দিয়েছেন- একটা পাপ প্রমাণ করো, আমি তোমাকে হাজার কোটি টাকা দেব। আর আমি তোমার এই ইঞ্জিল শরীফ দিয়ে প্রমাণ করব, তোমাদের যিশুখ্রিস্ট, আমাদের ঈসা মসীহ নয়, তোমরা তাঁর নামে যে জাল কিতাব বানিয়েছ, সেই ইঞ্জিল শরীফ দিয়ে প্রমাণ করব যে, যিশুখ্রিস্ট মিথ্যা কথা বলেছে, যিশুখ্রিস্ট বেশ্যা মেয়েদেরকে জড়াজড়ি করতে দিয়েছে, যিশুখ্রিস্ট পরের দ্রব্য নষ্ট করেছে, দুইহাজার প্রাণি একবারে মেরে ফেলেছ, পরের গাছ পুড়িয়ে মেরেছে, গালাগালি দিয়েছে, মদ খেয়ে মাতাল হয়ে কাপড় খুলেছে। নাউযুবিল্লাহ। এটা ইঞ্জিলে আছে।

দুটো উদাহরণ দিই। মনে করেন, এই যে আম গাছগুলো দেখছেন, আম ধরে কখন? কার্তিক মাসে কি আমগাছে আম থাকে? থাকে না। বাংলাদেশের কোনো শিক্ষিত-অশিক্ষিত-মূর্খ লোক কার্তিক মাসে আম পাড়তে গাছে উঠবে? উঠবে না। তো এখন, ইঞ্জিল শরীফে বলা হচ্ছে, ঈসা মসীহ জেরুসালেমে যাচ্ছেন, খুব খিদে লেগেছে। দেখলেন যে ডুমুর গাছ। মনে করেন আমগাছ। ইঞ্জিলেই লেখা হচ্ছে তখন আমের সময় নয়। অসময়। তবুও আম পাওয়া যায় নাকি দেখতে গেলেন। যেয়ে দেখেন যে আমগাছে আম নেই। ডুমুর গাছে ডুমুর নেই। তখন বদদুআ দিয়ে গাছটা পুড়িয়ে মেরে ফেললেন। এটা ভালো কাজ হল, না খারাপ কাজ হল? যদি কোনো খ্রিস্টান বলেন যে ভালো কাজ, তাহলে আমরা পেট্রোল ঢেলে উনার গাছটা পুড়িয়ে দেব। প্রথম কথা হল, কার্তিক মাসে আম না থাকায় আমের কোনো দোষ আছে? আমগাছে আম না থাকায় আমগাছের কোনো দোষ আছে কি না? নির্দোষ একটা জিনিসকে পুড়িয়ে মেরে ফেলা কোনো ভালো কাজ না। গাছটার যদি কোনো মালিক থাকে, তাহলে মালিকের ক্ষতি করল। মালিকের না হয়ে যদি জঙ্গলের গাছ

হয়, তারপরেও গাছটা বেঁচে গেলে পশুপাখি ফল পেত। ঠিক না? মানুষ ফল পেত। আল্লাহর কত সৃষ্টি উপকার পেত। তো বিনা অপরাধে একটা গাছ পুড়িয়ে ফেলা অনেক সাওয়াবের কাজ, ঠিক না বলেন?! যদি কোনো খ্রিস্টান বলেন সাওয়াবের কাজ, তাহলে আমরা তার বাড়ির সব গাছ পোড়ায়ে দিতে রাজি। সাওয়াব বেশি হবে।

ইঞ্জিলের আরেকটা বর্ণনা: যিশুখ্রিস্ট যাচ্ছেন পথ দিয়ে, একজন জিনে ধরা পাগলের সাথে দেখা। উনি জিন তাড়ানোর জন্য ফুঁ দিলেন। তার ঘাড়ে নাকি অনেকগুলো জিন ছিল। জিনগুলো বলল, হুযুর, আপনি পারমিশন দেন, ওই যে ওখানে দুইহাজার শুয়োর চরছে– শুয়োর কিন্তু খ্রিস্টানদের কাছে হারাম নয়– আমরা ওই শুয়োরগুলোর কাছে যাব। তিনি বললেন, যাও। তখন ওই পাগলের মাথা থেকে ভূতগুলো বেরিয়ে শুয়োরের ভেতরে চলে গেল। সঙ্গেসঙ্গে দুইহাজার শুয়োর লাফাতে লাফাতে সাগরে গিয়ে লাফ দিলে মরে গেল। আর যারা মালিক ছিল, ভয়ে পালিয়ে গেল। তো একজন মানুষের দুইহাজার শুয়োর মেরে ফেলা সাওয়াবের কাজ না গোনাহের কাজ? যদি সাওয়াবের কাজ হয়, তাহলে আমরা খ্রিস্টান ভাইদের বাড়িতে যেয়ে গরু-ছাগল মেরে আসব। যদি তারা রাজি হয় তাহলে আমরা আরেকটু ভালো কাজ করতে পারি। মেরে খেয়ে নেব। মেরে ফেলে দেয়ার চেয়ে তো খাওয়া ভালো কাজ, আপনারা কী বলেন? ভূত যদি ছাড়াতে হয়, তাহলে ভূতটা তাড়িয়ে দেয়া যেত না? দুইহাজার প্রাণ হত্যা করার কী দরকার ছিল? এমন আরো অগণিত বিষয় আছে। ঘটনা হল, জাল জিনিস বানালে মিছে কথা হয়-ই। তারা যখন লিখেছে, ভেবেছে এটা খুব ভালো কারামতির ব্যাপার। কিন্তু আসলে যে এগুলো যিশুখ্রিস্টকে বেইজ্জত করছে, তখন বুঝতে পারে নি।

কুরআন কারীমে খুব স্পষ্টভাবে আছে, সূরা নিসার ভেতরে:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

মানুষেরা যদি গোনাহ করে, অন্যায় করে রাসূলের কাছে মাফ চায়, রাসূলও তাদের জন্য মাফ চায়, আল্লাহ তাদেরকে মাফ করবেন।[১] তো রাসূলের সুপারিশ আল্লাহ কবুল করবেন, না করবেন না? আল্লাহ কি বলেছেন, শুধু দুনিয়াতে করবেন, আখিরাতে করবেন না? বলেন নি। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ তাঁকে (রাসূলকে) দুনিয়ার চেয়ে আখিরাতে শ্রেষ্ঠ মাকাম দেবেন। মাকামে মাহমুদ।

তৃতীয় বিষয় হল, খ্রিস্টানরা বলে, কুরআনে আছে, মুনাফিকরা মারা গেলে, আল্লাহ বলেছেন, ওদের জন্য দুআ কোরো না। ওদের ঈমান নেই। কাজেই ওদের জন্য

---

[১] সূরা: [৪] নিসা, আয়াত: ৬৪।

সত্তর বার দুআ করলেও আমি গ্রহণ করব না। খ্রিস্টানরা এটা দেখিয়ে বলবে, এই দেখো, মুহাম্মাদ ﷺ সত্তরবার দুআ করলেও আল্লাহ নেবেন না সেটা। সে তো মুনাফিক, ওর ঈমান নেই, তাই আল্লাহ নেবেন না। আর ইঞ্জিলে আছে, ঈসা মসীহ বলছে, কিয়ামতের দিন অনেকে আমার কাছে আসবে, যারা আমাকে দুনিয়াতে রাব্বি রাব্বি বলেছে, হুযুর হুযুর বলেছে, তারা আসবে। তারা এসে বলবে, হুযুর আমাদের তরায়ে নেন। আমি বলব, আমি তোমাদের চিনি না। আমি পারব না। তারা বলবে, হুযুর, আমরা আপনার নামে অনেক কারামতি দেখিয়েছি। জীবনভর আপনার ধর্ম প্রচার করেছি। তিনি বলবেন, না, পারব না। আমার মালিক আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে গেলে কারোর কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই।

প্রশ্ন-০৪: রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে জগতবাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছিলেন কি না? নবীজির কাছ থেকে জগতবাসী কী রহমত পেয়েছে, কুরআন থেকে বলতে হবে।

উত্তর: কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, মুহাম্মাদ ﷺ রহমতস্বরূপ। আর ইঞ্জিলে ঈসা মসীহ বলছেন, আমি গযব। সেই ইঞ্জিলওয়ালারা এসে দাবি করছে যে, মুহাম্মাদ ﷺ রহমত নয়। মুহাম্মাদ ﷺ থেকে রহমতের কী আমরা পাই নি? খুব ভালো করে বোঝেন, অসভ্যতা, বর্বরতা থেকে মানবতা মুক্তি পেয়েছে মুহাম্মাদ ﷺ এর মাধ্যমে। আপনারা ভালো করে মানবতার ইতিহাস পড়েন। যিশুখ্রিস্ট নামে যে কেউ ছিল, ইতিহাসে নেই। পুরো মানব জাতি, বিশ্বজগত তার থেকে কিচ্ছু পায় নি। শুধু বিশ্বাস করতে হবে, তিনি আমাদের রক্ত নিয়ে মরে গেছেন। তাহলে বেঁচে যাবে। কোনো আদর্শ, চরিত্র, কর্ম, সততা– কিছুই পায় নি। বরং বাইবেলে যুলুম, অন্যায়, পাপের সমর্থন করা হয়েছে। একটা নবী কেন আসেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আসলেন, সারা বিশ্বে মানুষের ভেতরে যে যুলুম অনাচার ছিল, সেগুলো তাঁর মাধ্যমে দূর হয়েছে। শান্তির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে তাঁর মাধ্যমে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি প্রতিটি মানুষকে রহমত দিয়েছেন। রহমতের মালিক তো আল্লাহ। কিন্তু পাইতে গেলে একটা পথ লাগবে। সেই পথটা হলেন মুহাম্মাদ ﷺ। কীভাবে?

একজন যুবকের জন্য মডেল আছে। তিনি মুহাম্মাদ ﷺ। একজন যুবক কেমন হবে, তার মডেল আছে। একজন স্বামী কেমন হবে, তার মডেল আছে। একজন শাসক কেমন হবে, তার মডেল আছে। একজন কর্মচারী কেমন (হবে), তার মডেল আছে। একজন সংসারী কেমন হবে, তার মডেল আছে। এই মডেল বা আদর্শগুলোই হল রহমত। এর মাধ্যমে রহমত পাবে। জগতবাসী প্রথম রহমত পেয়েছে, বিশ্ব থেকে যুলুম উঠে গেছে।

মানবতার ইতিহাস পড়েন। রোমান সাম্রাজ্যে, মিসরে, পারস্যে– সারাবিশ্বে কী যুলুম ছিল, আর সেই যুলুম থেকে বাঁচার জন্য স্পেন থেকে চীন পর্যন্ত মানুষেরা কীভাবে মুসলিমদের জন্য বসে ছিল, পড়লে পাবেন। বিশ্বাস করেন, আমার দেশে, আমার দেশে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা যে শান্তিতে আছে, ভারতে তা নেই। ভারতে কোনো শূদ্রহিন্দু যদি কোনো উচ্চ হিন্দুকে স্পর্শ করে, তাহলে ওই উচ্চ হিন্দু নাপাক হয়ে যায়। কোনো মন্দির স্পর্শ করে, মন্দির নাপাক হয়ে যায়। এই জন্য দূরে সরে থাকতে হয়। এই রকম ঘটনা ভারতে অনেক ঘটে। একজন শূদ্রের শিশু মন্দিরে ঢুকেছে, মন্দির নাপাক করার অপরাধে ওই শিশুকে মেরে ফেলা হয়েছে। সরকারি আইনে কোনো পার্থক্য নেই, বৈষম্য নেই। কিন্তু সমাজে আছে। স্কুলে শূদ্রের ছেলেও পড়ে ব্রাহ্মনের ছেলেও পড়ে। কিন্তু পানি খাওয়ার ব্যবস্থা হল, শূদ্রের ছেলে পানির কলস বা গ্লাসে হাত দিতে পারবে না। স্যারের কাছে চাইবে, স্যার মগ ভরে দেবে, মগ স্পর্শ ছাড়া ও হা করে খাবে। এখন এক শূদ্রের ছেলে কাউকে পায় নি, পিপাসা লেগেছে, মগে হাত দিয়েছে। মগ নাপাক করার কারণে তাকে খুন করা হয়েছে।

আপনি মানবতার রহমত পেতে চান! আপনি আমার **কিতাবুল মোকাদ্দস** বইটা পড়েন। ধর্মের নামে বিগত দুইহাজার বছরে খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীরা– পাগল হয়ে যাবেন– অন্তত কয়েক কোটি মানুষকে জীবন্ত হত্যা করেছে। আপনি ইন্টারনেটে যাবেন, দেখবেন, কলম্বাস যখন আমেরিকায় গেল– ছবিও আছে, চাইলে ছবিও দেখতে পারবেন– কলম্বাস যখন আমেরিকায় গেল, তখন কলম্বাস ও তার সাথীরা বাইবেল নিয়ে গেল। ওই দেশে যারা রেড ইন্ডিয়ান, তাদেরকে বলল, খ্রিস্টান হতে হবে। ওরা তো বোঝে না। যারা খ্রিস্টান হল না, ওদেরকে ধরে ধরে ফাঁসি দেয়া হত। তবে ফাঁসির দড়িটা এমনভাবে বাঁধা হত, পা'টা মাটির কাছাকাছি রাখা হত। যেন মরে, আবার মরে না। মরে আবার মরে না। ঝুলে আছে, মরে যাচ্ছে, পা মাটিতে লাগছে, ওরা পা সরিয়ে দিচ্ছে। এটা আমার কথা নয়, খ্রিস্টানদের লেখা ব্লগে আছে। আমার কাছে গেলে আমি দেখাব। আধমরা মানুষগুলোকে পেট চিরে চিরে, পা কেটে কেটে, জিভ কেটে কেটে, জীবন্ত মানুষকে আযাব দিয়ে দিয়ে তারা হত্যা করেছে। অপরাধ– তুমি কেন খ্রিস্টান হলে না! True faith বা সত্যধর্ম গ্রহণ করলে না কেন! ইনকুইজিশন (Inquisition) পড়েন, ক্রিশ্চিয়ানাইজেশন (Christianization) পড়েন, উইকিপিডিয়াতেই পাবেন। আমি মুসলিমদের লেখা বই পড়তে বলছি না। এই হিংস্রতা, পাশবিকতা বন্ধ করেছেন একমাত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ।

খ্রিস্টান বিশ্বাস অনুযায়ী হিটলারও যে জান্নাতে যাবে, মাদার তেরেসাও কিন্তু সেই

জান্নাতে যাবে। কারণ তাদের মতে জান্নাতে যেতে তো কোনো আমল লাগে না। শুধু 'বিশ্বাস' থাকলেই হয়। তবে হিটলার কিন্তু বড় ভালো কাজ করেছে। সে সত্তরলক্ষ নিরপরাধ ইয়াহুদিকে গ্যাস চেম্বারে পুড়িয়ে লাশ পর্যন্ত পুড়িয়ে ফেলেছে। এবং খ্রিস্টান পাদ্রীরা এটাকে সমর্থন করেছে- ইয়াহুদিদেরকে মারতে হবে। ইয়াহুদিরা আমাদের যিশুখ্রিস্টকে মেরেছিল। কথা বোঝেন নি? কালকে আসবেন, আমি আপনাকে দেখাব ইন্টারনেটে। এই যে বর্বরতা, পাশবিকতা, এর কোনো নমুনা পাবেন না মুসলিমদের দেশে। খারাপ মুসলিমদের দেশেও, যাদেরকে সবাই খারাপ বলে, সেখানেও ধর্মের জন্য কোনো অমুসলিমকে মারা হয় নি। অন্য ধর্মের মানুষদেরকে মুসলিম না হওয়ার কারণে ফাঁসিতে ঝোলানো হয় নি। এমন কোনো নমুনা নেই। খুব ভালো করে বোঝেন। বর্তমান যুগে সবচে' খারাপ বলা হত তালেবানদেরকে। তাই না? বর্বর, জঙ্গি কতকিছু বলেছে। সেই তালেবানদের জেলখানায় থেকে গেছে যেসব খ্রিস্টান, তারা দেশে গিয়ে মুসলিম হয়েছে। জেলখানায় থেকেছে, কিন্তু তালেবানরা অন্তত শরীআহবিরোধী কোনো আচরণ তাদের সাথে করে নি।

তো এই জন্য ভাইয়েরা, রাসূলুল্লাহ ﷺ কী রহমত দিয়েছেন মানবতার জন্য, আল্লাহ তো বলেই দিয়েছেন:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

আমি আপনাকে মহাজগতের জন্য রহমত হিসেবে পাঠিয়েছি।[২] এই রহমত এখনো আছে। মুহাম্মাদ ﷺ এর আদর্শ, তাঁর চরিত্র, তাঁর আখলাক, তাঁর দীন-বিশ্বাস মানুষের ভেতরে যত বেশি আসবে, তাঁর রহমত তত প্রস্ফুটিত হবে। যে ব্যক্তি যতবেশি নেবে, সে তত রহমত পাবে। তাঁর মডেল, তাঁর আদর্শ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত আছে। তিনি ছাড়া আর কারো মাধ্যমে মানব জাতি এই রহমত পায় নি। আপনি চাইলে অন্য নবী বলেন, যে কোনো ধর্ম বলেন, ইতিহাস বলেন, আপনি আসবেন, ইনশাআল্লাহ, বিস্তারিত আমি দেখাব।

প্রশ্ন-০৫: কুরআন অনুসারে মুহাম্মাদ ﷺ মানব জাতির জন্য প্রেরিত রাসূল। আবার কুরআনে আছে তিনি কওমের রাসূল। মক্কা ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের রাসূল। তিনি উম্মিদের নবী। তাহলে কুরআনের বর্ণনা সাংঘর্ষিক হয়ে গেল না?

উত্তর: এটাও খ্রিস্টানরা বলে বেড়ায়। কুরআনে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশ্বনবী। কুরআনে কোথাও নেই- আমি কেবলমাত্র আমার জাতির জন্য। ইঞ্জিলে আছে, ঈসা

---

[২] সূরা: [২১] আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭।

মসীহ বলছেন, আমি কেবলমাত্র আমার জাতির জন্য। কিন্তু কুরআনে কোথাও নেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি শুধু, কেবলমাত্র আমার জাতির জন্য। আমার দাওয়াত শুরু হবে কী দিয়ে? আমার জাতিকে আগে দেব নাকি আগে অন্য জায়গায় যাব? কুরআনে আছে, তুমি উম্মুল কুরা এবং তার পার্শ্ববর্তী লোকদের দাওয়াত দেবে। এটা হল ইসলামের বিশ্বজনীনতা। প্রথমে মক্কা এবং তার চারিদিকে দাওয়াত দেবে। এটা প্রমাণ করে, রাসূল ﷺ এর ধর্ম বিশ্বধর্ম। কারণ দুনিয়াটা মক্কার চারিদিকে সমান। একটু ভালো করে ভূগোলটা দেখেন। মক্কার পশ্চিমে ইউরোপ। পূর্বে এশিয়া। দক্ষিণে আফ্রিকা। উত্তরে সাইবেরিয়া। বিশ্বের মিডিল। উম্মুল কুরা। সারা বিশ্বের সব জনপদের কেন্দ্র হল মক্কা। মক্কার নিচে চলে যান, মহাসাগর। মানুষ নেই। কাজেই উম্মুল কুরা থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দাওয়াত শুরু হবে এবং তার চারিপাশে। এভাবে সারা বিশ্ব ঘিরে নেবে। যে কোনো জিনিস শুরুর একটা জায়গা থাকে। এরপরে সব জায়গায় যাবে। কুরআনে বলা হচ্ছে, উম্মুল কুরা এবং তার আশেপাশে দাওয়াত দিতে হবে। তাহলে আশেপাশে বলতে কি আশপাশের ১০ মাইল? ৫০ মাইল? ১০০ মাইল? ২০০ মাইল? এমন কথা কি কুরআনে আছে? এর বিপরীতে দেখেন, ইঞ্জিলে ঈসা মসীহ বলছেন, আমি আমার জাতি বনী ইসরাঈল ছাড়া আর কারো জন্য প্রেরিত হই নি।[৩] এবং এখানে আরেকটা জিনিস আছে। সেটা হল, কম্যুনালিজম। বংশ। তোমরা দাওয়াত দেবে শুধু বংশ দেখে। ব্লাড দেখে দাওয়াত দেবে। আর ইসলাম বলছে, উম্মুল কুরা এবং তার চারপাশে দাওয়াত দিতে হবে। কুরআনে কোথাও নেই আরবদের ডাকবে বা অনারবদের ডাকবে– কোথাও নেই। মানুষকে ডাকবে। এবং মক্কা থেকে শুরু করে চারিদিকে শুধু বাড়তেই থাকবে, বাড়তেই থাকবে। কাজেই কেউ যদি বলে মক্কা এবং তার চারিদিকে... চারিদিকে ৩ মাইল না ৩০ মাইল লেখা আছে নাকি? এটাই তো ইসলামের বিশ্বজনীনতা। ইসলাম তো বলে নি যে মক্কার বাইরে যেতে পারবে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশ্বজনীন এটাও কুরআনে স্পষ্ট বলা আছে। তার দাওয়াত উম্মাল কুরা থেকে শুরু হয়ে সারা বিশ্বের জন্য, এটাও কুরআনে বলা হয়েছে। পূর্বের সকল নবী তাঁর জাতির জন্য ছিলেন। এর বাইরে কাউকে দাওয়াত দেয়ার দাবিই করেন নি। যিশুখ্রিস্ট বারবার বলেছেন, আমি আমার জাতির জন্য। আর কাউকে দাওয়াত দেব না। ফুঁকও দেব না। এক মহিলা, সে বনী ইসরাঈলের নয়, ইঞ্জিলের ঈসা মসীহর বংশের নয়, আরবের মহিলা, তার মেয়েটাকে ভূতে ধরেছে; তো যিশুখ্রিস্টকে বললে ভূত চলে যায়, মহিলা এসে কাঁদছে– হুযুর, আমার মেয়েটাকে

---

[৩] Matthew 15:24 (KJV)

ভূতে ধরেছে, আপনি একটু দুআ করেন, ভূতটা সেরে যাক। যিশুখ্রিস্ট কথা বললেন না। মেয়েটা খুব কান্নাকাটি করছে। তখন শিষ্যরা বলল, হুযুর, ওকে একটু ফুঁ দিয়ে দেন না! তিনি বললেন, না। আমি বনী ইসরাঈলের হারানো মেষপাল ছাড়া আর কারো জন্য প্রেরিত হই নি। দীনের দাওয়াত দূরের কথা, তাবীয-কবয, দুআ-দরূদও অন্যদেরকে দেয়া যাবে না। এরপর ওই মেয়েটা আরো কাঁদছে। তখন উনি বললেন:

It is not meet to take the children's bread, and to cast it to dogs.

নিজের সন্তানদের রুটি নিয়ে কুত্তার দেয়া ঠিক নয়।[8] তার মানে বনী ইসরাঈল হল ঈশ্বরের সন্তান। আর বাকিরা হল কুত্তা। কাজেই দীনের দাওয়াত, দুআ-তদবীর, ফুঁ দিয়ে জিন খেদানো– কোনো সুবিধাই ওদের দেয়া যাবে না। এরা দাবি করে বিশ্বজনীনতা! অন্য ধর্ম, ভারতীয় ধর্মেও অন্যদেরকে– ব্রাহ্মান, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, বৈশ্য– এদের বাইরে অন্য কাউকে হিন্দুধর্মে ঢুকানোর কোনো সুযোগ নেই। তাদের বিশ্বজনীনতার কোনো সুযোগ নেই। কেউ দাবি করেও না।

প্রশ্ন-০৬: রাসূলুল্লাহ ﷺ নূরের তৈরি কি না?

উত্তর: জি না। এটা কুরআন-হাদীসে কোথাও নেই। এটা খ্রিস্টানদের অতিভক্তি থেকে নেয়া। যিশুখ্রিস্ট নূরের তৈরি, এটা কোথাও নেই। যিশুখ্রিস্ট গায়িব জানতেন, এটা কোথাও নেই। যিশুখ্রিস্ট ঈশ্বর, এটা ইঞ্জিলের কোথাও নেই। ইঞ্জিলে আছে, যিশুখ্রিস্ট বলছেন, আমি কিচ্ছু জানি না। খ্রিস্টানরা তিনশ বছরের মাথায় আবিষ্কার করল, লাইট ফরম লাইট (Light from Light)। যিশুখ্রিস্ট নূরের থেকে আসা নূর। যিশুখ্রিস্ট সেইম সাবস্টেনস (Same Substance)। আল্লাহর যাতি নূরের তৈরি। অতিভক্তি। মুসলিমরাও এখন অতিভক্তি করতে চায়। আর অতিভক্তির মাধ্যমেই মানুষের পতন হয়। মানুষ মনুষ্যত্ব হারায়। আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়।

প্রশ্ন-০৭: রাসূল ﷺ আওয়াল (প্রথম) আখির (শেষ) কি না?

উত্তর: এটা ঠিক নয়। أَنَا الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ– (আমি প্রথম, আমি শেষ) মোটেও ঠিক নয়। এটা কোনো সহীহ হাদীসে নেই, কুরআনে নেই। এভাবে বলা ঠিক নয়। যারা বলেন, বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে বলেন।

---

[8] Matthew 15:26 (KJV)

প্রশ্ন-০৮: রাসূলুল্লাহ ﷺ শেষ নবী। তবে ঈসা ﷺ জগতে আবার আসবেন। তিনি নবী হিসেবে আসবেন নাকি উম্মাত হিসেবে? তাঁর অপূর্ণ রিসালতের ব্যাপারটার কী হবে?

উত্তর: তাঁর রিসালাত অপূর্ণ এটা আপনাকে কে বলেছে? কোনো খ্রিস্টান যদি বিশ্বাস করে তাঁর রিসালাত অপূর্ণ, তাহলে সে কাফির। আর যদি কোনো মুসলিমও বিশ্বাস করে, ঈসা ﷺ এর রিসালাত অপূর্ণ, সেও কাফির। কারণ, আমরা বিশ্বাস করি, সকল নবী তাঁদের রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। এই জিনিসটা খ্রিস্টান বললেও সে কাফির হয়ে যাবে। আমরা বললেও কাফির হয়ে যাব। আল্লাহর কোনো নবী তাঁর রিসালাত পূর্ণ না করে যান নি।

ঈসা ﷺ আসবেন, এটা আমরা বিশ্বাস করি। কুরআনে স্পষ্ট না থাকলেও অগণিত হাদীস রয়েছে। খ্রিস্টধর্মের ওরাও বিশ্বাস করে। তবে তাদের বিশ্বাসটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাইবেলে আছে, যিশুখ্রিস্ট বলেছেন, তোমরা বেঁচে থাকতেই আবার আমি চলে আসব। এই জন্য যিশুখ্রিস্টের শিষ্যরা বিশ্বাস করত, ৪০/৫০ বছরের ভেতর কিয়ামত হবে। বসে আছে তো আছেই। কিয়ামত হল বুঝি। স্পষ্ট বলা আছে, তোমরা বেঁচে থাকতেই কিয়ামত হবে। সাধু পলের চিঠিতে আছে, আমরা বেঁচে থাকতেই কিয়ামত হবে। কিন্তু আমরা মুসলিমরা বিশ্বাস করি, শেষ যামানায়, কিয়ামতের আগে ঈসা মসীহ দুনিয়াতে আসবেন। তিনি নবী হিসেবে আসবেন না। নবুওয়াতের দায়িত্ব শেষ। মনে করেন, খালেদা জিয়া ঝিনাইদহ আসবেন (শেখ হাসিনার শাসনামলে), প্রধানমন্ত্রী হিসেবে, ঠিক না ভাই!? ঝিনাইদহ আসলে তো প্রধানমন্ত্রী হয়ে ছাড়া আসার উপায় নেই?! কথা হল, তিনি সাবেক নবী হিসেবে আসবেন। তাঁর রিসালাত পূর্ণ করে তিনি চলে গেছেন। তিনি আসবেন এই উম্মাতের দায়িত্ব পালনের জন্য।

প্রশ্ন-০৯: প্রত্যেক নবীই নাকি ছোট ছোট পাপ করেছে। ঈসা ﷺ এর ভুলত্রুটি জানতে চাই।

উত্তর: আমরা বলি না যে নবীরা পাপ করেছেন। প্রত্যেক নবী ছোটছোট পাপ করেছেন এটা আসলে ঠিক কথা নয়। নবীরা মাসুম। আল্লাহ তাদেরকে পাপ থেকে রক্ষা করেন। ভুলভ্রান্তি তাদের হয়। ঈসা ﷺ কী ভুল করেছেন এটার জন্য ইঞ্জিল শরীফ যথেষ্ট। এই যে জাল ইঞ্জিল খ্রিস্টানরা বানাইছে... অতিভক্তি মানেই চোরের লক্ষণ। যেমন আমরা আব্দুল কাদের জিলানির নামে অনেক বানোয়াট গল্প-কাহিনী বলেছি। আর বানোয়াট গল্পের মধ্যে এমন কথা থাকে, যাতে তার মানসম্মান নষ্ট হয়। ঈসা ﷺ এর নামে জাল কথা আছে– উনি মদ খেয়ে মাতাল হয়ে কাপড়

খুলে ফেলেছেন। বেশ্যা মেয়েদের সাথে জড়াজড়ি করেছেন। এক বেচারার দুই হাজার শুয়োর মেরে ফেলেছেন (তার দুআয় শুয়োরগুলো পানিতে ঝাপ দেয়)। খ্রিস্টানদের কাছে শুয়োর হালাল। এখন তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন, এই যে দুই হাজার শুয়োর মেরে ফেলল, এটা ভালো হল না মন্দ হল? যদি বলে ভালো হল, তাহলে বলবেন, তোমার বাড়ির ছাগল-গরু যা আছে সব মেরে ফেলব। রাগ করতে পারবা না! আর যদি বলে গোনাহ হল, তাহলে এর থেকে বড় গোনাহ আর কী চাও? ইঞ্জিলে আরেকটা গল্প আছে। ঈসা ﷺ ডুমুর গাছের কাছে গেছে ডুমুর খুঁজতে। তখন ডুমুরের সিজন না। তিনি ডুমুর না পেয়ে বদদুআ দিয়ে গাছটা পুড়িয়ে ফেলেছেন। যদি কোনো খ্রিস্টানকে বলেন, কাজ ভালো হল না মন্দ হল? সে যদি বলে এটা ভালো কাজ, তাহলে আপনি তার বাড়ির সব গাছ পুড়িয়ে দেবেন। গাছ পোড়ানো যদি যিশুখ্রিস্টের ভালো কাজ হয় তাহলে আমি তোমার গাছ পুড়িয়ে ভালো কাজ করি। আর যদি গোনাহের কাজ হয় তাহলে এরচে' বড় গোনাহ আর কী চাও? এমন অনেক উদ্ভট গল্প আছে। নিজের মা দেখা করতে এসেছেন। তিনি বলছেন, মা কে আমি চিনি না। এমন অনেক নোংরা কথা আছে বাইবেলে, (প্রচলিত) ইঞ্জিলে।

প্রশ্ন-১০: আল্লাহ পাক অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন মানুষের হেদায়াতের জন্য। কিন্তু সমাজের মাতব্বর শ্রেণি তাদের কথা শোনে নি। আল্লাহ তখন বলেছেন, তোমরা ওদের জন্য চিন্তা করবে না। কারণ, ওদের গলায় বেড়ি পরানো হয়েছে। তাহলে ওরা হেদায়াত কীভাবে পাবে?

উত্তরঃ আপনি যেটা বলেছেন, পুরোপুরি ঠিক বলেন নি। আল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ কে কাফিরদের জন্য দুআ করতে বলেছেন। তিনি তাদের জন্য কেঁদেছেন। তবে আমরা অনেক সময় হতাশ হয়ে যাই- মানুষ ভালো হচ্ছে না। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলেছেন, আপনি হতাশ হয়েন না। অনেক মানুষ আছে যারা পাপ করতে করতে এমন পর্যায়ে চলে গেছে, তাদের ভালো হওয়ার পথ আর থাকে না। এটা হয় নিজের কর্মের ফলে।

প্রশ্ন-১১: ঈসা ﷺ খোদার পুত্র নন- এটা কীভাবে প্রমাণ করব? খ্রিস্টানদের প্রশ্নের জবাব কীভাবে দেব?

উত্তরঃ ঈসা ﷺ খোদার পুত্র নন। এটা প্রথমে প্রমাণ করব বাইবেল দিয়ে। বাইবেলে অবশ্য আছে তিনি খোদার পুত্র। এটাও বলা আছে যে, মানুষ সবাই আল্লাহর পুত্র। এখানে একটা বিষয় আমরা গোলমাল করে ফেলেছি। খ্রিস্টানরাও

এখান থেকেই গোমরাহ হয়েছে। সেটা হল, হিব্রু ভাষায় খোদার পুত্র মানে বান্দা। ঈসা ﷺ বলেছেন সব মানুষ আল্লাহর পুত্র। এর বাইরে স্পেশাল কোনো পুত্রত্ব নেই। যেমন দাউদ ﷺ খোদার পুত্র। কিন্তু তার মানে তো তিনি ঈশ্বর নন। এটা বাইবেলে আছে। দুই নম্বর কথা হল, খোদার পুত্র হলে সমস্যা কী? আদম খোদার পুত্র। ইবরাহীম খোদার পুত্র। ইসরাঈল খোদার পুত্র। ইয়াকুব খোদার পুত্র। তাই বলে কি তাদের পূজা করব নাকি? দাউদ আল্লাহর প্রথম পুত্র, খোদার জন্ম দেওয়া begotten son। খোদার পুত্র মানে আল্লাহর খাস বান্দা। তারা আল্লাহর ইবাদত করেন। কুরআনে তো আল্লাহ ক্লিয়ার বলেছেন:

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

তিনি কাউকে জন্ম দেন নি। তাঁকেও কেউ জন্ম দেয় নি।[৫] আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ

কাফিররাই আল্লাহকে তিনের এক বলে।[৬]

وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ

আল্লাহ বলেছেন যারা মাসীহকে ইবনুল্লাহ বলে তারা কাফির।[৭] খ্রিস্টানদের জবাব দেয়ার জন্য আমার [পবিত্র বাইবেল: পরিচিতি ও পর্যালোচনা] বইটা পড়বেন। বিভিন্ন দাওয়াতি কার্যক্রমে শরিক হবেন। সবই অপব্যাখ্যা আর মিথ্যা। যেমন আজকে আমার এক ছাত্র প্রশ্ন করেছে– 'মারিয়াম বড় না ফাতিমা বড়'? তো এটা বাইবেল দিয়ে প্রমাণ করব নাকি কুরআন দিয়ে? বাইবেলে আছে, মারিয়াম বেঈমান ছিলেন। ইঞ্জিল বলে যে জাল বইটা আছে খুবই ফালতু। সেখানে আছে, যিশুর পরিবারের লোকেরা যিশুকে পাগল বলত। যিশুর পরিবার তাকে ধরে বেঁধে রাখতে চেয়েছিল। যিশু ঘরের ভেতর তার সাহাবিদের নিয়ে বসে আছেন, সেই সময় যিশুর মা এবং ভাইয়েরা দেখা করতে আসল। বাইরে মা এবং ভাইয়েরা মিসকিনের মতো দাঁড়িয়ে আছে। লোকেরা তাকে বলছে, হুযুর, আপনার মা আর ভাইয়েরা আপনার সাথে দেখা করতে এসেছে। তিনি বললেন, কে আমার মা? কে আমার ভাই? ওরা কেউ আমার মা-ভাই নয়। যারা আমার উপর বিশ্বাস করে তারা আমার মা-ভাই। প্রথম কথা হল, তাহলে মা-ভাইদের বিশ্বাস ছিল না বলে তাড়িয়ে দিল। দ্বিতীয় কথা হল, মা যদি কাফিরও হয়, তার সাথে মানুষ এই আচরণ করতে পারে! এই হল ইঞ্জিলের অবস্থা।

---

[৫] সূরা: [১১২] ইখলাস, আয়াত: ৩।
[৬] সূরা: [৫] মায়িদা, আয়াত: ৭৩।
[৭] সূরা [৯]: তাওবাহ, আয়াত: ৩০।

প্রশ্ন-১২: অনেকে বলে, আল্লাহ এবং মুহাম্মাদ পাশাপাশি লেখা শিরক। এটা কি ঠিক?

উত্তর: আসলে এটা অন্যায়। আল্লাহ এবং মুহাম্মাদ পাশাপাশি লেখা খুবই অন্যায়। মনে হয়, যেন খ্রিস্টানদের তিনটে দেবতা, আমাদের দুটো। যদি লিখতে হয় পুরো বাক্য লিখবেন। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। এর দ্বারা আল্লাহ এবং মুহাম্মাদ দুজনেরই পরিচয় জানা হয়ে গেল। এটা সঠিক। কিন্তু শুধু আল্লাহ এবং মুহাম্মাদ লেখা খুবই আপত্তিকর কথা।

প্রশ্ন-১৩: কুরআন নাযিলের পর পূর্ববর্তী আসমানি কিতাব, পূর্বধর্ম বাতিল কি না? কুরআনের জবাব চাই।

উত্তর: আগের ধর্ম বাতিল করার দরকার কী! আগের ধর্মটা পাব কোথায়? আগের ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ সব জাল হয়ে গেছে। মনে করেন ইঞ্জিল শরীফের ভেতর হাজার হাজার মিছে কথা, কন্ট্রাডিক্টরি (বৈপরিত্য)। যেমন ঈসা নবীর নামে নানা মিছে কথা রয়েছে। একজনের বাবা দুইজন। এটা কি প্রশংসনীয় জিনিস? ইঞ্জিলে আছে, ঈসা নবীর বাপের বাপ দুটো। দুইজন। যে ঈসা মসীহকে নিয়ে ইঞ্জিল লেখা, তার ভেতরে একজনের বাপ দুটো বানিয়ে দিয়েছে। তো আগের ধর্ম পাব কোথায়? সে তো নষ্ট হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, কুরআনে আল্লাহ সুরা মায়িদায় বলেছেন:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ

আমি আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছি, এর আগের কিতাবগুলোর সত্যতা বলতে এবং সেগুলোকে সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে।[৮] আগের কিতাবগুলো জাল হয়ে গেছে, ভুল হয়ে গেছে, মিথ্যা ঢুকে গেছে; কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক এটা কুরআন দিয়ে বোঝা যাবে। কুরআন স্পষ্টই বলেছে, আগের কিতাবগুলোর ভেতর জালিয়াতি ঢুকেছে, গোমরাহি ঢুকেছে, বিভ্রান্তি ঢুকেছে, মিছে কথা ঢুকেছে এবং বর্তমান গবেষণা তা প্রমাণ করেছে। কারো সন্দেহ হলে বাইবেলটা নিয়ে আসবেন। অন্য কিছু লাগবে না, আমি দেখিয়ে দেব।

পাকশি অমন একজন ঈসায়ি মুসলমান আছেন। ফ্রি কম্পিউটার শেখান। আমরা শালা সেখানে কম্পিউটার শিখতে যায়। গেলেই খালি আলিমদের নিন্দা আর খ্রিস্টান ধর্মের গল্প বলেন। তিনি বলেন যে, আমার এই কিতাবুল মোকাদ্দসের ভেতর যদি কেউ একটা ভুল ধরতে পারে, আমি ছিঁড়ে ফেলে দেব। আমি আমার

---

[৮] সূরা: [৫] মায়িদা, আয়াত: ৪৮।

শালাকে বললাম, ঠিক আছে, উনাকে বাইবেল ছিঁড়তে হবে না, খ্রিস্টান ধর্ম ত্যাগ করতে হবে না, উনি উনার বাইবেলটা নিয়ে আমার কাছে আসবেন। উনি একটা চাইলে একটা, দশটা চাইলে দশটা, একশটা চাইলে একশটা, এক হাজারটা চাইলে এক হাজারটা ভুল ওই কিতাবুল মোকাদ্দস থেকেই আমরা বের করে দেব। এই জায়গায় বলা হচ্ছে একজনের বাপের নাম এক, আরেক জায়গায় বলা হচ্ছে বাপের নাম আরেক– দুটোই কি সত্যি হতে পারে? এই জায়গায় বলা হচ্ছে, অমুকের তিন ছেলে, অমুক অমুক নাম। আরেক জায়গায় বলা হচ্ছে তার পাঁচ ছেলে, এর ভেতর আগের সেই তিন ছেলের নামই নেই। দুটোই সত্যি, নাকি? পরে আর সে আসে না। ওড়ামোড়া করে খালি।

তো বিষয়টা হল, আল্লাহ কুরআনে সূরা মায়িদার ভেতর বলেছেন, এই কুরআন হল, আগের সব কিতাবের, সব ধর্মের সংরক্ষক। এটা দিয়ে সব মাপতে হবে। এটার সাথে যেটুকু মিলবে, সেটুকু ঠিক। না মিললে বুঝতে হবে জাল। এবং এটা বাস্তবতা। খ্রিস্টান গবেষকরা স্বীকার করেন, তাদের ধর্মগ্রন্থে জাল-জালিয়াত অনেক। আপনাদের বলি, খ্রিস্টান ধর্মের যে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি, চারটে পাণ্ডুলিপি, এক খ্রিস্টান লিখেছে, এই পাণ্ডুলিপিগুলোর ভেতর যে কন্ট্রাডিকশন, এটা নিয়ে আমি ইন্টারনেটে লিখব, যেন সবাই বোঝে বাইবেল কোনো ডিভাইন (ঐশ্বরিক) বই না।

প্রশ্ন-১৪: আমরা জানি, জন্মের আগেই মানুষের ভাগ্য লেখা থাকে। আবার প্রতি বছর কদরের রাতে ভাগ্য লেখা হয়। তাহলে কি কর্মের আলোকে প্রতি বছর আল্লাহ ভাগ্য সংশোধন করেন?

উত্তর: ভাগ্য লেখা বলতে, আল্লাহর ইলমে লেখা আছে। তিনি অনাদি অনন্ত ইলমে জানেন যে, মানুষ তার নিজের ইচ্ছা শক্তি দিয়ে কী করবে। আবার আল্লাহ নিজেই কুরআনে বলেছেন:

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ

আল্লাহ যা ইচ্ছা মুছে দেন যা ইচ্ছা রাখেন।[৯] কাজেই আল্লাহর ইলম কীভাবে রাখেন, আমরা জানি না। তবে হাদীসে এসেছে, মানুষের দুআ, সাদাকাত, পিতামাতার খেদমতের কারণে ভাগ্য পরিবর্তন হয়।[১০]

প্রশ্ন-১৫: ঘৃণা করা কী? কোন শ্রেণির মানুষকে ঘৃণা করা যাবে?

উত্তর: সাধারণভাবে আমরা কাউকেই ঘৃণা করি না। আল্লাহর মানদণ্ডে যে আল্লাহকে

---

[৯] সূরা: [১৩] রা'দ, আয়াত: ৩৯।

[১০] সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-২১৩৯; মুসনাদ বাযযার, হাদীস নং-২৫৪০।

ঘৃণা করে তাকে ঘৃণা করা যায়। যে আল্লাহর রাসূল ﷺ কে ঘৃণা করে তাকে ঘৃণা করা যায়। যার ঈমান নেই, ইসলামকে ঘৃণা করে– আমি তাকে ঘৃণা করতে বাধ্য। কোনো মুসলিমকে মূলত ঘৃণা করা যায় না। কারণ সকল মুসলিম আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে। নবী ﷺ কে ভালোবাসে। কাজেই ব্যাসিক তার প্রতি ভালোবাসা আছে। তার কর্ম যেটা খারাপ, সেই খারাপ কর্মকে আমরা খারাপ বলব। এ জন্য কোনো মুসলিমকে অ্যাবসোলুট (পুরোপুরি) ঘৃণা করা হারাম। এতে তার ঈমানকে অবমূল্যায়ন করা হয়। তার ঈমানের মূল্যায়নের পাশাপাশি তার অন্যায়ের প্রতি আমাদের ঘৃণা থাকবে, বিরক্তি থাকবে। তবে তার জন্য দুআ থাকবে।

প্রশ্ন-১৬: কোন কোন কারণে ঈমান নষ্ট হয়ে যায় মেহেরবানী করে বলবেন।

উত্তর: এটা তো খুব বিস্তারিত ব্যাপার। খুবই বিস্তারিত ব্যাপার। আমি একটা দুটো বলব। আজকে আর বেশি বলা যাবে না। অনেক প্রশ্ন। কেউ যদি মনে করে সকল ধর্মের মানুষ জান্নাতে যাবে, এটা কুফরি, ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। কেউ যদি ইসলামের কোনো বিধান অচল মনে করে, সে যুগে ছিল, এখন পালন না করলেও চলবে বা এগুলো আগের যুগের জন্য ছিল এখন আর দরকার নেই, যেমন পর্দা– সেও কাফির। ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ কুরআনের কোনো বিধান যদি কেউ অপছন্দ করে, অচল মনে করে, যেটা কুরআনে স্পষ্ট আছে, সেটাও কুফরি।

প্রশ্ন-১৭: কোনো অমুসলিমকে কাফির বলা, সে দোযখে যাবে– এই ধরনের কথা বলা যাবে কি না?

উত্তর: অমুসলিম মানেই তো কাফির। সে ইসলামকে বিশ্বাস করে না। সে যদি অমুসলিম হয়ে মারা যায় তাহলে তো সে দোযখে যাবে। এটা তো ঠিক কথা। তবে একজন অমুসলিমের সামনে তার ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে কিছু বলতে পারেন না।

প্রশ্ন-১৮: একজন মাওলানা বলেছেন, আল্লাহর রহমতে পাথরের আংটির ওসীলায় বিপদমুক্ত হওয়া যায়, তার কথাটা কতটুকু সঠিক?

উত্তর: এটা শিরকি কথা। পাথরের কোনো ক্ষমতা নেই। পাথরের সাথে আল্লাহর রহমতের কোনো সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক আছে (বলে) বিশ্বাস করা কুফরি।

প্রশ্ন-১৯: আমার কিছু বন্ধু বলে যে, হিন্দুরা যেমন মূর্তি সামনে নিয়ে ভগবানের পূজা করে, মুসলিমরাও কাবাঘর সামনে নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করে। দুটো বিষয় মূলত একই। কোনো পার্থক্য নেই। তাদের কথা কতটুকু সঠিক?

উত্তর: দুটো বিষয় কখনোই এক নয়। মুসলিমরা কখনোই কাবাঘরের কাছে কিছু চায় না। কিন্তু হিন্দুরা মূর্তির কাছেই চায়– 'মা, এটা দে'। সে বলে না যে, 'ঈশ্বর বা দেবতা, আমাকে অমুক জিনিস দাও'। সে ডাইরেক্ট বলে, 'মা, তুমি দাও'। আর কোনো মুসলিম কাবাঘরকে বলে না, কাবাঘর তুমি আমার কিছু করো। কক্ষনো নয়। মুসলিমরা কাবাঘরের ছাদে ওঠে, কাবাঘরের উপর দাঁড়িয়ে থাকে, কাবাঘরে পা দেয়– এগুলো কিছুই নিষেধ নয়। শৃঙ্খলার জন্য কোনো একটা দিককে সামনে রাখতে হবে, তাই আল্লাহ কাবাঘরকে কিবলা বানিয়ে দিয়েছেন– 'তোমরা কাবাঘর সামনে নিয়ে ইবাদত করো'। মুসলিম কাবাঘরের কাছে কিছু চায় না। কাবাঘরকে ইবাদত করে না। কাবার প্রতি সামান্যতম ইবাদতের অনুভূতি তার নেই। সে আল্লাহর কাছে চায়। আল্লাহর সাথে কথা বলে। আর যে মূর্তিপূজা করে, সে মূর্তির কাছেই চায়। আল্লাহর কাছে মোটেও চায় না। আল্লাহর কথা তার মনেই থাকে না।

প্রশ্ন-২০: আশেকে রাসূল কাকে বলে?

উত্তর: আশেকে রাসূল ﷺ বলতে আমরা বুঝি, যারা নামায পড়ে না, রোযা করে না, হজ্জ করে না, যাকাত দেয় না, দাড়ি রাখে না, সুদ খায়, ঘুষ খায়– তাকে আশেকে রাসূল বলে। এটা তো খুব সাধারণ কথা। আশেক শব্দটা আপত্তিকর। আরবিতে আশেক একটা শব্দ আর মুহাব্বাত আরেকটা শব্দ। আশেক হল, নারী-পুরুষের জৈবিক প্রেমকে বলা হয়। আর মুহাব্বাত হল, সকল প্রেম। এ জন্য বাবা-মার প্রতি ভালোবাসাকে আরবিতে আশেকে মা, আশেকে বাবা বলে না। এটা বললে বেইজ্জত হয়ে যাবেন। 'এশক' শব্দটা আল্লাহ এবং রাসূল ﷺ এর প্রতি ব্যবহার করাটাই ভুল। ফারসিতে এটা ব্যবহার করা হয়েছিল, এখনো আমরা করি। এর মানে হল রাসূল-প্রেমী। তো বঙ্গবন্ধুর প্রেমিক কে? যে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ মানে না, পোশাক পরে না, দল করে না, তার বিরুদ্ধে বলে– এই কি বঙ্গবন্ধুর প্রেমিক? আপনার ভেতরে প্রেম আছে কি না, মুহাব্বাত আছে কি না– আপনার কর্মে প্রকাশ পাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবিরা সত্যিকারের প্রেমিক ছিলেন। তাঁকে ভালোবাসতেন। তাঁর জন্য জীবন দিয়েছেন। তাঁর প্রতিটি সুন্নাত হুবহু মেনেছেন। এক চুল নড়েন নি।

প্রশ্ন-২১: হেরা গুহা থেকে নাকি মা'রিফতের উৎপত্তি–– এ ব্যাপারে কিছু বলেন।

উত্তর: আমি হেরা গুহায় গিয়েছিলাম। তাহলে মা'রিফত আমার কাছে আছে। আপনারা আমার কাছে আসবেন আমি দিয়ে দেব, ইনশাআল্লাহ। মা'রিফত তো আবু জাহলেরও ছিল– আল্লাহ কুরআনে বলেছেন। কাজেই মা'রিফত দিয়ে করবটা কী! মা'রিফতের জন্য হেরা গুহায় যাওয়া লাগে না তো। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

ইয়াহুদি-নাসারা, আবু জাহল, কাফির– সবার মা'রিফত ছিল।

يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ

[তারা তাকে চেনে, যেমন চেনে নিজেদের সন্তানদেরকে][১১]

মা'রিফত এটা ইমানের কিছুই না। মা'রিফত যখন আমলে পরিণত হয় তখন এটার গুরুত্ব হয়। ইমাম আবু হানীফা রাহ. **আল ফিকহুল আকবারের** মধ্যে বলেছেন, মা'রিফত সবার সমান। কিন্তু মা'রিফত দিয়ে বিচার হবে না, আমল দিয়ে বিচার হবে।

প্রশ্ন-২২: হাকীকত, তরীকত, মা'রিফত কী জানতে চাই।

উত্তর: হাকীকত, তরীকত, মা'রিফত– এতগুলো জিনিস জানবেন আর আমাকে হাদিয়া দেবেন না, মুরিদ হবেন না– এটা তো ঠিক হলো না। এই যে জিনিসগুলো আমরা বলি, কুরআন-হাদীসে এসবের কিচ্ছু নেই। শুধু শরীআতের কথা কুরআনে আছে, হাদীসে আছে ইসলামে আছে।। হাকীকত এটা কোরআন-হাদীসের শব্দ নয়। মা'রিফত মানে জ্ঞান। এটা কুরআনে আছে, হাদীসে আছে। এটা ঈমানের আগের বিষয়। কাফিরদের মা'রিফত ছিল। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, কাফিরদেরও মা'রিফত ছিল। ইয়াহুদি-খ্রিস্টানদের মা'রিফত ছিল। কামিল মা'রিফত ছিল। মা'রিফত মানে একটা বিষয় জানা। এই জানাটা যখন আপনার শক্তি হবে, তখন এটা আপনার ঈমান হবে। অথচ আমরা মা'রিফতকে বড় বানিয়েছি। কিন্তু মা'রিফত বড় না। মা'রিফত সবার নিচে। মা'রিফতের পরে ঈমান। ঈমানের পরে আমল বা শরীআত। জ্ঞান দুই প্রকারের। একটা হল, আমাদের সাধারণ জ্ঞান। যেমন ধূমপানে বিষপান। একথা আমরা সবাই জানি। তারপরেও আমরা ধূমপান করি। কিন্তু কেউ যদি গবেষণা করে দৃঢ়ভাবে বুঝতে পারে, ধূমপানে বিষপান, সে কিন্তু আর খেতে পারে না। তার মনের থেকে বাধা দেয়। আমরা জানি, নামায কাযা করলে গোনাহ হয়। আপনারা জানেন না, এমন কেউ নেই। মনে করুন, আপনি নিয়মিত নামায পড়েন। রাতে ১০/১১ টার দিকে ঘুমান। পাঁচটার দিকে উঠে ফজরের নামায পড়েন। একদিন শুতে শুতে একটা বেজে গেছে। সকালে উঠে দেখেন আটটা বাজে। এমন ঘটে। আপনি জানেন ফজরের নামায কাযা হলে গোনাহ হয়। কিন্তু তারপরেও মাঝেমাঝে কাযা হয়। কিন্তু এই আপনি ঢাকা যাবেন। ঢাকায় ইন্টারভিউ আছে। অথবা আমেরিকায় যাবেন, দূতাবাসে পাসপোর্ট জমা দিতে যাবেন। সেখানে পৌঁছাতে হবে সকাল এগারোটায়। রাত চারটার আপনার গাড়ি। আপনি রাতে ঘুমিয়েছেন বারোটার

---

[১১] সূরা: [২] বাকারা, আয়াত: ১৪৬; সূরা: [৬] আনআম, আয়াত: ২০।

দিকে। দেখা যাবে আধা ঘণ্টা পরপর আপনার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। গাড়ি চলে গেল কি না– এই ভয়ে আপনার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। এমন ঘটনা আপনাদের ঘটে। নামায কাযা হলে গোনাহ হবে এটাও ইলম, রাত চারটার গাড়ি মিস হলে আমেরিকান অ্যাম্বাসির সাক্ষাৎকার মিস হবে– এটাও ইলম। দুই ইলমের পার্থক্য হল, আমেরিকান অ্যাম্বাসির ইলমটা আপনার অবচেতনে চলে গেছে। এটা আপনাকে ঘুমাতে দিচ্ছে না। আর নামায কাযা হলে গোনাহ হবে, এটা আপনার অবচেতনে যায় নি। মানুষ যখন আল্লাহর ইবাদত করতে করতে নামাযটা তার অবচেতনে চলে যায়, তখন সে আর নামায কাযা করতে পারে না।

الْعِلْمُ عِلْمَانِ: عِلْمٌ فِي الْقَلْبِ وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ

এই জন্য ইলম দুই প্রকার। ইলমুল বিল লিসান, যবানের ইলম। মুখের ইলম। আপনি জানেন, নামায না পড়লে গোনাহ হবে। জানেন যে, সুদ খেলে গোনাহ হবে। জানেন যে, মদ খেলে গোনাহ হবে। তারপরেও আমরা এগুলো করি। আরেকটা হল ইলমুল বিল কলব, কলবের ইলম। ইলমটা অবচেতনে চলে যাওয়া। এই কলবের ইলমকে কোনো কোনো আলিম মা'রিফত বলেছেন।

প্রশ্ন-২৩: আমি একজন পীরের মুরীদ। আমার পীর বলেছেন, সালাতে আমার কলব পীরের দিকে ঘুরাতে হবে। পীরের মাধ্যমে নাকি সালাতটা আল্লাহর কাছে পৌঁছাবে। আমি এখন কী করব? কুরআন-সুন্নাহতে এই ব্যাপারে কোনো সহীহ দলীল আছে কি?

উত্তর: আপনি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পুরাটাই কাফির হয়ে যাবেন। মুশরিক। বড় কষ্ট লাগে ভাইয়েরা। বড় কষ্ট লাগে। খুব সহজ কথা। একটা ছোট্ট বাচ্চা। মায়ের কাছে যখন দুধ চাওয়ার দরকার হয়, মা খুব রাগি তাই দুধের দরকার হলে দাদির কাছে চলে যায়। বড় আপুর কাছে চলে যায়– 'আপু, মাকে একটু বলে দাও, যেন দুধ দেয়'। আপু বলে দেয়, মা দুধ দেয়। মা এই শিশুটাকে পছন্দ করে, নাকি বিরক্ত হয়? এই শিশু মাকে সম্মানিত করছে নাকি অপমানিত করছে? সে মায়ের মাতৃত্বকে অপমানিত করছে। মায়ের মাতৃত্বের দাবি হল– আমি রাগি, মারি; যা করি, আমার সন্তান আমার কাছে আসবে। আর কারো কাছে যাবে না। আমাদের মরহুম পীর সাহেব বলতেন, আমার আল্লাহ কি খোড়া হয়ে গেছে যে আব্দুল কাদির জিলানির কাঁধে চড়ে আমার কাছে আসতে হয়!

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

[আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার কাছেই সাহায্য চাই।][১২]

---

[১২] সূরা: [১] ফাতিহা, আয়াত: ৪।

আল্লাহর কবুলিয়াত পাওয়ার জন্য অন্য কারোর মাধ্যমে যেতে হয়, এটা হচ্ছে আবু জাহলের শিরকের মূল।

বলার সময় নেই, তাও আরেকটা উদাহরণ বোঝেন। আমার দুইজন মুরীদ আছে। একজন মুরীদ আমার খুব ভক্তি করে। সে জানে, তার সব ভালো-মন্দ আমার ওসীলায় হয়। তার যখন কোনো বিপদ হয়, সে চিন্তা করে, হুযুর মনে হয় রাগ করেছেন। হুযুর নারায হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে সে আমার কাছে ছুটে আসে– 'হুযুর বেয়াদবি মাফ করবেন'। যদি ভালো কিছু হয়, ভাবে, আল্লাহ হুযুরের দুআয় দিয়েছেন। ওর অন্তরটা আমার প্রতি খুব খুশি হয়ে যায়। ওর অন্তরটা সব সময় আমার কাছে থাকে। আর একজন মুরীদ আছে আমার। সে আমার কাছ থেকে আমল নিয়ে আমল করে। সে জানে, হুযুর কিছুই না। হুযুর আমার আমল শেখায়। কিন্তু সব কিছুর মালিক আল্লাহ। তার খারাপ কিছু হলেই দুআ করে– 'আল্লাহ, আমার গোনাহের জন্য দিয়েছ এটা। বিপদটা তুমি কাটিয়ে দেও'। আবার ভালো কিছু হলে, ৫০ টাকা লাভ হলে বলে, 'আল্লাহ, তোমার শুকরিয়া। তুমি না দিলে আমি পেতাম না'। ওর অন্তরটা সব সময় আল্লাহর কাছে থাকে। বলেন তো, এই দুইজনের ভেতর আল্লাহর ওলি কে হবে? দ্বিতীয় জন হবে। প্রথম জন হল মুশরিক। ও আল্লাহর সাথে আমাকে শরিক করেছে। ও আবু জাহলের মতোই মুশরিক। আবু জাহল আল্লাহ এক মানত। আল্লাহর ইবাদত করত। হজ্জ করত। শুধু বিশ্বাস করত আল্লাহর নবী, ওলি, পীর, পয়গাম্বর, লাত, মানাত, ওজ্জা, হোবল, ইয়াগুস, সোয়া', নাস, ইবরাহীম, ইসমাঈল, জিবরাঈল, মিকাঈল, আযরাঈল, ইসরাফীল– এদের মাধ্যম ছাড়া আল্লাহর নেক নযর পাওয়া যায় না। কাজেই এদের একটু বন্দনা-টন্দনা করত। হজ্জ আল্লাহরই করত। কিন্তু যখন বন্দনা করত– জিবরাঈল, মিকাঈল, আযরাঈল, লাত, মানাত– ওদের বন্দনা করত।

আরবিতে ওসীলা মানে হল নৈকট্য। এর অর্থ 'মাধ্যম' নয়। আমরা দিনের ভেতর পাঁচবার আল্লাহর কাছে ওসীলা চাই নবীজির জন্য। ভালো করে বোঝেন:

آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ

আযানে আমরা এই দুআ করি। 'আল্লাহ, মুহাম্মাদকে ওসীলা দাও'।[১৩] তার মানে কি মুহাম্মাদকে একজন পীর ধরিয়ে দাও? না। মুহাম্মাদ ﷺ কে নৈকট্য দাও। তোমার সবচে' নিকটবর্তী পজিশনটা দাও। আল্লাহ বলেছেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ...

---

[১৩] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-৬১৪; সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-৫২৯; সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-২১১; সুনান নাসায়ি, হাদীস নং-৬৮০; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং-৭২২।

হে মুমিনরা, আল্লাহকে ভয় করো, তার নৈকট্যের সন্ধান করো এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করো।[১৪] ঈমান, তাকওয়া, নৈকট্য, জিহাদ। ঈমান হলো ঈমান, তাকওয়া হলো ফরয ওয়াজিব, নৈকট্য হলো বেশি বেশি নফল আমল, নেক আমল করা, আর জিহাদ হলো জিহাদ। এই চারটের মাধ্যমে আল্লাহর ওলি হওয়া যাবে। এখন আমরা ওসীলা বানিয়েছি 'মাধ্যম'। আর মাধ্যম ঠিক আছে। আল্লাহর নেকআমল আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম। কোনো ব্যক্তি কারো মাধ্যম হতে পারে না। এটা ভাবলে ঈমান চলে যাবে। আপনি একজন পীরের কাছে গেছেন দীন শিখতে, এটা আপনার ওসীলা। আল্লাহ খুশি হবেন যে, আমার দীন শেখার জন্য দৌড়ে বেড়াচ্ছে। আমল শেখার জন্য দৌড়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আপনি যদি মনে করেন, এই পীরের কলব দিয়ে অথবা এই ব্যক্তির মাধ্যমে আমি জান্নাতে চলে যাব, তাহলে আপনি ঈমানহারা হয়ে যাবেন। সবচেয়ে বড় কথা হল, আমরা ঈমান এনেছি– 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র উপর। আমরা ইবাদত করব কার? আল্লাহর। নামাযটা পড়ব কার জন্য? যিকির করব কার জন্য? সব আল্লাহর জন্য। আর তরীকাটা হল নবীজির। আমার কথা হল, সাহাবিরা যখন নামায পড়তেন, নবীজির ধ্যান দিয়ে নামায পড়তেন? কোনো হাদীসে এমন আছে? নেই। সব ব্যাপারে নবীজির তরীকা দেখতে হবে।

প্রশ্ন-২৪: কোন কোন কারণে ঈমান নষ্ট হয়ে যায় মেহেরবানী করে বলবেন।

উত্তর: এটা তো খুব বিস্তারিত ব্যাপার। খুবই বিস্তারিত ব্যাপার। আমি একটা দুটো বলব। আজকে আর বেশি বলা যাবে না। অনেক প্রশ্ন। কেউ যদি মনে করে সকল ধর্মের মানুষ জান্নাতে যাবে, এটা কুফরি, ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। কেউ যদি ইসলামের কোনো বিধান অচল মনে করে, সে যুগে ছিল, এখন পালন না করলেও চলবে বা এগুলো আগের যুগের জন্য ছিল এখন আর দরকার নেই, যেমন পর্দা– সেও কাফির। ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ কুরআনের কোনো বিধান যদি কেউ অপছন্দ করে, অচল মনে করে, যেটা কুরআনে স্পষ্ট আছে, সেটাও কুফরি।

প্রশ্ন-২৫: আসার সময় এক হিন্দু বললেন, 'আমরা নাজাত পাব কি না'? হিন্দুরা কি নাজাত পাবে?

উত্তর: নাজাত পাওয়ার জন্য যে কোনো একটা লাইন ধরতে হবে। তিনি বেদ পড়ে দেখুন। নাজাত পাওয়ার মতো কী আছে সেখানে। নাজাত পেতে হিন্দুদের এক আল্লাহর ইবাদত করতে হবে। মূর্তিপূজা করা যাবে না এবং মুহাম্মাদ ﷺ কে

---

[১৪] সূরা: [৫] মায়িদা, আয়াত: ৩৫।

মানতে হবে।

প্রশ্ন-২৬: 'সাহেবে কুন ফায়াকুন মাওলানা'– এমন লকব ব্যবহার করার হুকুম কী?

উত্তর: সাহেবে কুন ফায়াকুন, মানে আল্লাহ যে কোনো জিনিস বললেই হয়ে যায়। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর এমন পাওয়ার আছে, এটা যে বলে, সে আবু জাহলের চেয়েও বড় মুশরিক। আবু জাহল কিন্তু কখনো বলত না লাত, মানাত, উজ্জা, ইবরাহীম, ইসমাঈল– এদের কাছে 'কুন ফায়াকুন' আছে। সে বলত, এদের কিছু সুপারিশ আল্লাহ শোনে। কাজেই যারা বলে, আমাদের হুযুর, পীর সাহেব, মাওলানা সাহেব 'কুন ফায়াকুনে'র মালিক, এদের চেয়ে বড় মুশরিক আর কিছু নেই। আল্লাহ তাঁর নবীকেও 'কুন ফায়াকুন' দেন নি। নবীজি ﷺ একটু বদদুআ করেছিলেন, আল্লাহ কুরআনের আয়াত নাজিল করলেন:

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

বিশ্ব পরিচালনা আপনার কাজ নয়। আপনি দাওয়াত দেবেন। কে ভালো, কে মন্দ, কার কী শাস্তি দেব, এগুলো আমার ব্যাপার।[১৫] এই জন্য কল্যাণ-অকল্যাণ, ভালো-মন্দ, কুন ফায়াকুন– একমাত্র আল্লাহর মালিকানায়। এটা যদি কোনো মানুষকে, জিনকে, ফেরেশতাকে, নবীকে, পয়গাম্বরকে বলা হয়, সে মুশরিক।

---

[১৫] সূরা: [৩] আল ইমরান, আয়াত: ১২৮।

তাহারাত/পবিত্রতা

প্রশ্ন-২৭: ইসতিনজা করার সুন্নাত পদ্ধতি কী? কুলুখ নিয়ে চল্লিশ কদম হাঁটাহাঁটির কোনো দলীল আছে কি না?

উত্তর: জি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবায়ে কিরাম, তাবিয়ীন, আমাদের চার ইমাম পেশাব করার পর কুলুখ নিয়ে হাঁটাহাঁটি করেছেন– এমন কোনো প্রমাণ নেই। তারা বসা অবস্থাতেই কুলুখ ব্যবহার করে পানি ঢালতেন। বসা অবস্থায় গলা খাকারি দেয়া, পুরুষাঙ্গ দুই তিনবার টান দেয়া– এরকম কিছু যয়ীফ বর্ণনা পাওয়া যায়। পরবর্তী ফকীহরা বলেছেন, যাদের রোগব্যাধি আছে, তারা যদি নিশ্চিত হন, দাঁড়ালে পেশাব হতে পারে, তারা হাঁটবেন। এটাকে ইসতিবরা বলা হয়। এটা সুন্নাতের ভেতর পড়ে না। প্রয়োজনের কাজ।

প্রশ্ন-২৮: পেশাব করার পর পুরুষাঙ্গ নেড়ে ধুয়ে ফেলার পরে হাঁটাচলার দ্বারা যদি পেশাবের ফোঁটা পড়ে তাহলে তার হুকুম কী?

উত্তর: আপনি যদি নিশ্চিত হন, যেখানে পড়েছে ধুয়ে ফেলতে হবে। দেহ পরিষ্কার করতে হবে। এটা ফরয। অর্থাৎ তাহারাত ফরয। কিন্তু সাধারণত এটা হয় না। যার হবে তিনি সতর্ক হবেন। পেশাব করার পরে উঠে দাঁড়ালে পেশাব পড়ে, এটা অসুস্থতা। এমনকি আপনি পেশাব করতে করতে মাঝখানেও যদি উঠে পড়েন, পেশাব বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ দেহটাকে এমন করে বানিয়েছেন। নিয়ন্ত্রণ দিয়েছেন। আপনি পেশাব অর্ধেক করে চেপে ধরে পানি ঢেলে উঠে পড়েন, পেশাব আর পড়বে না। এরপর আবার পেশাবের নির্দেশ দেন, আবার পড়বে। হাঁটতে হাঁটতে পেশাবের নির্দেশ দেন, পড়বে। ব্রেন যেমন নির্দেশ দেবে, ওটা তাই করবে। আপনি বাড়ি থেকে পেশাব করে হাসপাতালে গিয়েছেন, ডাক্তার বলল, পেশাব টেস্ট করব, পেশাব দেন, পেশাব নেই, বাথরুমে গিয়ে বসেন, কিছু পেশাব পড়বে। অর্থাৎ ব্রেন যখন নির্দেশ দেবে, কিছু পেশাব পড়বে। এই জন্য সাধারণ নিয়ম হল, পানি ব্যবহার করে উঠলে পেশাব হবে না। যদি কারো হয়, অবশ্যই সতর্ক থাকবেন। পরিচ্ছন্ন হবেন। হাঁটাচলা বলেন, কুলুখ ব্যবহার বলেন, টিস্যু ব্যবহার বলেন– পরিচ্ছন্ন হবেন।

প্রশ্ন-২৯: হাদীসে এসেছে: اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ 'তোমরা

পেশাব থেকে বেঁচে থাকো। কারণ পেশাবের জন্য কবরে বেশি আযাব হবে'।[১] এ ব্যাপারে আমাদের করণীয় কী?

উত্তর: পেশাব যেন গায়ে না লাগে, পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবিরা পেশাব করে বসা অবস্থায় পানি ঢেলে উঠে পড়েছেন। সাধারণভাবে এরপরে আর পেশাব হয় না। ওয়াসওয়াসায় ভুগবেন না। যদি কারো হয়, অবশ্যই তিনি সাধ্যমতো পবিত্র হবেন। তবে আমরা যেটা করি, অর্থাৎ পেশাব করার পরে হাঁটাচলা করি, এটা হল বসে পেশাব, দাঁড়িয়ে পেশাব, হেঁটে পেশাবের একটা বদঅভ্যাস। আপনি যতক্ষণ কাপড় উঁচু করে হাঁটতে থাকবেন, আর পেশাব করার জন্য ব্রেন নির্দেশ দেবে, কিছু হলেও বেরোবে। কিছু হলেও বেরোবে। কারণ ব্রেন বলছে কিছু বের হ। তখন ওর কিছু করার থাকে না। এ জন্য এটা একটা বদঅভ্যাসে পরণিত হয়। যদি কারো সত্যিকারের সমস্যা হয়, অবশ্যই সতর্ক হবেন। হাঁটাচলা করবেন। পরিচ্ছন্ন হবেন।

প্রশ্ন-৩০: কুলুখ না করলে নাকি নামায হয় না– কথাটা কতটুকু সঠিক?

উত্তর: কুলুখ শব্দের মানে আমার জানা নেই। এটা সম্ভবত ফারসি শব্দ। আরবিতে 'হাজার' বা পাথর ব্যবহারের কথা আছে। মাটি, পাথর, ঢিলা ইত্যাদি। পবিত্রতা অর্জন আমাদের জন্য ফরয। পানি ব্যবহার মূলত ফরয। পানি ব্যবহার করলে আর কোনোটাই লাগে না। পানির আগে ঢিলা-টিস্যু ইত্যাদি ব্যবহার করা মুসতাহাব। প্রথমে ঢিলা বা টিস্যু দিয়ে পরিষ্কার হয়ে এরপর পানি ব্যবহার করা, এটা ভালো। তবে এই পানি ঢিলা সবই বসা অবস্থায় ব্যবহার করতে হবে। এই যে আমরা হাঁটাচলা করি– এটা একান্ত কারো প্রয়োজন হলে করতে পারে। কিন্তু এটাকে আমরা রীতি বানিয়ে নিয়েছি। এটা হাদীসে পাওয়া যায় না। রাসূল ﷺ এর জীবনে পাওয়া যায় না। সাহাবিদের জীবনে পাওয়া যায় না। চার ইমামের জীবনে পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন-৩১: টয়লেটে টিস্যু পেপার ফেলা যাবে কি না?

উত্তর: যেখানে যে ব্যবস্থা থাকে সেটা করতে হবে। টিস্যু পেপার ভেতরে ফেললে সমস্যা হয় না। ওটা পানিতে গলে শেষ হয়ে যায়। বাইরে ফেলে রাখলে মানুষ কষ্ট পায়। এতে গোনাহ হবে। মুসলিমদের বাথরুমে গেলে দেখা যায়, টিস্যু পেপার চারপাশে ভরে আছে। কী সুন্দর দৃশ্য! টিস্যু কমোডে ফেলে পানি ছেড়ে দিলেই তো

---

[১] সুনান দারাকুতনি, হাদীস নং-৪৫৯, ৪৬৪।

হয়ে যায়। আর ঢিলা ভেতরে ফেললে জ্যাম হয়ে যাবে। কাজেই এটার জন্য পৃথক ব্যবস্থা রাখা উচিত।

প্রশ্ন-৩২: হাঁটুর উপর কাপড় উঠে গেলে ওযু ভাঙবে কি না?

উত্তর: ন্যাংটা হলেও ওযু ভাঙে না। মানুষের সামনে ন্যাংটা হওয়া হারাম কাজ। আপনার গোনাহ হবে। আর যদি বাথরুমের ভেতর ন্যাংটা হন, গোনাহ হবে না। তবে অনুচিত কাজ। কেউ না দেখা অবস্থায় যদি হাঁটুর উপরে কাপড় উঠে– অনুচিত কাজ। গোনাহ হবে। কিন্তু কোনোভাবেই ওযু ভাঙবে না। যেমন শুকরের মাংস খাওয়া হারাম, কিন্তু শুকরের মাংস খেলে ওযু ভাঙে না। গীবত করা তার চে বড় পাপ কাজ, তাই বলে ওযু ভাঙবে নাকি? ওযু ভাঙা একটা ভিন্ন বিষয় আর পাপ হওয়া ভিন্ন বিষয়।

প্রশ্ন-৩৩: ওযুর ক্রমধারা ঠিক না রাখলে ওযু হবে কি না?

উত্তর: ওযুর ক্রমধারা ঠিক রাখবেন না কেন! আল্লাহ কুরআনে ধারাবাহিকভাবে বলেছেন, আপনি উল্টাবেন কেন? তবে উল্টালে ওযু হবে কি হবে না, এটা নিয়ে ফুকাহাদের মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানীফা রাহ. বলেছেন, উল্টালে ওযু হয়ে যাবে। তবে ঠিক রাখা যে জরুরি, সবাই এ বিষয়ে একমত।

প্রশ্ন-৩৪: মগের ভেতর হাত ডুবিয়ে পানি নিয়ে ওযু করলে তা সহীহ হবে কি না?

উত্তর: হাত পরিষ্কার থাকলে কোনো অসুবিধা নেই। প্রথমে হাতটা ধুয়ে নিয়ে এরপর মগের ভেতর হাত দেবেন।

প্রশ্ন-৩৫: ওযুর সময় পানি অল্প বা বেশি ব্যবহার করার মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে?

উত্তর: জি, অল্প পানি ব্যবহার করে ওযু করা সুন্নাত। এতে সাওয়াব বেশি হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এক লিটার বা তার কম পানি দিয়ে ওযু হয়ে যেত। কাজেই অল্প পানি দিয়ে ওযু করা সুন্নাত। এতে ওযুর সাওয়াব ছাড়াও সুন্নাত পরিমাণ পানি ব্যবহারের সাওয়াব হবে। আর অতিরিক্ত পানি নষ্ট করলে, ট্যাপ ছেড়ে দিয়ে পানি পড়েই যাচ্ছে, এতে হাদীসের আলোকে গোনাহ হবে।

প্রশ্ন-৩৬: ফরয গোসলের কি নির্দিষ্ট কোনো সময়-সীমা আছে, যে সময়ের মধ্যে গোসল সম্পন্ন করতে হবে?

উত্তর: জি, না। গোসল ফরয হলে গোসল করতে হয় নামায পড়ার জন্য, কুরআন পড়ার জন্য। কাজেই একজন লোকের ফজরের নামাযের পরে গোসল ফরয হয়েছে, সে যুহরের আগে গোসল করেছে, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে নামায যেন কাযা না হয়। গোসল ফরয হলে বান্দা নামায পড়তে পারে না, কুরআন পড়তে পারে না। বাকি সব করতে পারে।

প্রশ্ন-৩৭: শিশু বাচ্চাকে কোলে নিয়ে কুরআন পড়তে পড়তে বাচ্চা পেশাব করে দিলে সেই অবস্থায় কি কুরআন পড়া যাবে?

উত্তর: কুরআনে পেশাব না পড়লেই হল। আপনার কাপড়ে পেশাব পড়লেও কুরআন পড়া যাবে। কাপড় নাপাক থাকলে কুরআন পড়া যায়।

প্রশ্ন-৩৮: বিনা ওযুতে কুরআন ধরলে, পড়লে কি গোনাহ হবে?

উত্তর: বিনা ওযুতে কুরআন ধরা হাদীসে নিষেধ আছে।

لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

এটা সহীহ হাদীস।[২] আর পড়াতে কোনো দোষ নেই।

প্রশ্ন-৩৯: অনেক আলিম বলে থাকেন, তিনবার 'বিসমিল্লাহ' বলে কাপড়ের পানি চিপে না ফেললে কাপড় পবিত্র হয় না। শরীআতে এর কোনো নিয়ম আছে কি না?

উত্তর: অর্থাৎ কাপড় ধোয়ার জন্য 'বিসমিল্লাহ' বলে তিনবার চিপা লাগবে কি না, এই হল প্রশ্ন। প্রথম কথা, সাধারণ কাপড় ধোয়ার জন্য ওসব কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু কাপড় যদি নাপাক হয়, আপনি জানেন কোন জায়গায় নাপাক লেগে আছে, তাহলে নাপাকি কাপড় থেকে ধুয়ে ফেলাটা হল জরুরি। যদি নাপাকির আকৃতি দেখা যায়– এটা দূর করাটা জরুরি, যতটুকু সম্ভব। এরপরে তিনবার ধোয়াটা জরুরি না। এটা সাবধানতা। কাপড়ের ময়লাটা ধুয়ে ফেলা জরুরি।

---

[২] মুআত্তা মালিক, হাদীস-২৩৪; তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-১৩২১৭; আল মু'জামুস সাগীর, হাদীস-১১৬২; সুনান দারাকুতনি, হাদীস-৪৩৯।

সালাত/নামায

প্রশ্ন-৪০: বুখারির হাদীসে আছে, ইকামত আযানের অর্ধেক। এবং মক্কা-মদীনার ইকামতও আযানের অর্ধেক। অথচ আমরা আযান ইকামত অভিন্ন দিয়ে থাকি। তাহলে কোনটা সঠিক হবে?

উত্তর: ইকামতে এই যে দুইবার করে আমরা বলি, এটাও সহীহ হাদীস। শাইখ আলবানি বলেছেন: هَذَا الحَدِيثُ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ। ডাবল শব্দে ইকামত দেয়া, আযানের মতোই ইকামত দেয়া এটার ব্যাপারে অনেকগুলো সহীহ হাদীস আছে। তার ভেতর একটাকে ইমাম/শাইখ আলবানি বলেছেন, এই হাদীসটা চূড়ান্ত সহীহ। কাজেই, একবার করে ইকামত দেয়া, দুইবার করে ইকামত দেয়া– দুটোই সহীহ। কিন্তু ওই যে দুর্ভাগ্য, মাযহাব মানেই হানাফিরা একটাকে বাতিল করার চেষ্টা করে, আর আহলে হাদীসের ভাইয়েরা হাদীস মানার নাম নিয়ে এই সহীহ হাদীসটাকে বাতিল বানানোর চেষ্টা করে।

প্রশ্ন-৪১: মসজিদে দ্বিতীয় জামাআতে ইকামত লাগবে কি না?

উত্তর: মসজিদে দ্বিতীয় জামাআতে ইকামত দেয়া ভালো। যদি দ্বিতীয় জামাআত করতেই হয়, ইকামত দেয়া ভালো। না দিলে দোষ নেই।

প্রশ্ন-৪২: বাড়িতে একাকি ফরয নামায পড়ার সময় ইকামত না দিলে নামায হবে কি না?

উত্তর: প্রথম কথা হল, ফরয নামায জামাআত ছাড়া বাড়ি কেন পড়বেন? তবে প্রশ্নটা যদি মহিলাদের জন্য হয়, সমস্যা নেই। পুরুষের জন্য এটা নাজায়িয প্রশ্ন। কোনো পুরুষের একা বাড়িতে নামায পড়া জায়িয নেই। রাস্তায় জীবনের নিরাপত্তা নেই এবং কঠিন অসুস্থতা– এই দুটো ওযর ছাড়া ঘরে নামায পড়া গোনাহের কাজ। ইকামতের প্রশ্নের চেয়ে জামাআতের প্রশ্ন অনেক জরুরি। এখন আপনার উত্তর হল, একা নামায পড়ার সময় ইকামত দেয়া ভালো। তবে ইকামত না দিলেও নামায হবে। কিন্তু জামাআত তরক করার গোনাহ হবে।

প্রশ্ন-৪৩: জায়নামাযের দুআ ছাড়া নামায হবে কি না?

উত্তর: নামাযের লাইসেন্স যদি বাঙালির হতে থাকত তাহলে কারোরই নামায হত না। জায়নামাযের দুআ বলে কিছু নেই।

প্রশ্ন-৪৪: জায়নামাযের দুআ কখন পড়তে হয়?

উত্তর: এটা খুবই অবাস্তব কথা। এই দুআটা হাদীসে নেই। ফিকহে নেই। জায়নামাযের কোনো সুন্নাত দুআ নেই। মাযহাবের চার ইমামের কেউ এটা বলেন নি। অনেক পরের যুগের কেউ কেউ এটা লিখেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহু আকবর বলার পরে কখনো পড়তেন–

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرَكَ

কখনো পড়তেন–

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

মাঝে মাঝে পড়তেন–

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المشْرِقِ وَالمغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ

কখনো অন্য সানা পড়তেন। এভাবে বিভিন্ন সানা পড়তেন। তিনি এককে সময় এককেটা পড়তেন।[১] কাজেই জায়নামাযের দুআ বলতে আমরা যেটা জানি, সেটা জায়ানামাযে দাঁড়ানোর দুআ নয়, ওটা সানা হিসেবে পড়তে পারেন।

প্রশ্ন-৪৫: ইমাম সাহেব সূরা ফাতিহা শুরু করে দিলে মুকতাদি তখন সানা পড়বেন কি না?

উত্তর: জাহরি নামাযে পড়বেন না। আপনার জন্য তখন শোনাটাই দায়িত্ব।

প্রশ্ন-৪৬: ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে চেয়ারে নামায পড়া নাজায়িয। শাহ মুহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ সাহেব এর প্রতিবাদ করেছেন। এ ব্যাপারে

---

[১] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-৭৭৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৭৭০, ৭৭১; সহীহ বুখারি, হাদীস নং-৭৪৪।

আপনার মতামত জানতে চাই।

উত্তর: দুই মতই তো পাওয়া গেছে। আমি গোনাহগার এর ভেতর ঢুকে আর কী করব! চেয়ারে বসা নিয়েও আমরা সীমালঙ্ঘন করছি। সারা বাড়ি হেঁটে বেড়াচ্ছি আবার চেয়ারে নামায পড়ছি। আবার নিষেধ করাতেও সীমালঙ্ঘন হয়ে যাচ্ছে। বিষয় হচ্ছে, ফরয নামায পড়তে যে ৪/৫ মিনিট সময় লাগে, এই সময়টুকু যে ব্যক্তি দাঁড়াতে পারবেন, তিনি ফরয নামায পুরোটাই দাঁড়িয়ে পড়বেন। অর্থাৎ রুকু দাঁড়িয়ে করবেন, সিজদা দাঁড়িয়ে করবেন, আত্তাহিইয়াতু দাঁড়িয়ে পড়বেন। আর যে ব্যক্তি এক দুই মিনিটও দাঁড়াতে পারেন না, তার জন্য সুন্নাত হল, মাটিতে বসে নামায পড়া। কীভাবে বসবেন, সেটা তার সুবিধা। আত্তাহিইয়াতুর মতো বসতে পারেন। অসুবিধা হলে আসন গেড়ে বসতে পারেন। তা না-হলে পা পশ্চিম দিকে লম্বা করে বসবেন। এভাবে তিনি মাটিতে বসেই নামায পড়বেন। রুকু-সিজদা ইশারায় দেবেন। কোনো অসুবিধা নেই। এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবিরা করেছেন। তবে অনেকের মাটিতে বসতেও অসুবিধা হয়। মাটিতে বসে আর উঠতে পারেন না। যদি কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে না পারেন, মাটিতে বসতে না পারেন, তিনি চেয়ারে বসে নামায পড়তে পারেন, ইনশাআল্লাহ, অসুবিধা হবে না। এটা হল ওযরের জন্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে যদিও চেয়ারে বসার রেওয়ায ছিল না, মাটিতে বসার রেওয়ায ছিল; তবে তিনি উটের পিঠে পা ঝুলিয়ে নফল নামায পড়তেন। এ জন্য যাদের ওযর আছে, দাঁড়াতে পারেন না, মাটিতে বসতে পারেন না, তারা চেয়ারে বসবেন ফরয নামাযের ক্ষেত্রে। আর সুন্নাত-নফল নামায চেয়ারে বসে পড়বেন, কোনো সমস্যা নেই।

প্রশ্ন-৪৭: নামাযের মধ্যে আমার জন্য দাঁড়ানো কষ্টকর। আবার পা ভেঙে বসতে পারি না। আমি কি চেয়ারে বসতে পারব?

উত্তর: আপনি মাটিতে বসে পা কিবলা দিকে লম্বা করে বসবেন। এটা সুন্নাত। অথবা আসন গেড়ে বসবেন। আপনি চেয়ারে বসবেন কেন! রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে পড়েছেন, সেটাই তো উত্তম। যদি মাটিতে মোটেও বসতে না পারেন চেয়ারে বসবেন।

প্রশ্ন-৪৮: ওযর ছাড়া মহিলারা বসে নামায পড়তে পারে কি না?

উত্তর: গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমরা আজকে মহিলাদের ওয়ায করতে পারলাম না। আপনারা জানেন না, মহিলারা ইবাদত করতে চায়, কিন্তু সুযোগ পান না প্রশ্ন করার। যাই হোক, ফরয নামায দাঁড়িয়ে পড়া ফরয। ওযর ছাড়া কোনো মহিলা

যদি ফরয নামায বসে পড়েন, নামায হবে না। নামায আদায়ই হবে না। সুন্নাত-নফল নামায বসে পড়লে অর্ধেক সাওয়াব হবে। কাজেই, মহিলারা অবশ্যই ফরয নামায দাঁড়িয়ে পড়বেন।

আর এই উপলক্ষে আরেকটা জরুরি কথা বলি– যদিও প্রশ্ন করেন নি– ফরয নামায, সুন্নাত নামায, নফল নামায– সকল নামাযে মহিলারা লক্ষ রাখবেন, কপালের চুল থেকে থুতনি পর্যন্ত, দুই কানের মধ্যবর্তী জায়গাটুকু এবং কব্জি পর্যন্ত– এই জায়গাটুকু বাদে শরীরের কোনো অংশ যদি বেরিয়ে থাকে, অন্ধকার ঘরে যদি একাও নামায পড়েন, তবুও নামায় ভেঙে যাবে। কাজেই শাড়ি পরে যে মহিলারা নামায পড়েন, খুব সাবধান থাকবেন, শাড়ি পরে নামায হয় না। শাড়ি পরে যত ভালো করেই ঢাকেন, রুকু-সিজদা করতে গেলেই খুলে যায়। শাড়ি একেবারেই অনৈসলামিক পোশাক। মহিলারা সব সময় সালোয়ার কামিজ, বড় ওড়না পরবেন অথবা বড় ম্যাক্সি নিচে পাজামা বা সায়া, উপরে ওড়না পরবেন। সব সময়। এটা সুন্নাত এবং ফরয পোশাক। আর নামাযে তো অবশ্য। এগুলো পরে নামায পড়বেন। মহিলা সাহাবিরা নামাযের সময় জিলবাব বা বোরকা পরে নিতেন। নামাযটা যেন সহীহ সুন্দর হয়। আর যারা শাড়ি পরেই পড়বেন, অবশ্যই শাড়ির উপরে বড় চাদর, বড় হাতাওয়ালা ব্লাউজ পরে নামায পড়বেন। নইলে নামায হয় না। কনুই-টনুই সব বেরিয়ে যায়। আর এই পর্দা কিন্তু শুধু নামাযে নয়। এই পর্দা আপনি আল্লাহর সামনে নামাযে করছেন। তাহলে বাইরের বেগানা পুরুষদের সামনে কীভাবে পর্দা করতে হবে– এটা আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারছেন।

প্রশ্ন-৪৯: আরবিতে নামাযের নিয়্যাত মুখে উচ্চারণ করা কতটুকু জরুরি?

উত্তর: এটা আসলেই বিদআত। মুজাদ্দিদে আলফে সানি রাহ. এটাকে বারবার বিদআত বলেছেন।

প্রশ্ন-৫০: নামাযে তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় যে আরবি নিয়্যাত পড়া হয়, এটা কি সহীহ।

উত্তর: নিয়্যাত তো মনে থাকবেই। এটা সহীহ। তবে আরবি নিয়্যাত– নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া– এটা মোটেও সহীহ না। নিয়্যাত করতে হয়, পড়তে হয় না।

প্রশ্ন-৫১: নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় আমার দৃষ্টি কোথায় থাকবে?

উত্তর: নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় দৃষ্টি থাকবে সিজদার স্থানে।

প্রশ্ন-৫২: সাহাবাগণ সবাই কি ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়তেন?

উত্তর: সবাই পড়তেন না। কেউ মোটেও পড়তেন না। কেউ জাহরি নামাযে পড়তেন না, সিররি নামাযে পড়তেন। বিভিন্ন হাদীস এসেছে। সহীহ হাদীস। রাসূলুল্লাহ ﷺ জাহরি নামাযে সূরা পড়তে নিষেধ করেছেন, এটাও হাদীসে এসেছে। শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানি রাহ. সব হাদীসের সমন্বয়ে লিখেছেন, যে নামাযে ইমাম জোরে কিরাআত পড়ে, এই নামাযে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়া মানসুখ হয়ে গেছে। এটা নবীজি ﷺ স্বয়ং নিষেধ করেছেন। আর যে নামাযে কিরাআত শোনা যায় না, সেই নামাযে সাহাবিরা ফাতিহা পড়তেন হাদীসে এসেছে। জাবিরের হাদীস।[২]

প্রশ্ন-৫৩: ইমামের পেছনে এক রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়া অন্য রাকআতে না পড়া হলে কি দোষ হবে?

উত্তর: বিভিন্ন রকমের হাদীস আছে। সিররি নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার হাদীস আছে। আবার মোটেও না পড়লেও নামায হবে, এমন হাদীসও আছে।

প্রশ্ন-৫৪: যুহরের নামাযে ইমামের পেছনে মুকতাদির সূরা ফাতিহা পড়া অথবা না পড়া কোনটা উত্তম? যদি পড়া উত্তম হয় তাহলে সূরা মিলাবে কি না?

উত্তর: সূরা ফাতিহার বিষয়ে হাদীসে তিন রকম কথা আছে। একটা হল, সব সময়ই মুকতাদি সূরা ফাতিহা পড়বে, সব ওয়াক্তের নামাযে। আরেকটা হল, কোনো নামাযেই পড়বে না। আরেকটা হল, যেখানে ইমামেরটা শোনা যায় না, সেখানে পড়বে। সকল হাদীসের সমন্বয়ে ফুকাহাদের মতে শেষেরটাই সর্বোত্তম। এ জন্য যেখানে ইমামের ফাতিহা পড়া শোনা যায় না, সেখানে আপনি পড়বেন। আমরা মনে করি, এটা বোধহয় হানাফি মাযহাবে নেই। একেবারে আসমান-যমিন করে ফেলি। কিন্তু শামসুল হক ফরীদপুরি রাহ. হানাফি মাযহাবের বিভিন্ন দলীল দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মনে মনের নামাযে মুকতাদি সূরা ফাতিহা পড়বে, এটা হানাফি মাযহাবের খুব জোরালো একটা মত। শামসুল হক ফরীদপুরি বলছেন– আপনি নীরবে দাড়িয়ে আছেন, শোনছেনও না বলছেনও না, বোকার মত দাড়িয়ে আছেন। সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলানোর কথা হাদীসে এসেছে, যে নামাযে ইমাম আস্তে কিরাআত পড়েন। ইশার শেষের দুই রাকআত একই হুকুমে আসবে। তবে কেউ যদি না পড়ে, তার নামায হয়ে যাবে। এটাও হাদীসে আছে। কাজেই এটা নিয়ে ঝগড়াঝাটিতে যেয়েন না। আরো মুশকিল আছে। আপনারা যখন নিশ্চুপ নামাযে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়বেন, দেখবেন আপনার শেষ হওয়ার

---

[২] আলবানি, সিফাতুস সালাহ, পৃ. ৯৮-১০০।

আগেই ইমাম রুকুয় চলে গেছে। তখন আবার ইমাম সাহেবের উপর রাগ হবে।

প্রশ্ন-৫৫: যুহর ও আসরের নামাযে আমার সূরা ফাতিহা শেষ করার আগেই যদি ইমাম সাহেব রুকুতে চলে যান, তখন আমি কী করব?

উত্তর: আপনিও রুকুতে চলে যাবেন।

প্রশ্ন-৫৬: একটা সূরা তিলাওয়াতের নিয়্যাত করে নামায শুরু করার পর যদি ভুলে অন্য সূরা পড়া হয়, নামাযের কোনো ক্ষতি হবে কি না?

উত্তর: কিছুই হবে না।

প্রশ্ন-৫৭: বাসায় ফজর এবং ইশার নামায একা পড়ার সময় আস্তে কিরাআত পড়লে নামায হবে কি না?

উত্তর: নামায তো ভাই হবে, কিন্তু জামাআত তরকের জন্য মহাগোনাহ হবে।

প্রশ্ন-৫৮: এক মসজিদে একজন ব্যক্তি খুব জোরে আমীন বলে। এতে অনেকের নামাযের অসুবিধা হয়। এটা কি ঠিক?

উত্তর: আপনারা আমীন জোরে বলেন বা আস্তে বলেন; কারোর বিরক্ত করবেন না। মুসল্লিদের কষ্ট হয় এমন কিছু করবেন না। জোরে আমীন, আস্তে আমীন– দুটোই হাদীসে এসেছে। যদি কেউ জোরে বলেন, এমনভাবে বলবেন যাতে আপনার সুন্নাতটা আদায় হয়ে যায়। খুব জোরে যদি বলেন, তাহলে আশেপাশের মুসল্লিদের অসুবিধা হয়। নামাযের মনোযোগ নষ্ট হয়। যেখানে সবাই জোরে বলে, সেখানে বেশি জোরে বললেও নামাযের মনোযোগ নষ্ট হয় না। সবাই এদিকে লক্ষ রাখবেন।

প্রশ্ন-৫৯: বিশ্বনবী ﷺ কেন রাফউল ইয়াদাইন করতেন?

উত্তর: আপনি তো অনেক দূর চলে গেছেন। তিনি কেন নামায পড়তেন সেটাই তো আমি জানি না। নামায আরম্ভ করার সময় আমরা সবাই তো রাফউল ইয়াদাইন করি। রাফউল ইয়াদাইন করে না এমন মুসলিম কম। শুধু মালিকি মাযহাবের মানুষেরা রাফউল ইয়াদাইন মোটেই করে না। একেবারে টনটনে হাত ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। রাফউল ইয়াদাইন রাসূলুল্লাহ ﷺ কেন করতেন, এটা আমি জানি না ভাই। তবে আপনারা যে বলেন, বগলের ভেতর পুতুল নিয়ে থাকত সাহাবিরা, তাই নবীজি ﷺ রাফউল ইয়াদাইন করতেন, এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নামে জঘন্য মিথ্যা কথা। পুতুল বগলে নিয়ে নামায পড়ত তাই রাফউল ইয়াদাইন করত। প্রথমেই তো রাফউল ইয়াদাইন করা হয়। তাহলে তো প্রথমেই পুতুল পড়ে গেল। বারবার

রাফউল ইয়াদাইনের দরকার কী! তাছাড়া রাফউল ইয়াদাইন করলে কি পুতুল পড়ে? রাফউল ইয়াদাইন কি হাত ফাঁক করে করা হয়? আবার রুকুতে গেলে কি পুতুল থাকে বগলে? পাগল না হলে এই কথা বলতে পারে? পুতুল নিয়ে মুনাফিকরাও নামায পড়তে যেত না। নিফাকি থাকত তাদের ভেতরে। বাইরে নয়। বড় দুঃখ লাগে, সহীহ হাদীস রদ করতে আমরা বড়ই পারঙ্গম। আহলে হাদীসরা নিজেদের মতের বাইরে সহীহ হাদীস পেলেই বলবে এটা বাতিল। আবার হানাফিরা বলবে এটা মানসুখ (রহিত)। যে হাদীসের সনদ সহীহ সেটা সহীহ হাদীস। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পরে অসংখ্য সাহাবি রাফউল ইয়াদাইন করেছেন। তাবিয়িরা আমল করেছেন। কাজেই রাফউল ইয়াদাইন সহীহ সুন্নাত। আবার রাফউল ইয়াদাইন না করাও সহীহ সুন্নাত। শুধু একবার করাও সহীহ হাদীসে আসছে। কাজেই যারা একবার করছেন তারাও সহীহ হাদীসের আমল করছেন। যারা বারবার করছেন তারাও সহীহ হাদীসে আমল করছেন। সহীহ হাদীসকে বাতিল করার জন্য নানান যুক্তি দেয়া– এটা ঠিক নয়। তবে এই ব্যাপারে কেউ কম না। হানাফিরাও কম না। আহলে হাদীসরাও কম না। এককেবারে সমান সমান।

প্রশ্ন-৬০: আমি রাফউল ইয়াদাইন করি। কিন্তু যেখানে নামায পড়ি সেখানকার ইমাম রাফউল ইয়াদাইন করেন না। আমি ইমামকে অনুসরণ করব নাকি যে কোনো একটা করলেই হবে?

উত্তর: আমরা অনেকেই মনে করি, ইমাম যদি রাফউল ইয়াদাইন না করেন আর মুক্তাদি করে তাহলে ইমামের অনুসরণ হল না– কথাটা ঠিক নয়। ইমামের অনুসরণ রুকু-সিজদা ইত্যাদিতে। ইমাম এক তাসবীহ পড়েন আমি আরেক তাসবীহ পড়ি, ইমাম এক দুআ পড়েন আমি আরেক দুআ পড়ি– কোনো সমস্যা নয়। যদি তাই হয়, তাহলে আমরা হানাফিরা যারা মক্কায় গিয়ে হজ্জ করি, আমাদের কারো হজ্জ হয় না। কারণ ইমাম তো রাফউল ইয়াদাইন করেন। আমরা তো করি না। এসব ক্ষেত্রে যিনি যেটাকে উত্তম মনে করেন তিনি সেটার উপর আমল করতে পারেন।

প্রশ্ন-৬১: প্রতি রাকআতে রুকুতে 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলার পরে 'হামদান কাসীরান তায়্যিবান মুবারাকান ফীহ' বলাটা কি সুন্নাত সম্মত?

উত্তর: অবশ্যই সুন্নাত। 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বা 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' অথবা 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ'– এগুলো হল সর্বনিম্ন পরিমাণ। এর সাথে হামদান কাসীরান তায়্যিবান মুবারাকান ফীহ: [حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ]

বলাটা তো ভালো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন। সাহাবারা বলেছেন।[৩]

প্রশ্ন-৬২: রুকুতে থাকা অবস্থায় দৃষ্টি কোথায় থাকবে?

উত্তর: রুকুতেও সিজদার স্থানেই রাখা উচিত। কারণ রুকুর কথা হাদীসে নেই। তবে রুকুতে থাকা অবস্থায় পিঠ এবং মাথা সমান করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন। আপনার সিজদার জায়গায় তাকাতে গিয়ে যদি মাথা উঁচু হয়ে যায় তাহলে মাকরুহ হবে। কাজেই স্বাভাবিকভাবে দৃষ্টি যেখানে যায়, সেখানে রাখবেন, কোনো সমস্যা নেই।

প্রশ্ন-৬৩: রুকুর সময় কোন জায়গায় তাকাতে হয়? দুপায়ের মাঝখানে নাকি সিজদার জায়গায়?

উত্তর: আসলে ঝগড়ার তো শেষ নেই। রুকুর সময় কোনদিকে তাকাবেন, এটা হাদীসে স্পষ্ট নেই। যারা বলেন দু'পায়ের মাঝখানে, তারা ঠিক বলেন না। এটা আন্দাযে বলা। রুকুর সময় কোথায় তাকাতে হবে, এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ ঠিক করে দেন নি। কিন্তু রুকুর সময় মাথা এবং কোমর সোজা থাকবে, এটা ঠিক করে দিয়েছেন। তো মাথা সোজা রাখলে নযরটা স্বাভাবিকভাবে যেখানে যায়, সেখানে দেবেন। তবে এমনিতে সালাতের ভেতর (রুকুতে না, পুরা সালাতের কথা বলা হয়েছে) নযর সিজদার দিকে থাকবে, এটা হাদীসে এসেছে। কাজেই অন্যকোনো হাদীস না-আসা পর্যন্ত ধরে নিতে হবে নযর সিজদার জায়গায় থাকবে। তবে অন্য একটা হাদীস আছে, তাশাহহুদের সময় হাতের আঙুল ইশারা করা এবং আঙুলের দিকে নযর দেয়া। বাকি সব সময় নযর সিজদার দিকে থাকবে, এটা হাদীস থেকে বোঝা যায়। তবে সিজদার দিকে তাকাতে গিয়ে যদি মাথা উঁচু করে ফেলেন তাহলে রুকুর ক্ষতি হবে।

প্রশ্ন-৬৪: মুকতাদি রুকু-সিজদায় ইমামের চেয়ে তাসবীহ বেশি পরিমাণ পড়লে নামাযের কোনো ক্ষতি হবে কি না?

উত্তর: ইমাম আত্তাহিয়্যাতু পড়লেন, আর মুকতাদি একটু টেনে পড়লেন আত্তাহিয়্যা.....তু, মুকতাদির নামায ভেঙে যাবে? এগুলো আপনার কই পান? ইমাম ইমামের মতো পড়বে। আপনি আপনার মতো পড়বেন। বেশি কমের কারণে যদি নামায ভেঙে যায়, তাহলে প্রত্যেক নামাযের আগে ইমাম সাহেবকে সাইনবোর্ড

---

[৩] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-৭৯৯; সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-৭৭০; সুনান নাসায়ি, হাদীস নং-১০৬২।

টাঙিয়ে দিতে হবে– 'আজকে আমি এতবার তাসবীহ পড়ব, আপনারা কেউ এর বেশি পড়বেন না'। বাহ্যিক আচরণে ইমামের অনুসরণ করতে হয়। ইমাম দুআ মাসুরা একটা পড়ে, আমি অন্যটা পড়তে পারি। ইমাম সিজদায় এক তাসবীহ পড়ে, আমি অন্য তাসবীহ পড়তে পারি।

প্রশ্ন-৬৫: সিজদায় কি নাক-কপাল একসাথে মাটিতে থাকবে?

উত্তর: জি। যতক্ষণ সিজদায় থাকবেন, নাক এবং কপাল দুটোই একসাথে মাটিতে থাকবে।

প্রশ্ন-৬৬: সিজদায় অনেকের নাক উঁচু হয়ে যায়, এতে নামায হবে কি না?

উত্তর: এটা খুব জরুরি কথা। নামাযে সিজদায় গিয়ে নাক এবং কপাল দুটোই মাটিতে রাখতে হবে। নাক উঠে গেলে সিজদা মাকরুহ হবে। কেউ কেউ বলেছেন, সিজদাই হবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যতক্ষণ কপাল মাটিতে থাকবে ততক্ষণ নাক মাটিতে থাকতে হবে।[৪]

প্রশ্ন-৬৭: নফল নামাযের সিজদায় মাতৃভাষায় দুআ করা যাবে কি না?

উত্তর: অনেক আলিম মাকরুহ বলেছেন। কেউ মাকরুহ তাহরীমি, কেউ মাকরুহ তানযীহি বলেছেন। আরবি দুআ মুখস্ত করার চেষ্টা করবেন। তবে অনেকেই জায়িয বলেছেন। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের আলিমরা– মিশর, সৌদি আরবের আলিমরা নফল নামাযের সিজদায় মাতৃভাষার দুআ জায়িয বলেছেন। তবে মাতৃভাষায় দুআ করতে গিয়ে উল্টাপাল্টা হয়ে যায়, তাই সুন্নাত দুআ হলে ভালো হয়।

প্রশ্ন-৬৮: চার রাকআত নামাযে ইমামের সাথে এক রাকআত নামায পেলাম। ইমামের সাথের বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ শরীফ এগুলো পড়তে হবে কি না?

উত্তর: শুধু আত্তাহিয়্যাতু পড়ে বসে থাকাটাই নিয়ম। বেশি পড়ে ফেললে সমস্যা নেই।

প্রশ্ন-৬৯: তাশাহহুদের বৈঠকে শাহাদত আঙ্গুল উঠানোর ব্যাপারে বিস্তারিত জানাবেন।

উত্তর: রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশারা করতেন, ইশারার কথা অনেক হাদীসে এসেছে। তবে

---

[৪] তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস নং-১১৯১৭; আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস নং-৪১১১।

ইশারাটা কতক্ষণ করতেন, এটা হাদীসে নেই। তবে তিনি দুআও ইশারা করতেন, তাশাহুদও ইশারা করতেন। এই জন্য কোনো কোনো আলিম বলেছেন, 'আশহাদু আল-লা-ইলাহা'র সময় ইশারা হবে। তাওহীদের ইশারা। এরপরে আঙ্গুল উঁচুই থাকবে। কেউ সামান্য নামাতে বলেছেন। কেউ বলেছেন, তাশাহহুদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইশারা থাকবে। আপনি যে মতই মানেন, ইনশাআল্লাহ, ইশারার মুস্তাহাব সুন্নাত আমল আদায় হয়ে যাবে। তবে আমি যেটা বুঝেছি, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইশারাটা রাখাই উত্তম।

প্রশ্ন-৭০: নামাযে দ্বিতীয় বৈঠক এবং চতুর্থ বৈঠকে কীভাবে বসতে হবে?

উত্তর: যেভাবেই বসেন, হবে। আসন গেড়ে বসতে পারেন। পা লম্বা করে বসতে পারেন। আমি বুঝতে পারছি, কী প্রশ্ন করেছেন। আসলে ঝগড়া ছাড়া মুসলিমদের কাজ নেই। আমরা যেভাবে বসি, অর্থাৎ বাম পা ভেঙে দিয়ে ডান পা খাড়া রাখা– প্রথম বৈঠকে এভাবেই বসতে হবে। শেষ বৈঠকে বসার ব্যাপারে এই ব্যবস্থাও আছে, আবার অন্য একটা ব্যবস্থাও আছে। ওটাকে তাওয়ার্রুক বলে। অর্থাৎ, ডান পা খাড়া থাকবে, বাঁ পা ডান পায়ের নিচে দিয়ে বাইরে চলে যাবে। নিতম্বের উপর বসা হবে। এটাও হাদীসে আসছে। ফুকাহাদের মতভেদ আছে। কিন্তু ঝগড়ার হাদীস আমি পড়ি নি। ঝগড়া শুনলে রাগ হয়।

প্রশ্ন-৭১: পিস পাবলিকেশন্সের একটা বইয়ে দেখলাম, নামাযের মধ্যে প্রথম রাকআতের চেয়ে দ্বিতীয় রাকআত দীর্ঘ করলে গোনাহ হয়। হাদীসটা কতটুকু সহীহ?

উত্তর: এটা ঠিক নয়। পিস পাবলিকেশন্সের বই তো কোনো ভালো আলিমের লেখা নয়। তারা বিভিন্ন বই সঙ্কলন করেন। মোটামুটি আকর্ষণীয় বই আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু নির্ভরযোগ্য আলিমকে দিয়ে কাজ করান না। কারণ আলিমদের দিয়ে কাজ করাতে গেলে পয়সা দিতে হয়। এতে পাবলিকেশন্সের আয় কমে যায়। আসলে রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক নামাযেই দ্বিতীয় রাকআত দীর্ঘ করেছেন। আর দ্বিতীয় রাকআত দীর্ঘ করলে গোনাহ হয়, এটা হাদীসে কোথাও নেই। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমুআর নামাযে, ইশার নামাযে, ঈদের নামাযে কখনো কখনো প্রথম রাকআতে সূরা আলা পড়তেন, দ্বিতীয় রাকআতে পড়তেন গাশিয়াহ। দ্বিতীয় সূরাটা কিন্তু প্রথম সূরার চেয়ে ৫/৬ আয়াত বেশি।

প্রশ্ন-৭২: ভুলক্রমে দরূদ না পড়ে সালাম ফেরালে নামাযের কোনো ক্ষতি হবে কি না?

উত্তর: নামায হয়ে যাবে। একটা সুন্নাত নষ্ট হবে। ইচ্ছা করে বারবার করলে গোনাহ হবে। দু-একবার হলে নামায, ইনশাআল্লাহ, হয়ে যাবে।

প্রশ্ন-৭৩: নামাযের পরে বা যে কোনো সময় দলবদ্ধ হয়ে হাত তুলে মুনাজাতের কোনো হাদীস আছে কি না?

উত্তর: রাসূলুল্লাহ ﷺ মাঝেমাঝে দলবদ্ধ হয়ে হাত তুলে দুআ করেছেন। একজন দুআ চেয়েছেন, নবীজি হাত তুলেছেন, সবাই হাত তুলেছে। শুক্রবারে একজন এসে বলছে, হুযুর বৃষ্টি হয় না, দুআ করেন। নবীজি হাত তুলেছেন, সাহাবিরাও হাত তুলেছেন। দুআ করেছেন। মাঝেমাঝে তিনি দলবদ্ধভাবে হাত তুলে দুআ করেছেন। এটা সহীহ হাদীসে এসেছে। কিন্তু নিয়মিত দলবদ্ধ হয়ে দুআ করেন নি। নামাযের পরে হাত না তুলে একা দুআ করেছেন, অনেক হাদীস আছে।

প্রশ্ন-৭৪: নামাযের পরে সমষ্টিগতভাবে মুনাজাত করা যাবে কি না?

উত্তর: **এহইয়াউস সুনান** পড়েন। একাকি মুনাজাতই সুন্নাত। তবে সমষ্টিগত মুনাজাত নিয়ে ঝগড়া করবেন না। আপনি সুন্নাত মতো চলার চেষ্টা করেন। সাধারণ মানুষ, যারা নামাযই বোঝে না, আপনি মুনাজাত নিয়ে মারামারি শুরু করে দিলেন। এটা খুবই দুঃখজনক। আমি আমার জন্য সুন্নাতের ব্যতিক্রম মেরে ফেললেও যেতে রাজি নই। কিন্তু সাধারণ মানুষ, যারা বোঝে না, মুনাজাতও বোঝে না, নামাযও বোঝে না, কোনো রকম নামাযটা পড়ে, এদের জন্য এটা নিয়ে ঝগড়া করবেন না। এটা বিদআতে ইযাফিয়্যাহ। নামাযের পরে মুনাজাত সুন্নাত। পদ্ধতি হল একাকি করতে হবে। হাত তুলে বা হাত না তুলে একাকি। আর সমষ্টিগতভাবে করা হলো সুন্নাতের খেলাফ। এটাকে সুন্নাত মনে করলে, সুন্নাতের চেয়ে উত্তম মনে করলে, রেগুলার করলে বিদআতে ইযাফিয়্যাহ হয়ে যাবে। এটা আমরা না করার চেষ্টা করব। কিন্তু এটা নিয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে ঝগড়া করবেন না। মুসলিমদের কাজ হল ছোটখাটো কিছু পাইলেই ঝগড়া করা। নামায পড়ার খোঁজ নেই, আমীন আস্তে বলে, না জোরে বলে– এই নিয়ে মারামারি। এটা খুবই দুঃখজনক।

প্রশ্ন-৭৫: জামাআতের নামাযে যিনি এক রাকআত মিস করেছেন, তিনি ইমামের সাথে দরূদ, দুআ মাসুরা পড়বেন কি?

উত্তর: মাসবুক ইমামের সাথে তাশাহুদ পর্যন্ত পড়বেন। যদি বেশি পড়ে ফেলেন, সমস্যা নেই।

প্রশ্ন-৭৬: মুহাম্মাদ ﷺ এবং আবু বাকর رضي الله عنه নাকি নিষেধ করে গেছেন যে, মহিলারা

জামাআতে নামায আদায় করবে না। এটা কি সত্য?

উত্তর: জি না। আমার জানা নেই। মুহাম্মাদ ﷺ বলে গেছেন, মেয়েরা জামাআতে গেলে নিষেধ করবে না। উনি মেয়েদের জামাআতে যেতে নিষেধ করেছেন, এটা আমার জানা নেই। কোনো হাদীসে থাকলে আমাকে দেবেন। আমার জানা মতে এটা পুরোটা মিছে কথা। আবু বাকর ؓ মেয়েদেরকে নিষেধ করেছেন, কোথাও নেই। উমার ؓ অপছন্দ করতেন। কিন্তু নিষেধ করেন নি। তারাবীহর জন্য জামাআত করেছেন। তবে আমাদের ফকীহরা– ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফিয়ি– তাঁরা ফিতনার কারণে মেয়েদের মসজিদে যাওয়াকে মাকরূহ বলেছেন।

প্রশ্ন-৭৭: মিসওয়াক করে জামাআতে নামায পড়ার ফযীলত কী?

উত্তর: মিসওয়াক করে নামায পড়লে চল্লিশ [সত্তর] গুণ বেশি সাওয়াব হবে এমন হাদীস আছে। অবশ্য হাদীসটা একটু দুর্বল।[৫]

প্রশ্ন-৭৮: মুকতাদি ইমামকে রুকু অবস্থায় পেল, কীভাবে জামাআতে শরিক হবে? তাকবীরে তাহরীমা বলবে নাকি ডাইরেক্ট রুকুতে চলে যাবে?

উত্তর: মুকতাদির জন্য প্রথম একটা ফরয আছে। সেটা হল তাকবীরে তাহরীমা বলা। আর তাকবীরে তাহরীমা দাঁড়িয়ে, পিঠ সোজা অবস্থায় বলা ফরয। হাত তোলা সুন্নাত। কাজেই আপনি হাত তুলে 'আল্লাহু আকবার' বলবেন। হাত বাঁধাটা জরুরি নয়। দ্বিতীয়বার আল্লাহু আকবার বলাটা সুন্নাত। দ্বিতীয়বার আল্লাহু আকবার বলেন অথবা না বলেন, রুকুতে যেতে হবে। মূল নিয়ম হল, প্রথমে দাঁড়ানো অবস্থায় আল্লাহু আকবার বলবেন। এরপর দ্বিতীয়বার আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যাবেন। যদি ইমাম রুকু থেকে ওঠার আগেই আপনি ইমামকে রুকুতে ধরতে পারেন তাহলে রাকআত পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন-৭৯: জামাআতের নামাযে প্রথম বা শেষ বৈঠকে যদি তাশাহহুদ ভুল হয়, তাহলে মুকতাদি কী করবে?

উত্তর: কিছুই করার নেই। কিছু করতে হবে না।

প্রশ্ন-৮০: সামনের কাতার ফাঁকা থাকা অবস্থায় নাবালিগ শিশুরা কোথায় দাঁড়াবে?

উত্তর: সুন্নাত হল, নাবালিগ শিশুরা পরের কাতারে দাঁড়াবে। সামনের কাতারে ফাঁক

---

[৫] মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২৬৩৪০; মুসনাদ বাযযার, হাদীস-১০৮; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-১৩৭; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৫১৫।

থাকলে সমস্যা নেই। পরে বড়রা এসে পূরণ করবে। তবে নামায শুরু করার পরে যদি সামনের কাতারে ফাঁকা থাকে আর বাচ্চারা এসে দাঁড়িয়ে যায়, সমস্যা নেই।

প্রশ্ন-৮১: তিনতলা বিল্ডিংয়ের নিচতলা এবং তৃতীয় তলায় জামাআত হওয়া জায়িয কি না?

উত্তর: তিনতলাতেই জামাআত হওয়া উচিত। নিচতলা আর তৃতীয় তলায় জামাআত হল, দ্বিতীয় তলায় হল না, এটা ঠিক নয়।

প্রশ্ন-৮২: স্বামী-স্ত্রী একসাথে ঘরে ফরয নামায পড়া যাবে কি না?

উত্তর: স্বামীর জন্য ফরয নামাযের জামাআত ফরয। ওযর ছাড়া ঘরে পড়বেন না। আর স্ত্রী ফরয নামায ঘরে পড়বে। ঘরে সাধারণত জামাআত হয় না। তবে কোনো ওযরে যদি ঘরে নামায পড়তে হয়, স্বামী-স্ত্রী একসাথে জামাআত করতে পারেন। তবে শর্ত, স্বামী এবং স্ত্রীর কাতার আলাদা হতে হবে। পুরুষ এবং নারী এক কাতারে গায়ে গায়ে লাগিয়ে দাঁড়ানো– এটা নামাযের মনোযোগ নষ্ট করে।

প্রশ্ন-৮৩: ফজরের সুন্নাত নামায যদি আগে পড়তে না পারি তাহলে কখন পড়ব? হাদীস দ্বারা কোনটা সঠিক? সূর্য ওঠার আগে না পরে?

উত্তর: দুটোই সঠিক। সূর্য ওঠার পরেও সহীহ হাদীসে এসেছে। ফজরের নামাযের জামাআত শেষ করার পরেও সহীহ হাদীস এসেছে। কাজেই আপনি যদি জামাআতের পরে পড়ে নিতে চান, কোনো দোষ নেই। আর আমার যতটুকু মনে পড়ছে, আমি সম্ভবত হযরত আশরাফ আলী থানবি রাহ.র **বেহেশতি জেওরে** পড়েছি, উনি নিজে লিখেছেন, যদি সূর্য ওঠার পরে ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে জামাআতের পরেই পড়ে নেয়া উচিত। অর্থাৎ ফিকহ এবং হাদীস উভয় দিক থেকে এতে কোনো আপত্তি নেই।

প্রশ্ন-৮৪: জুমুআর দিনে আযানের একঘণ্টা আগে মুসল্লিদের স্মরণ করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে ডাকডাকি করা জায়িয আছে কি না?

উত্তর: মসজিদের মিম্বার ব্যবহার করে কোনো ডাকাডাকি জায়িয নেই। তবে মানুষেরা নিজেরা নিজেরা দাওয়াত দিতে পারে– 'এই ভাই, নামাযের সময় হয়ে যাচ্ছে, চলেন যাই'। এটা ঠিক আছে। এটা আমর বিল মা'রুফ।

প্রশ্ন-৮৫: জুমুআর দিনে অনেককেই দেখা যায় পরে মসজিদে এসে কাঁধ ডিঙিয়ে সামনে যায়– এর বিধান কী?

উত্তর: জুমুআ এবং সকল জামাআতে মানুষের কাঁধের উপর দিয়ে যাওয়াটা গোনাহের কাজ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

যে ব্যক্তি জুমুআর দিনে গোসল করবে, আতর মাখবে, সকাল সকাল জুমুআয় যাবে, দুইজনকে ফাঁক করবে না, মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে যাবে না, ইমামের কথা মন দিয়ে শুনবে, আল্লাহ তার পূর্ববর্তী সাতদিনের গোনাহ মাফ ছাড়াও অতিরিক্ত তিনদিনের বোনাস দান করবেন।[৬] মানুষের মাথার উপর দিয়ে যাওয়া গোনাহের কাজ। তবে কেউ যদি দেখে সামনে জায়গা রেখে পেছনে বসেছে, তাহলে তো পেছনে যে বসেছে, সে অন্যায় করেছে। নিজের হক নষ্ট করে পেছনে বসেছে। সেক্ষেত্রে সামনে যাওয়া যাবে। অর্থাৎ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সামনে জায়গা আছে, তাহলে পেছন থেকে আসা যায়। আর সাধারণ নিয়ম হল, যারা পরে আসবেন, তারা পরে বসবেন। যখন কাতার দাড়াবে তখন যতদূর পারা যায় এগিয়ে আসবেন।

প্রশ্ন-৮৬: জুমুআর দিনে দুই আযান দুইব্যক্তি দিলে হবে কি না?

উত্তর: এখানে মাসআলা দুটো। যিনি আযান দেবেন তিনি ইকামত দেবেন কি না? একটা যয়ীফ হাদীস আছে–

مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ

'যে আযান দেবে সে ইকামত দেবে'।[৭] এটা মুস্তাহাব। কাজেই একজন আযান দিয়েছে আরেকজন ইকামত দিয়েছে– কোনো সমস্যা নেই। নামাযের কোনোই ক্ষতি হবে না। আযান যিনি দিয়েছেন তার ইকামত দেওয়া উত্তম। এখন মাসআলা হল জুমুআর দিনে আযান দুটো। প্রথম আযান যেটা, এটা এক্সট্রা। দ্বিতীয় আযান যিনি দেবেন তিনি ইকামত দেয়াটা মুস্তাহাব। তবে অন্য কেউ ইকামত দিলে অসুবিধা নেই। যেমন খুতবা যিনি দেবেন, তিনি নামায পড়ানো উত্তম। তবে যদি অন্য কেউ নামায পড়ায়, নামাযের কোনো ক্ষতি হবে না। এগুলো মুসতাহাব বিষয়।

---

[৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৮৫৭; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-২১৫৬৯; সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-৩৪৩; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস নং-১৭৬৩

[৭] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-৫১৪; সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-১৯৯; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং-৭১৭; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-১৭৫৩৮।

প্রশ্ন-৮৭: তারাবীহ আর তাহাজ্জুদ এক নাকি আলাদা?

উত্তর-: তারাবীহ আর কিয়ামুল লাইল এক। আর ঘুমের থেকে উঠে পড়লে হয় তাহাজ্জুদ। এটা আমার রাহে বেলায়াতে বিস্তারিত আছে।

প্রশ্ন-৮৮: তাহাজ্জুদ নামাযের নিয়্যাত করার পরপরই যদি আযান শুরু হয় তাহলে কী করব?

উত্তর: ওই দুই রাকআত পড়ে নেবেন। আরেকটা বিষয় খেয়াল রাখবেন, আমাদের দেশে আযান ওয়াক্ত মতো হয় না। মানে ওয়াক্তের শুরুতে আযান হয় না। এই জন্য ফজরের ওয়াক্ত কখন শুরু হয় পেপার থেকে অথবা অন্য মাধ্যমে জেনে নেবেন। যেমন মনে করেন, আজকে ফজরের ওয়াক্ত হয়েছে চারটে বায়ান্ন মিনিটে। অনেক মসজিদে দেখবেন পাঁচটা দশ বা পনেরো মিনিটে আযান দিয়েছে। দেরি করে। রমাযান বাদে কেউ নিয়ম-কানুন মানে না।

প্রশ্ন-৮৯: প্রতিদিন তাহজ্জুদ পড়ার চেষ্টা করি। মাঝেমাঝে মিস হয়। তাহলে কি এর কাযা করা লাগবে?

উত্তর: আপনাদের একটা সুসংবাদ দিই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেউ তাহাজ্জুদ পড়ার নিয়্যাত করে শুয়েছে। কিন্তু ঘুম এমনভাবে এসেছে, ফজরের আযান হয়ে গেছে, এক্ষেত্রে তার ঘুমটা হবে সাদাকাহ এবং তাহাজ্জুদের পুরো সাওয়াব আল্লাহ তার আমলনামায় লিখে দেবেন যদি নিয়্যাত জোরালো হয়।[৮] দুই নাম্বার হল, যারা নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়েন, তাদের যদি দু-একদিন মিস হয়, তারা দিনের বেলা পড়বেন। রাতের পূর্ণ সাওয়াব পেয়ে যাবেন।

প্রশ্ন-৯০: রাসূলুল্লাহ ﷺ কি তাহাজ্জুদ নামায নিয়মিত পড়তেন?

উত্তর: জি, নিয়মিত পড়তেন। কখনো ছাড়তেন না। এবং নিয়মিত পড়তে আদেশ করেছেন, ছাড়তে আপত্তি করেছেন। রাতে কিছু সময়ের জন্য হলেও, না পারলে অন্তত ঘুমাতে যাওয়ার আগে কিয়ামুল লাইল হিসেবে কিছু রাকআত পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের দেশে যুবকরা তাহাজ্জুদ পড়লে (অন্যরা) বলে, 'এত অল্প বয়সে তাহাজ্জুদ পড়ছিস, ধরে রাখতে পারবি তো'! অথবা 'তোর তো এখনো তাহাজ্জুদ পড়ার বয়স হয় নি'! 'অন্ধকারে পড়তে হয়... হেনতেন...' আরো অনেক আজগুবি মিছে কথা। অথচ আয়িশা ؓ যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেন:

---

[৮] সুনান নাসায়ি, হাদীস নং-১৭৮৭; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং-১৩৪৪; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস নং-১১৭২; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস নং-১১৭০।

لَا تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدَعُهُ...

তুমি কখনোই কিয়ামুল লাইল ছাড়বে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কিয়ামুল লাইল ছাড়তেন না। উনি অসুস্থ থাকলে বসে হলেও পড়তেন।[৯] রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শ্যালক আব্দুল্লাহ ইবন উমার رضي الله عنه। তার বয়স তখন ১৫ অথবা ১৬। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেছেন:

نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ

আব্দুল্লাহ খুবই ভালো যুবক, যদি একটু তাহাজ্জুদ পড়ত।[১০]

প্রশ্ন-৯১: তাহাজ্জুদ নামায সুন্নাত না নফল?

উত্তর: ইসলামে দুটো জিনিস আছে। ফরয আর নফল। ফরয বাদে আর যা কিছু আছে সবই নফল। যে নফলগুলো নবীজি ﷺ নিয়মিত করতেন সেগুলোকে সুন্নাত বলে। সুন্নাতও নফল। কাজেই তাহাজ্জুদ একই সাথে নফল এবং সুন্নাত।

প্রশ্ন-৯২: তাহাজ্জুদের নামাযে বহুবার সূরা ইখলাস পড়া যাবে কি না?

উত্তর: যাবে। এক সূরা বারবার পড়া অথবা পাঁচটা সূরা প্রথম রাকআতে পড়ে ওই পাঁচটা সূরাই দ্বিতীয় রাকআতে পড়া– দুইভাবেই যাবে।

প্রশ্ন-৯৩: রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন পরপর তারাবীহ পড়েছেন, আমরা দৈনিক পড়ি কেন?

উত্তর: না, রাসূল ﷺ একদিন পরপর পড়েন নি। বরং উনি প্রতিদিন বারো মাস পড়েছেন। আমার খালি রমাযান মাসে কেন পড়ি– এই প্রশ্ন হতে পারে। উনি জামাআতে পড়েছেন তিনদিন। বিষয়টা ভালো করে বুঝতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিদিন পড়তেন, বারোমাস পড়তেন। রমাযানে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে জামাআতে পড়েছেন তিনদিন। জামাআতে নিয়মিত পড়েন নি, এই ভয়ে যে, আল্লাহ ফরয করে দেবেন।

প্রশ্ন-৯৪: তারাবীহ নামায কত রাকআত, আট না বিশ?

---

[৯] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-১৩০৭; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-২৬১১৪; মুসনাদ তায়ালিসি, হাদীস নং-১৬২২; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস নং-১১৩৭; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস নং-১১৫৮।

[১০] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-১১২২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৪৭৯; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-৬৩৩০।

উত্তর: তারাবীহ নামায কত রাকআত– এটা আমার ভালো জানা নেই। তবে তারাবীহ নামায কয় ঘণ্টা– এটা আমি ভালো জানি। দুই থেকে অন্তত ছয় ঘণ্টা– এটা হল তারাবীহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবিগণ তারাবীহর রাকআত নির্ধারণ করেন নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই রাকআত পড়েছেন, চার রাকআত পড়েছেন , আট রাকআত পড়েছেন, দশ রাকআত পড়েছেন, বারো রাকআত পড়েছেন। কাজেই এই ঝগড়া বাদ দিয়ে নামাযগুলো সুন্দর করেন।

প্রশ্ন-৯৫: কেউ কেউ বলেন, তারাবীহর নামায আট রাকআত, দশ রাকআত, বারো রাকআত পড়লে চলবে। এটা কি সঠিক?

উত্তর: তারাবীহর নামায না পড়লেও চলবে। ঠিক আছে তো? তারাবীহর নামায সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। চলাচলি বলতে কী বোঝাচ্ছেন? আমার ছাত্ররা বলে– স্যার, তারাবীহর নামায আট রাকআত পড়লে চলবে? আমি বলি, চলবে না কেন! পরীক্ষার খাতায় ষাট নম্বরের উত্তর দিলেই চলবে। কোনো ছাত্র কি তাই দেবে? পরীক্ষায় দুই নাম্বারের জন্য এত কষ্ট কর, আর আল্লাহর কাছে বিশ নাম্বারের জন্য মোটেও কষ্ট কর না। এটা তো ঈমানের লক্ষণ নয়। তারাবীহ ইমামের সাথে শেষ পর্যন্ত পড়লে আল্লাহ সারারাত তাহাজ্জুদ পড়ার সাওয়াব লিখে দেবেন।

প্রশ্ন-৯৬: এক ভাই বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো বিশ রাকআত তারাবীহ পড়েন নি, তাই সাহাবিরাও বিশ রাকআত পড়তে পারেন না। কারণ সাহাবিরা বেশি পড়লে রাসূলুল্লাহ ﷺ অবশ্যই নিষেধ করতেন। তার কথা কতটুকু সঠিক?

উত্তর: রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশ রাকআত তারাবীহ পড়েন নি– এটা মোটামুটি ঠিক কথা। রাসূলুল্লাহ ﷺ তারাবীহ মোটেই পড়েন নি– এটা হল ঠিক কথা। তারাবীহ বলতে আমরা যা বুঝি, অর্থাৎ ইশার পরের নামায, এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবনে মাত্র তিনদিন পড়েছেন। তো রাসূলুল্লাহ ﷺ যেহেতু তিনদিনের বেশি পড়েন নি, তাই আমরা তিনদিনের বেশি পড়তে পারব না! সাহাবিরাও নিশ্চয় তিনদিনের বেশি পড়েন নি! এগুলো ভুল কথা। রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের নামায বারো রাকআত পর্যন্ত পড়েছেন এটা কনফার্ম। তবে তিনি বারো মাস পড়তেন। আর তার এই বারো রাকআতে রাত কাভার হয়ে যেত। সাহাবিরা বিশ রাকআত পড়েছেন– এটা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।[১১] যদি কেউ আন্দাযে বলেন যে সাহাবিরা পড়েন নি, এটা মিথ্যা কথা।

---

[১১] মাকদিসি, আল আহাদীসুল মুখতারাহ, হাদীস নং-১১৬১; মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস নং-৭৭৩০; ফিরইয়াবি, কিতাবুস সিয়াম, হাদীস নং-১৭৬; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস নং-৪২৮৮

কেউ কেউ যুক্তি দেয়– নবীজি ﷺ পড়েন নি, তাহলে সাহাবিরা পড়লেন কী করে!

প্রশ্ন-৯৭: তারাবীহতে যদি কুরআন তিলাওয়াত স্পষ্ট শোনা না যায়, তাহলে তো কুরআন খতম হল না, এতে করণীয় কী?

উত্তর: তারাবীহর জামাআত শুরু হয়েছে ইসলামে কুরআন খতমের জন্য। এ জন্য সুন্দর তিলাওয়াত সবাই শুনতে পারে, এমন পরিবেশ দরকার।

প্রশ্ন-৯৮: সফরে গিয়ে তারাবীহর নামায কি ছেড়ে দিতে পারব?

উত্তর: সফরে গিয়েও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাজ্জুদ-কিয়ামুল লাইল করতেন। এ জন্য রমাযানে সুযোগ থাকলে জামাআতে পড়বেন। সম্ভব না হলে ঘরে পড়বেন।

প্রশ্ন-৯৯: 'সূরা-তারাবীহ' কি শেষের দশটি সূরা দিয়েই পড়তে হয়?

উত্তর: শেষের দশটি সূরা দিয়েই পড়তে হবে, এমন কোনো নিয়ম নেই। 'সূরা-তারাবীহ' মানে হল, আপনার যেখানে যেখানে কুরআন মুখস্ত আছে সেখান থেকে পড়বেন। যাদের বেশি মুখস্ত আছে তারা বেশি করে পড়বেন। সূরা রাহমান দিয়ে পড়বেন। ইয়াসিন-মুলক দিয়ে পড়বেন।

প্রশ্ন-১০০: মুসাফিরের জন্য বিশ রাকআত তারাবীহ জামাআতে পড়তে হবে কি না?

উত্তর: মুসাফিরের জন্য তারাবীহ পড়া সুন্নাত। জামাআতে তারাবীহ পড়া কারো জন্যই এককভাবে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ নয়। জামাআত কায়িম থাকা সত্ত্বেও আপনি একা যদি ঘরে তারাবীহ পড়েন, তাহলে আপনার কোনো গোনাহ হবে না।

প্রশ্ন-১০১: ফজরের ওয়াক্তে মসজিদে গিয়ে সুন্নাতের আগে দুই রাকআত তাহিইয়াতুল মসজিদ পড়া যাবে কি না?

উত্তর: আপনি ফজরের ওয়াক্তে মসজিদে গিয়ে যদি দুই রাকআত ফজরের সুন্নাত আদায় করেন, তাহলে ফজরের সুন্নাত এবং তাহিইয়াতুল মসজিদ দুটোই আদায় হয়ে যাবে। তাহিইয়াতুল মসজিদ মানে কী? মসজিদে ঢুকে বসার আগে যে নামায পড়বেন, এটাই তাহিইয়াতুল মসজিদ। কাজেই আপনি যদি বাড়ি থেকে সুন্নাত না পড়ে যান, মসজিদে বসার আগে দুই রাকআত ফজরের সুন্নাত পড়বেন, এটাতেই তাহিইয়াতুল মসজিদ আদায় হয়ে যাবে। আর যদি বাড়ি থেকে সুন্নাত পড়ে যান, আর জামাআত শুরু হয় নি, পাঁচ সাত মিনিট হাতে আছে, এ ক্ষেত্রে সাহাবিদের যুগ থেকেই মতভেদ আছে। কারণ এখানে একটা আদেশ আর একটা নিষেধ আছে। আদেশ হল মসজিদে ঢুকে নামায পড়া। আর নিষেধ হল ফজরের আযান হলে

ফজরের সুন্নাত ছাড়া আর কোনো সুন্নাত-নফল নামায পড়া যায় না।[১২] এখানে আদেশ এবং নিষেধ এক জায়গায় হওয়ার ফলে দুটোর সমন্বয়ে ফুকাহারা ইজতিহাদ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবন উমার ﵄, আয়িশা ﵂ তাহিইয়াতুল মসজিদ পড়তেন। আর উমার ﵁ পড়তেন না। যে কেউ যে কোনো মত নিতে পারেন। আমাদের সমাজে, হানাফি মাযহাবে উমার ﵁-র মতটাকে নেয়া হয়েছে– এই মাকরুহ সময়ে তাহিইয়াতুল মসজিদ পড়বে না। অন্য সময়ে পড়তে হবে।

প্রশ্ন-১০২: বারোটা বাজার কত সময় পরে দুখুলুল মসজিদ পড়া যাবে?

উত্তর: এর সাথে বারোটা-একটার সম্পর্ক নেই। আপনারা ক্যালেন্ডারে, মোবাইলে বা যে কোনোভাবে জানবেন, যুহরের ওয়াক্ত কখন হয়। এটা কখনো বারোটার ১০/১৫ মিনিট আগেই হয়ে যায়। কখনো বারোটার ১০/১৫ মিনিট পরে হয়। কাজেই আপনি যদি মসজিদে ঢোকেন এমন সময়, যখন নামায পড়া নিষেধ নেই, অর্থাৎ ওয়াক্ত হয়ে গেছে, তখন দুখুলুল মসজিদ পড়বেন। পড়া উচিত।

প্রশ্ন-১০৩: ইশরাক, চাশত, সালাতুদ দুহা নামাযের গুরুত্ব কী?

উত্তর: **রাহে বেলায়াত** পড়েন।

প্রশ্ন-১০৪: বিতর নামায আদায়ের সহীহ্ পদ্ধতি জানাবেন।

উত্তর: এটা আমার **রাহে বেলায়াতে** বিস্তারিত লিখেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতর নামাযে অনেক অবকাশ দিয়েছেন। তবে আমরা বাংলাদেশে সাধারণভাবে যে বিতর পড়ি, দুই রাকআত পড়ে তাশাহহুদের পর তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়াই– এটা অবৈধ, নাজায়িয, অথবা সুন্নাতের খেলাফ– এটা বলা ঠিক না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন রাকআত বিতর পড়েছেন। সাহাবিরা পড়েছেন। এবং তিন রাকআতের বিতরে দ্বিতীয় রাকআতে সালাম ফেরান নি, এরকমও সহীহ হাদীসে এসেছে। মাগরিবের মতো তিন রাকআত পড়েছেন সাহাবি-তাবিয়িরা, এটা সহীহ হাদীসে এসেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে হাদীসে বলেছেন, মাগরিবের মতো তিন রাকআত বিতর পোড়ো না, পাঁচ বা সাত রাকাত পড়ো, এখানে রাকআতের ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, পদ্ধতির ব্যাপারে না। অর্থাৎ তিন রাকআতের আগে দুই রাকআত দুই রাকআত চার রাকআত কিয়ামুল লাইল পড়া উচিত। একেবারে ন্যাংটো বিতর না পড়া উচিত। তবে অন্যান্য হাদীসে, দুই রাকআত বিতর পড়ে সালাম ফিরিয়ে আবার

---

[১২] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-৪৪৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৭১৪, ৭২৩; সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-৪১৯; সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-১২৭৮।

নতুন নিয়্যাত করে এক রাকআত বিতর পড়া– এটাও সহীহ।

প্রশ্ন-১০৫: বিতর নামাযের সুন্নাত পদ্ধতি কী? দুআ কুনুত পড়া কি বাধ্যতামূলক?

উত্তর: বিতর নামাযের সুন্নাত পদ্ধতি বিস্তারিত পাবেন আমার **রাহে বেলায়াত** বইতে। বিশেষ করে সর্বশেষ এডিশনে। যদি পড়ে নিতে পারেন, ইনশাআল্লাহ লাভ হবে। বিতর নামাযের অনেক রকম পদ্ধতি আছে। আমাদের দেশে যেভাবে পড়া হয়, এটাও সুন্নাতসম্মত। আর দুআ কুনুত পড়া বাধ্যতামূলক– এই প্রশ্ন কেন আসে! এই নামাযের মধ্যে সবচে' আনন্দের জিনিস হল দুআ কুনুত। এটা তো আমার জন্য সুযোগ। আমি তো দুআ কুনুত নিজের আবেগে পড়ব। বেশি বেশি পড়ব।

প্রশ্ন-১০৬: বিতরের নামায এক বা দুই রাকআত না পেলে কীভাবে আদায় করতে হবে?

উত্তর: অন্যান্য নামায যেভাবে মাসবুক হিসেবে আদায় করেন, ঐভাবে করবেন।

প্রশ্ন-১০৭: 'সালাতুত তাসবীহ (নামায) বলে কুরআন হাদীসে কোনো কথা নেই'– কথাটা কতটুকু সঠিক?

উত্তর: 'সালাতুত তাসবীহ' বলে কুরআনে কিছু নেই। এ ব্যাপারে অনেকগুলো হাদীস আছে, তার ভেতর একটা হাদীস মোটামুটি সহীহ। বাকিগুলো সব জাল, বানোয়াট, যয়ীফ। একটা হাদীস আছে, যার সনদ গ্রহণযোগ্য। কাজেই কেউ যদি সালাতুত তাসবীহ পড়ে, এটা বিদআত হবে না। নাজায়িয হবে না। তবে সালাতুত তাসবীহর যে ভাষা, যে পদ্ধতি, এটা হাদীসের কোনো আমলের সাথে মেলে না। তাই অনেকে এটাকে মুনকার বলেছেন।

প্রশ্ন-১০৮: ফরয ও সুন্নাত নামাযের মধ্যে পার্থিব কোনো প্রার্থনা করা যাবে কি না?

উত্তর: দুআটাই তো নামায। সেটা ফরয হোক বা নফল। দুআ বিভিন্ন জায়গায় করা যায়। বিশেষ করে দুই জায়গায়– সিজদা এবং সালামের আগে। যখন আমরা দুআ মাসুরা পড়ি। এই দুই সময় আপনি দুআ করবেন। দুনিয়ার কথা তো আল্লাহই বলেছেন:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا...

আগে দুনিয়া তারপর আখিরাত।[১৩] দুনিয়াও তো আল্লাহর কাছে চাইতে হবে।

---

[১৩] সূরা: [২] বাকারা, আয়াত: ২০১।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের জুতার ফিতে ছিড়ে গেলেও আল্লাহর কাছে চাইবে।[১৪] কাজেই আল্লাহর কাছে সব চাইবেন। তবে চাওয়ার ভাষাটা হবে আল্লাহর কাছে চাওয়ার মতো। মানুষের সাথে গল্প করার ভাষা না। আল্লাহ আমার রিযিক বাড়িয়ে দাও। আল্লাহ আমার বরকত দাও। আল্লাহ আমার পরিবারে শান্তি দাও। সব চাওয়া যাবে।

প্রশ্ন-১০৯: নামাযি ব্যক্তির কতটুকু সামনে দিয়ে যাওয়া যাবে?

উত্তর: অন্তত দুই কাতার সামনে দিয়ে। তিনি সিজদার জায়গায় তাকালে যতদূর নযর যায়, এর বাইরে দিয়ে যাওয়া যাবে, আশা করা যায়।

প্রশ্ন-১১০: নামাযি ব্যক্তির সামনে দিয়ে চলাফেরা করা যায় কি না?

উত্তর: এটা জরুরি প্রশ্ন। নামাযের সামনে দিয়ে চলা হারাম। তবে যদি সুতরা না থাকে, নামাযের সামনে আরো এক কাতার বাদ দিয়ে প্রয়োজনে যেতে পারেন।

প্রশ্ন-১১১: নফল নামাযে ভুল হলে কি সাজদায়ে সাহু করতে হবে?

উত্তর: নফল রোযার রেখে কি দিনের বেলা খাওয়া যায়? নফল রোযায়ও না খেয়ে থাকা ফরয। ঠিক তেমনি নফল নামাযে সিজদা করা, রুকু করা ফরয। কাজেই নফল নামাযে কোনো ওয়াজিব নষ্ট হলে সিজদা করতে হবে। তবে ওয়াসওয়াসার পেছনে দৌড়াবেন না।

প্রশ্ন-১১২: চার রাকআত ফরয নামাযে ইমাম সাহেব দ্বিতীয় রাকআতে বসলেন, তৃতীয়তে বসলেন, চতুর্থ রাকআতে বসলেন না। পঞ্চম রাকআত শেষ করে সাহু সিজদা দিয়ে সালাম ফেরালেন। প্রশ্নের জবাবে বললেন, বুখারি শরীফে আছে চার রাকআত ফরয হবে, এক রাকআত নফল হবে। এর ফয়সালা কী? উনি অবশ্য আহলে হাদীসের অনুসারী।

উত্তর: এমন কোনো ক্লিয়ার হাদীস বুখারি শরীফে আছে আমার জানা নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কারো কম-বেশি নিয়ে সন্দেহ হয়, অর্থাৎ তিন রাকআত পড়েছি না চার রাকআত– এক্ষেত্রে কমটা ধরতে হবে। যেমন তিন না চারের সন্দেহ হলে তিন ধরতে হবে। চার না পাঁচ রাকআতের সন্দেহ হলে আরেক

[১৪] সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৬০৪; মুসনাদ বাযযার, হাদীস-৬৮৭৬; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-৮৯৫।

রাকআত পড়ে সাহু সিজদা দিতে হবে।[১৫] তবে এক্ষেত্রে মুকতাদিরা ঘুমাচ্ছিল নিশ্চয়। মুকতাদিরা যদি লুকমা না দেয়, 'সুবহানাল্লাহ না' বলে, এটা মুকতাদিদের দোষ। আর শেষ বৈঠকে যদি মোটেও না বসে তাহলে অনেক ফকীহ বলেছেন পুরো নামায নফল হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন ফকীহের বিভিন্ন ইজতিহাদ আছে। উনি কোন মাযহাব মানছেন আমি তো জানি না। উনি যদি আহলে হাদীসের মানুষ হন তাহলে একটা হাদীসের উপর আমল করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

প্রশ্ন-১১৩: আমাদের ঈদগাহ নেই। মসজিদের সামনে ফাঁকা জায়গা আছে। ওখানে আমরা ঈদের নামায পড়ি। এই জায়গাটা ঈদগাহ বানানো যাবে কি না?

উত্তর: হ্যাঁ। ঈদগাহ বানানো যাবে। সেক্ষেত্রে মসজিদটা ঈদগাহের এক প্রান্তে পড়ে গেল। তবে জায়গাটা কার, মালিক রাজি আছে কি না খোঁজ নিতে হবে। বা মসজিদের জায়গা যদি হয়, তাহলে আপাতত ঈদগাহ বানাতে পারেন। কিন্তু পরবর্তীতে মসজিদ যদি বড় করতে হয়, সেক্ষেত্রে জায়গাটা মসজিদে ঢুকে যাবে।

প্রশ্ন-১১৪: সহীহ মুসলিমে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন মাইল, আঠারো মাইল দূরত্বে কসর আদায় করেছেন। তাহলে আমরা আটচল্লিশ মাইলের কথা বলি কেন?

উত্তর: তিন মাইল দূরত্বে কসর করেছেন এমনটা নেই। বিষয়টা হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় যাওয়ার জন্য মদীনা থেকে বেরিয়ে প্রায় দশ কিলোমিটার গিয়ে, অর্থাৎ যুলহুলাইফায় গিয়ে কসর করেছেন। যেটা বুখারি, মুসলিমে আছে।[১৬] কিন্তু তাঁর সফরটা ছিল অনেক দূরের।

প্রশ্ন-১১৫: আমি ঝিনাইদহ থেকে ঢাকায় পরীক্ষা দিতে যাব। পরীক্ষা দিয়ে ঝিনাইদহ চলে আসব। আমি কি মুসাফির হব?

উত্তর: জি, আপনি মুসাফির। তবে যদি ঢাকায় পনেরোদিন বা তার বেশি অবস্থানের নিয়্যাত করেন, তাহলে মুকীম হবেন।

প্রশ্ন-১১৬: নিয়্যাত ছাড়া ভ্রমণ করলে সে কসর আদায় করবে কি না?

উত্তর: নিয়্যাত ছাড়া কেউ ভ্রমণ করে বলে আমার জানা নেই। তবে হতে পারে এক মাধ্যমে, সে ঘুমিয়ে ছিল, কেউ হাত-পা বেঁধে তাকে গাড়িতে তুলে দিয়েছে, সে

---

[১৫] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-১২২৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৫৭১; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং-১২০৯।

[১৬] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-১৫৫১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৬৯০; সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-১৭৭৩; সুনান নাসায়ি, হাদীস নং-৪৭৭।

নিয়্যাত ছাড়া ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভ্রমণ করছে। কোনো জ্ঞানী মানুষ উদভ্রান্তের মতো নিয়্যাত ছাড়া বাসে উঠে ঢাকায় চলে গেছে বলে আমার জানা নেই। নিয়্যাতের মানেটাই আমরা বুঝি না। নিয়্যাত মানে হল মনের ইচ্ছা। আমি বাড়ি থেকে লাগেজ নিয়ে বের হলাম– নিশ্চয় আমার মনে একটা নিয়্যাত আছে।

প্রশ্ন-১১৭: আমি সফরে আছি। যশোর থেকে ঝিনাইদহ যাচ্ছি। কসর নামাযের জন্য যে দূরত্ব তা ঝিনাইদহ পর্যন্ত হয় না। আমি কি কসর করব? নাকি পুরো পড়ব?

উত্তর: না। আপনি পুরা নামায পড়বেন। আমাদের জীবন পুরাটাই তো সফর। নবীজি ﷺ বলেছেন

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ

দুনিয়াতে মুসাফির থাকবে।[১৭] তাই বলে আজীবন কসর করব নাকি! সব সফরে কসর হয় না। সফরের দূরত্বটা যখন একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে যাবে তখন কসর হবে। এ ব্যাপারে ফুকাহাদের মতভেদ আছে। তবে প্রায় ফকীহ্ বলছেন আটচল্লিশ মাইল বা আশি কিলোমিটার পরিমাণ দূরত্বে যাওয়ার নিয়্যাত করে বের হলে কসর করতে হবে।

প্রশ্ন-১১৮: মসজিদে প্রবেশে পর যদি তাহিইয়াতুল মসজিদের নামাযের সময় না থাকে, তাহলে কী করব? শুনেছি নামায না পড়ে সরাসরি বসে পড়া মাকরুহ। আবার ইমামের আগে জামাআতের জন্য দাঁড়িয়ে থাকা আদবের খেলাফ। এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী?

উত্তর: আমি দাঁড়িয়ে থাকি। অর্থাৎ যদি দেখি জামাআতের এক মিনিট দেরি আছে, দাঁড়িয়ে থাকি। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মসজিদে নামায না পড়ে বসবে না। আবার আলিমরা, ফকীহরা বলেন, দাঁড়িয়ে থাকা বেয়াদবি। তো আমি ফকীহদের কথা ব্যাখ্যা করি– প্রয়োজন ছাড়া দাঁড়িয়ে থাকা বেয়াদবি। অর্থাৎ নামায পড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুকি মারা বেয়াদবি। আমার নবী ﷺ এর হুকুম বেয়াদবি হয় না। কোনো ফকীহ্ যদি মনে করেন দাঁড়িয়ে থাকা বেয়াদবি এটা তার ব্যাপার। আমি ব্যক্তিগতভাবে দাঁড়িয়ে থাকি।

প্রশ্ন-১১৯: কেউ কেউ বলেন, ইশার নামাযের পর 'কুদ্দুসুন নফল' পড়তে হয়। এটা

---

[১৭] সহীহ্ বুখারি, হাদীস নং-৬৪১৬; সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-২৩৩৩; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং-৪১১৪।

না পড়লে নাকি ইশার নামায হয় না। এটা কতটুকু সঠিক?

উত্তর: কুদ্দুসুন নফল আবার কী? মানুষকে পিটানোর দরকার। একটা না পড়লে সেটার অন্যায় হবে। তার জন্য আরেকটা কেন বাতিল হবে! 'কুদ্দুসুন নফল' মানে বোধহয় বসে নামায পড়ার কথা বলতে চাচ্ছেন। প্রথম কথা হল, এটা ভুয়া নাম। 'কুদ্দুসুন নফল' বলে কোনো জিনিস নেই। একটা ফালতু নাম। দুই নাম্বার কথা হল, ইশার ফরয পড়লেই আপনার নামায হয়ে যাবে। সুন্নাত না পড়লে অন্যায় হবে, এর জন্য আপনার ফরয বাতিল হবে না। আমাদের শুধু না হওয়ানোর চেষ্টা। এটা করলে নামায হবে না। ওটা করলে নামায হবে না। নামায তো আল্লাহ হওয়ানোর জন্য দিয়েছেন। আর ইশার ওয়াক্তে আপনি ইশার ফরয পড়েছেন, সুন্নাত পড়েছেন, বিতর পড়েছেন, এর বাইরে অন্য কোনো নামায পড়া আপনার জন্য জরুরি নয়। নফল আপনি যত পারেন পড়বেন।

প্রশ্ন-১২০: নফল নামায কোন সূরা দিয়ে পড়তে হয়?

উত্তর: যে কোনো সূরা দিয়ে পড়া যায়।

প্রশ্ন-১২১: মাগরিবের পরে ছয় রাকআত নামায আছে। সেটা কোন নিয়মে পড়তে হবে?

উত্তর: মাগরিবের পরে দুই রাকআত সুন্নাত নামায রাসূলুল্লাহ ﷺ নিয়মিত পড়তেন। এছাড়া মাগরিব থেকে ইশা পর্যন্ত অনেক নামায তিনি অনিয়মিত পড়তেন। কিন্তু রাকআতের ব্যাপারে কোনো সহীহ হাদীস নেই। ছয় রাকআতের হাদীস, বিশ রাকআতের হাদীস-- এগুলোর সনদ খুবই দুর্বল। কাজেই মাগরিব থেকে ইশা পর্যন্ত যে কোনো রাকআত আপনি পড়তে পারেন। ছয় রাকআতও পড়তে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু ছয়ই পড়বেন, আট পড়বেন না বা চার পড়বেন না– এটা ঠিক নয়। হাদীসে এসেছে, সাহাবির নাম আমার মনে পড়ছে না, সম্ভবত হুযাইফা ؓ নবীজি ﷺ এর সাথে কথা বলার জন্য আসলেন। মাগরিবের আগে বলতে পারলেন না, মাগরিবের পরে বলবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মাগরিব পড়ে নফল নামায পড়তে লাগলেন। ওইভাবেই ইশার ওয়াক্ত হয়ে গেল। কাজেই মাগরিব থেকে ইশা পর্যন্ত সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ের নফল নামাযকে সালফে সালিহীনরা তাহাজ্জুদের নামাযের সমতুল্য বলেছেন। তবে এর জন্য কোনো সূরা নির্ধারিত নেই। কোনো রাকআত নির্ধারিত নেই।

প্রশ্ন-১২২: সাহু সিজদা দেয়ার সঠিক পদ্ধতি কী?

উত্তর: সাহু সিজদা দিলেই হবে। সালামের আগে বা সালামের পরে। ঝগড়া করবেন না দয়া করে।

প্রশ্ন-১২৩: সাহু সিজদা দেয়ার সঠিক পদ্ধতি কী?

উত্তর: সাহু সিজদা বিভিন্নভাবে দেয়া যায়। আমার যেভাবে দিই, এটা চলে। আরেকটা আরো সহজ পদ্ধতি হল, আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ শরীফ পড়ে, দুআ মাসুরা পড়ে দুটো সিজদা দিয়ে এরপর দুটো সালাম দেয়া। এটাও হাদীস সম্মত। হানাফি মাযহাবেও এটা নিষিদ্ধ নয়।

প্রশ্ন-১২৪: ছেলেদের নামায এবং মেয়েদের নামায একই রকম কি না?

উত্তর: সামান্য কিছু পার্থক্য আছে। এগুলো জটিল পর্যায়ের কিছু নয়। এগুলো নিয়ে ঝগড়া করবেন না। আরেকদিন বিস্তারিত বলব।

প্রশ্ন-১২৫: নাবালিগ হাফিযের পেছনে নামায পড়া যাবে কি না?

উত্তর: তারাবীহর নামায যদি হয়, তারাবীহর ব্যাপারে অনেকে জায়িয বলেছেন। অন্য নামায নয়। আপনি এত ছোট বাচ্চার পেছনে তারাবীহর নামাযই কেন পড়বেন! আপনি ভালো অভিজ্ঞ হাফিযের পেছনে তারাবীহ পড়বেন।

প্রশ্ন-১২৬: ঝিনাইদহ মারকায মসজিদে মাইকে আযান না দিয়ে মুখে আযান দেয় কেন?

উত্তর: সেটা আপনি মারকায মসজিদে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন, আমার কাছে কেন! তবে আমি এইটুকু বলতে পারি, মুখে আযান দিলেও আযান হয়ে যায়। তারা এমন কিছু গোনাহের কাজ করছেন না। আবার মাইকে আযান দিলেও আযান হয়ে যায়। যারা মাইকে আযান দেয়, গোনাহের কিছু করে না। তবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল, আযান দাওয়াত। এটা যত বেশি দূরে যাবে, তত মানুষ জানতে পারবে। আগের যামানায় মাইক ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে মসজিদের পাশে দাঁড়িয়ে আযান হত। যখন মানুষ বেড়ে গেল, বাজারের ভেতর দোতলা বিল্ডিংয়ের উপর থেকে আযান দেয়া হত। মানুষ আরো বেড়ে গেলে মসজিদে মিনারা বানানো হল। চুঙা দিয়ে আযান দেয়া হত, যেন আওয়ায দূরে যায়। কাজেই বর্তমানে আমরা ঘরবাড়ি যা পাকা বানিয়েছি, আগে দূরের আযান শোনা যেত, এখন জানালা-দরজা বন্ধ রাখলে দূরের আযান শোনা যায় না। কাজেই, মাইকে আযান দেয়া এটা শরীআহসম্মত। বৈধ। তাবলীগওয়ালারা দেন না, এই না দেয়ার কারণে নাজায়িয কিছু হচ্ছে না। তবে না-দেয়াটাকে জরুরি মনে করলে, মাইকে আযান দেয়াকে

খারাপ মনে করলে এটা অন্যায় হবে। তবে তাবলীগওয়ালারা কখনো এই মাসআলা দেয় না যে, মাইকে আযান দেয়া খারাপ।

প্রশ্ন-১২৭: পিতামাতা সালাত আদায় না করলে সন্তানের করণীয় কী?

উত্তর: তাদেরকে সালাতের কথা বলতে হবে, অনুরোধ করতে হবে। কিন্তু বেয়াদবি কোনো অবস্থাতেই করা যাবে না। তাদের কথার অবাধ্য হওয়া যাবে না।

প্রশ্ন-১২৮: নিজ এলাকার ঈদগাহে নামায না পড়ে স্বপরিবারে কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ায় গিয়ে নামায পড়লে কি বেশি সাওয়াব হবে? ওখানকার আখেরি মুনাজাতে কি বেশি সাওয়াব?

উত্তর: মসজিদে যাওয়া ভালো কাজ। কিন্তু মসজিদে যদি জুতা চুরির নিয়্যাতে যান? এটা খারাপ কাজ। মসজিদে ঘুমানোর নিয়্যাতে যাওয়া– কোনো সাওয়াবের কাজ না। ঈদের নামায পড়ার জন্য শোলাকিয়ায় যাওয়া শতভাগ ফালতু কাজ। তবে যদি এমন হয়, ইমাম সাহেব খুব ভালো খুতবা দেন, ইলম শিখতে যান, তাহলে ভালো কাজ। অর্থাৎ কোনো না কোনো দীনি ইবাদতের জন্য আপনাকে যেতে হবে। ইলম শেখা, নেককার মানুষদের সাথে সাক্ষাৎ– এমন কিছু নেক আমলের জন্য যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু গ্রামের ঈদগাহে কম সাওয়াব, শোলাকিয়ায় বেশি সাওয়াব– এই ধরনের চিন্তা করাটা বিদআত। বিশ্ব ইজতিমারও একই কথা। ওয়ায শোনার জন্য, দাওয়াতের কাজে নাম লেখানোর জন্য অথবা কোনো বড় আলিম এসেছেন, তার সঙ্গে দেখা করতে ইজতিমায় যাওয়া– এটা সাওয়াবের কাজ। ভালো কাজ। কিন্তু দুআর নিয়্যাতে যাওয়া, এত মানুষ দুআ করছে, ওখানে নিশ্চয় কিছু হবে– এটা খারাপ। আসলে আমরা টার্গেট হারিয়ে ফেলেছি। শিখতে মানুষ লাগে। কিন্তু দুআর জন্য মানুষ লাগে না। আমরা দুআর জন্য শোলাকিয়ায় যাই, ইজতিমায় যাই– আল্লাহ কি ওখানে বসে থাকেন? আল্লাহ বলেছেন:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ

[আর যখন আমার বান্দারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে আমার ব্যাপারে; বস্তুত আমি রয়েছি সন্নিকটে।][১৮]

আল্লাহ আমার কাছেই আছেন। চাওয়ার জন্য আমি এবং আল্লাহ। আর কারো লাগবে না। বড় কোনো মাহফিলে, ইজতিমায় আপনি যেতে পারেন ভালো কাজ করার জন্য। যখন দুআ হবে আপনি দুআয় শরীক হবেন। আমরা ওয়াযের সময় ঘুমাই। এরপর যখন দুআ হয়, আমরা জেগে উঠি। কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য হবে

[১৮] সূরা: [২] বাকারা, আয়াত: ১৮৬।

ওয়ায শোনা। এরপর যদি দুআ হয়, শরীক হবেন। দুআর জন্য আপনার সারাদিন পড়ে আছে। আপনি যখনই দুআ করবেন, আল্লাহ শুনবেন। তাবলিগের লোকেরা জানেন, এইসব দুআ কোনো দরকারি কাজ না। আমরা পীর সাহেব মানুষরা আপনাদের আখেরি দুআ দিয়ে আজীবন ভুগিয়েছি। ফুরফুরাতে যেসব ওয়াজ নসীহত হয়, মানুষ ঘুমায়। কিন্তু দুআর সময় সবাই হাযির। কিন্তু মানুষ যাবে হল শুনতে-শিখতে। আর দুআ হলে সেখানে শরীক হবেন।

প্রশ্ন-১২৯: ঘরে প্রাণির ছবি থাকলে সেই ঘরে নামায পড়া যাবে কি না?

উত্তর: নামায মাকরুহ হবে। সরিয়ে রাখবেন।

প্রশ্ন-১৩০: আপনার লেখা বা অন্যের লেখা নামাযের নিয়মের উপর কোনো বই আছে কি না?

উত্তর: আমার লেখা পূর্ণাঙ্গ বই নেই। তবে **রাহে বেলায়াতের** সালাত ও বেলায়াত অধ্যায়ে সালাতের মোটামুটি পুরো নিয়ম এসে গেছে।

প্রশ্ন-১৩১: যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে না তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা কতটুকু জায়িয?

উত্তর: যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে না তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা ঠিক নয়। সম্পর্ক রাখা চলবে। সমাজের সাথে সম্পর্ক রাখতে আমরা বাধ্য। কিন্তু আন্তরিক বন্ধুত্ব হবে:

لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ

এমন মানুষের সাথে, কিয়ামতে যার দ্বারা উপকৃত হতে পারব।[১৯]

প্রশ্ন-১৩২: কিছুদিন আগে আমার স্ত্রী জানতে পেরেছে, ছেলেদের এবং মেয়েদের নামাযের কোনো পার্থক্য নেই। অর্থাৎ হাত বাঁধা থেকে শুরু করে সালাম পর্যন্ত ছেলেমেয়ে একই রকম নামায পড়বে।

উত্তর: এটার খুব সহজ সমাধান আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছেলে আমার কাছে এসে বলছে, স্যার আমার মা একটা প্রশ্ন জানতে চেয়েছে। ছেলেদের এবং মেয়েদের নামাযের পার্থক্য আছে কি না? আমি বললাম, কেন? বলে যে, আমাদের একটু সমস্যা হচ্ছে। আমি বললাম এর সমাধান সহজ। তোমার আম্মাকে বলো নামায বাদ দিয়ে দিতে। বড়ই কষ্ট লাগে, শুধু মানুষদের জন্য না, আলিমদের জন্য,

---

[১৯] সুনান দারিমি, হাদীস নং-২১০১১

আমরা কি ঝগড়া নিয়েই থাকব! আমাকে একজন বলেছে, স্যার, ইন্টারনেটে যত অডিও-ভিডিড ক্লিপ আছে, যেগুলো দীনদার মুসলিমরা নাড়াচাড়া করে, এগুলোর ৮০% হল, এইসব ছোটছোট বিতর্ক। এগুলো করলে স্যার ভিডিও ভালো চলবে। আর আপনি হালাল-হারাম নিয়ে যেসব বলেন এগুলো চলবে না স্যার। সালাত আল্লাহর ফরয ইবাদত। নারী-পুরুষের নামাযে একান্ত ছোটখাটো কয়েকটা পার্থক্য আছে। এটা করলেও কারো নামায নষ্ট হবে না। না করলেও কারো কিছু হবে না। সাহাবিদের যুগে, তাবিয়িদের যুগে নারী-পুরুষের নামাযের কিছুকিছু পার্থক্য অনেকেই করেছে। আবার সহীহ হাদীসও পাওয়া যায় না। হাত রাখা তো এটা আমাদের বানানো। হাত বুকে, নাভিতে সবখানে রাখা যায়। মেয়েরা উপরে রাখবে, ছেলেরা নিচে রাখবে– এটা কোনো হাদীসে নেই। মেয়েরা নিচে রাখলেও চলবে, ছেলেরা উপরে রাখলেও চলবে। একটা জিনিস প্াওয়া যায়, যেটা কিছুটা সহীহ, অর্থাৎ মুরসাল সহীহ, সেটা হলো সিজদাটা আটোসাটো হয়ে দেবে। আর রুকুটা সোজা হবে নাকি হালকা বাঁকা হবে– এই হাদীসটা খুবই দুর্বল। বসার সময় মেয়েরা সুবিধা মতো বসবে। এমনকি আসন গেড়েও বসতে পারে। দৈহিকভাবে পুরুষদের মতো বসতে তাদের কষ্ট হতে পারে। সিজদা যদি মেয়েরা আটোসাটো হয়ে দেন, এটা যেহেতু হাদীসে আছে, এতে কোনো সমস্যা নেই। আবার বর্তমান প্রজন্ম পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। বর্তমান মহিলারা যদি আটোসাটো হয়ে সিজদা দিতে কষ্ট হয়, পুরুষের মতো ফাঁকা হয়ে দেবেন, কোনো সমস্যা নেই, যেহেতু এই ব্যাপারে হাদীসে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয় নি। তবে নামায যারা পড়ে না, তারা এইসব ব্যাপারে নিরাপদে আছে। নামায যারা পড়ছে তাদের নিয়ে যত কষ্ট।

মৃত্যু/জানাযা/যিয়ারত

প্রশ্ন-১৩৩: সকল নফসের মৃত্যু হবে। এখানে 'নফস' দ্বারা কী বোঝানো হয়?

উত্তর: প্রাণ বোঝানো হয়।

প্রশ্ন-১৩৪: মৃত ব্যক্তি গোসলের সময় ব্যথা পায় কি না?

উত্তর: মৃত ব্যক্তি গোসলের সময় যে ব্যথা পায়, এটা জাগতিক ব্যাথা নয়। এটা রুহানি হালত।

প্রশ্ন-১৩৫: স্ত্রী মারা যাবার পরে স্বামী তাকে গোসল দিতে পারবে কি না?

উত্তর: এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানীফা রাহ.র মতে পারবে না। অন্যদের মতে পারবে। ইজতিহাদি ইখতিলাফ আছে।

প্রশ্ন-১৩৬: জানাযার নামায স্যান্ডেল পায়ে না খালি পায়ে পড়তে হবে? হাদীসে কোনটা আছে?

উত্তর: দুটোই আছে। স্যান্ডেল পায়ে এবং খালি পায়ে দুটোই আছে। দুটোর একটা থাকতে হবে এটা বাধ্যতামূলক কেন! অর্থাৎ আপনি জুতো পায়ে দিয়ে নামায পড়লেও হবে, জুতো খুলে নামায পড়লেও হবে।

প্রশ্ন-১৩৭: জানাযার নামাযে মুকতাদিদের সূরা ফাতিহা পড়া লাগবে কি না?

উত্তর: সূরা ফাতিহা পড়া ভালো। সহীহ হাদীসে এসেছে, কোনো কোনো সাহাবি সূরা ফাতিহা পড়তেন না। যেমন আব্দুল্লাহ ইবন উমার ﵁ আবু হুরাইরা ﵁। আবার কোনো কোনো সাহাবি পড়তেন। যেমন আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস ﵁ সহ কিছু সাহাবি। তবে যারা পড়তেন, তারা এটাকে সুন্নাত বলেছেন।[১] কাজেই বোঝা যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা পড়তেন। অবশ্য রাসূল ﷺ পড়তেন কি না হাদীসে ক্লিয়ার নেই। এ জন্য ইমাম-মুকতাদি সবার জন্য পড়া উচিত, উত্তম। না পড়লেও ইনশাআল্লাহ নামায হবে। যেহেতু কোনো কোনো সাহাবির না পড়ার আমল আছে। আমি নিজে সূরা ফাতিহা পড়ি।

প্রশ্ন-১৩৮: ঢাকায় একবার জানাযা পড়ে দ্বিতীয়বার ঝিনাইদহে জানাযা পড়া যাবে কি না?

---

[১] সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-১০২৭; মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস নং-৬৪৩৭; মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস নং-১১৪০৪।

উত্তর: জানাযা একবারই পড়া সুন্নাত।

প্রশ্ন-১৩৯: মহিলারা কি কবরের কাছে গিয়ে কবর যিয়ারত করতে পারে? সাহাবাদের দলীল সহকারে বলবেন।

উত্তর: রাসূল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَفِي رِوَايَةٍ: لَعَنَ اللَّهُ) زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ

যে সমস্ত মহিলারা বেশি বেশি কবর যিয়ারত করে এবং যে সমস্ত মানুষ, নারী বা পুরুষ, কবরের পাশে মসজিদ বানায় অথবা কবরে বাতি দেয়, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে লানত করেছেন। অভিশাপ দিয়েছেন।[২] এই হাদীসের আলোকে মেয়েদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছেন অনেক ফকীহ। তবে সহীহ মুসলিমের হাদীস, আয়িশা ﷺ রাতে ঘরে শুয়ে আছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে বেরিয়ে গেলেন। তিনিও পিছে পিছে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ 'বাকি' গোরস্থানে গিয়ে মাইয়্যেতদের জন্য দুআ করলেন। আবার ফিরে আসলেন। আয়িশা ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি যদি কবর যিয়ারত করি, কী বলব? কী বলে যিয়ারত করব? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:

قُولِي: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ

যখন তুমি কবর যিয়ারত করবে, এই কথা বলবে।[৩] এতে বোঝা গেল, মেয়েদের জন্য কবর যিয়ারত নাজায়িয নয়। জরুরতে একবার দুইবার কেউ যদি যিয়ারত করে সুন্নাত পদ্ধতিতে, তবে জায়িয।

তবে ভাইয়েরা, খুব সাবধান, কবর যিয়ারত মানে কী? নারী হোন বা পুরুষ হোন, আমরা দেখছি, কবরের শিরকগুলো সবচে' বেশি করে মেয়েরা। আমরা বিভিন্ন শিরকের অখড়ায় দেখেছি, মাযারে, দরগায়, কবরে সিজদা দিচ্ছে প্রথমে হল সিঁদুর মাখা মেয়েরা। তার মানে হিন্দু মেয়েরা। এটা অদ্ভুত ব্যাপার। সব জায়গায় একই অবস্থা। কারণ উনাদের ধর্মে তো যে কোনো দেবতাকে সিজদা করা যায়। ব্যাপার না। মানুষকেও সিজদা করা যায়। এর পেছনে আছে সিঁদুর ছাড়া বেটিরা। তার

---

[২] মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-২০৩০; সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-৩২৩৬; সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-৩২০; সুনান নাসায়ি, হাদীস নং-২০৪৬; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস নং-৩১৮০; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস নং-১৩৮৪।

[৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৯৭৪; সুনান নাসায়ি, হাদীস নং-২০৩৭।

মানে মুসলিম। বেটারা বরং একটু কম।

যিয়ারত মানে হল কবরের পাশে গিয়ে মাইয়্যেতকে সালাম দেয়া। মুখতাসার (সংক্ষিপ্ত) দুআ করা যায়– 'আল্লাহ আপনার ভালো করুন'। আমার **রাহে বেলায়াতে** যিয়ারতের মাসনুন বাক্যগুলো দেখবেন। এই হল যিয়ারত। যিয়ারত মানে আর কিছু নয়। যিয়ারত মানে মাইয়্যেতের কাছে চাওয়া নয়। মাইয়্যেতের কাছে দুআ নয়। এগুলো সব শিরক। কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ করা, মাইয়্যেতের জন্য দুআ করা। এর বাইরে যদি কেউ কিছু করে, কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া– এটা শিরক। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে ওসিয়ত করলেন, শেষ ওসিয়ত– 'কবরকে ইবাদতের জায়গা বানাবে না'। ইয়াহুদি-নাসারারা বানিয়েছে। বানিয়ে ধ্বংস হয়েছে। ইয়াহুদিরা কবর পূজা করে না। কবরের সিজদা করে না। তাদের কাছে কিছু চায় না। তারা তাওহীদপন্থী। তাহলে দোষটা কী? দোষটা হল, আপনি যখন কবরের পাশে কুরআন পড়ছেন, দুআ-খায়ের করছেন, আল্লাহর কাছে দুআ করছেন, কী জন্য চাচ্ছেন? মসজিদ রেখে কবরে কেন গেছেন? কারণ আপনার ধারণা, ওখানে চাইলে আল্লাহ তাড়াতাড়ি শোনবেন। এবার একটা কল্পনা করেন: একটা মা, তার বাচ্চা আছে, বাচ্চাটার যখনই কিছু প্রয়োজন হয়, খালার কাছে চলে যায়। অথবা বড় আপুর কাছে চলে যায়– 'আপু, আম্মুকে একটু বলে দাও'। মা কি এই ধরনের বাচ্চা পছন্দ করে? করে না। ওই সন্তানের বিশ্বাস, মা আমাকে ডাইরেক্ট চাইলে কিছু দেবে না। খালার মাধ্যমে চাইলে দেবে। যে সন্তান মায়ের ব্যাপারে এই রকম ধারণা করে, আমি খাবার চাইলে, দুধ চাইলে সরাসরি দেবে না বা নাও দিতে পারে, বরং খালার কাছে বা আপুর কাছে যেয়ে চাইলে মা দেবে; এই রকম চিন্তা কোনো সন্তান করে না, কিন্তু যদি করে, মা কি সেই ছেলেকে পছন্দ করে? করে না। ওই সন্তান ওর মায়ের মাতৃত্বকে অপমান করেছে। ছোট করেছে। মায়ের মাতৃত্ব হল, সন্তান সবার আগে তার কাছে চাইবে। আমরা যখন মনে করি, আল্লাহর দুআ কবুল, আল্লাহর রহমত, আল্লাহর বরকত, আল্লাহর নেক নযর পাওয়ার জন্য এই জায়াগার চেয়ে ওই জায়গার দাম বেশি, তাহলে আল্লাহর রহমত, বরকতকে আমি ছোট করে ফেললাম। আল্লাহর নেক নযর, রহমত, বরকত পাওয়ার জন্য অমুক ব্যক্তি বা অমুকের মাধ্যমে গেলে জিনিসটা বোধহয় তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে– আপনি আল্লাহর রহমতের অসীমত্বকে অস্বীকার করলেন। আল্লাহর একজন মাখলুককে আল্লাহর আরেকজন মাখলুকের জন্য বেরিয়ার (মাধ্যম) বানিয়ে দিলেন। আল্লাহর রুবুবিয়্যাতকে অপমান করলেন। কবর যিয়ারত করা, সালাম দেয়া, নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ করা– এটা ইবাদত। কিন্তু কবর যিয়ারত করা এই জন্য যে, ওখানে গেলে আল্লাহ তাড়াতাড়ি দুআ শুনবেন– এটা শিরক। আপনি আল্লাহ তাআলার রহমত-বরকতের মহত্বকে,

বড়ত্বকে ছোট করলেন। যে আল্লাহ নিজে ঘোষণা দিলেন:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

আল্লাহ তোমার কাছে, নিকটে। আমার বান্দা যেখানে যে অবস্থাই আমাকে ডাকুক, আমি সাড়া দেব।[৪] আপনি আল্লাহর কথা বিশ্বাস না করে আল্লাহর রহমতকে সংকুচিত করলেন। এটা শিরকের প্রথম কারণ। দ্বিতীয় হল, আপনি যখনই কারো কবরে গিয়ে কারো ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে কিছু চাইবেন, আপনার ভেতরে এক পর্যায়ে একীন (বিশ্বাস) আসবে যে, এই মাধ্যমেই আমি পেয়েছি। না হলে আল্লাহ দিতেন না। এই মানুষটার প্রতি আপনার রুবুবিয়্যাত-উলুহিয়্যাতের ভক্তি এসে যাবে। আর আল্লাহ যে বড়, মহান, আল্লাহ যে ইয়াহুদি-খ্রিস্টানদেরও দিচ্ছেন, আল্লাহ না চাইলে দিতে পারেন– এই বিশ্বাসটা আপনার নষ্ট হয়ে যাবে। এ জন্য কবর যিয়ারতের ব্যাপারে সাবধান।

বাবা মারা গেছে, ভাই মারা গেছে, আত্মীয়-স্বজন মারা গেছে, একবার দুবারের জন্য কবরের পাশে গিয়ে সালাম দেয়া, মেয়েদের জন্য, ইনশাআল্লাহ জায়িয হবে।

প্রশ্ন-১৪০: কবরের পাশে গিয়ে ভালো নিয়্যাতে কুরআন শরীফ পড়া বৈধ কি না?

উত্তর: ভালো নিয়্যাত মানে কী? কবরের পাশে পড়লে আল্লাহ তাড়াতাড়ি শোনবেন– এটাই তো ভালো নিয়্যাত? নাকি সাওয়াব বেশি হবে? মসজিদে পড়লে আল্লাহ দেরি করে শোনবেন, কবরের পাশে তাড়াতাড়ি শোনবেন, নাকি? কবরের পাশে ভালো নিয়্যাতটা কী? এক নাম্বার হল, মাইয়্যেত শোনবে। কবরে যে মরে আছে সে শোনবে। এই নিয়্যাতে কেউ পড়ে কি না? যিনি মরে গেছেন তার তো সব আমল বন্ধ হয়ে গেছে।

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ...

তার তো সব আমল বন্ধ হয়ে গেছে।[৫] সে শোনবে কী করে? আর শুনে তার লাভটা কী? তাহলে কে শোনবে? আল্লাহ শোনবেন? আল্লাহ তো ঘরেই শুনতেন। কবরের পাশে একমাত্র যিয়ারতের সালাম দেয়া ছাড়া অন্য কোনো ইবাদতের জায়গা বানানোটাই নাজায়িয। ইবাদত আল্লাহর। আপনি কবরের পাশে যান কাকে খুশি করতে? কবরের মাইয়্যেতকে? না আল্লাহকে? আল্লাহ তো ঘরে বসে কুরআন পড়লে বেশি খুশি হন।

প্রশ্ন-১৪১: কবরের কাছে গিয়ে কি শুধু মুখে দুআ করব নাকি হাত তোলা যাবে?

[৪] সূরা: [২] বাকারা, আয়াত: ১৮৬।

[৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৬৩১; সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-২৮৮০; সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-১৩৭৬; সুনান নাসায়ি, হাদীসন নং-৩৬৫১।

উত্তর: কবর যিয়ারতের ব্যাপারে রাসূল ﷺ থেকে কয়েক ডজন হাদীস এসেছে। সবগুলো হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরের কাছে গিয়ে হাত না তুলে, আনুষ্ঠানিক দুআ না করে সালাম দিতেন। সালামের সাথে দু-একটা বাক্য দিয়ে দুআ করতেন। মুখে মুখে। তবে একটা ব্যতিক্রম আছে। একটা হাদীসে এসেছে, আয়িশা ؓ বলছেন, একদিন রাতে দেখি রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। আমি ভাবলাম, আমার অন্য কোনো সতীনের ঘরে যাচ্ছেন কি না...! আমি তাঁর পিছে পিছে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'বাকি গোরস্থানে' গিয়ে হাত তুলে আল্লাহর কাছে দুআ করছেন। পরে উনি বললেন, আমার কাছে জিবরাঈল এসেছিলেন। জিবরাঈল আমাকে বাকি গোরস্তানের মৃতদের জন্য দুআ করতে বললেন। এ জন্য আমি তাদের জন্য দুআ করতে গেছিলাম। হাদীসে পাওয়া যায়, উনি কিবলামুখি হয়ে হাত তুলে দুআ করেছেন। কাজেই মূল সুন্নাত হল, যিয়ারত মানে সালাম দেয়া। দুআ আপনি বাড়ি বসে করলেও আল্লাহ পৌঁছে দেবেন। যদি কবর যিয়ারতের জন্য দুআ করতে হয়, অবশ্যই কিবলার দিকে হয়ে দুআ করবেন। কিবলার দিকে মুখ করে দুআ করা দুআর আদব এবং সুন্নাত। তবে কেউ যদি ইচ্ছা করে কিবলা থেকে মুখ ফিরিয়ে কবরকে কিবলা বানিয়ে কবরের দিকে মুখ করে দুআ করে– এটা শিরক। কারণ আপনি যদি বিশেষ ব্যক্তি বা দিককে কিবলা বানিয়ে নেন, তাহলে এটা দ্বারা আপনি আল্লাহর সাথে শিরক করলেন। আপনি মনে করছেন, ওর মাধ্যমে বোধহয় আল্লাহ ইবাদতটা গ্রহণ করবেন। এ জন্য যদি কবরের কাছে গিয়ে হাত তুলে দুআ করেন, তাহলে কিবলার দিকে মুখ করে আল্লাহর কাছে দুআ করবেন। আর সব সময় মনে রাখতে হবে, যিয়ারত মানে দেখা করা, সালাম দেয়া। দুআর জন্য আপনি যেখান থেকেই দুআ করবেন, আল্লাহ পৌঁছে দেবেন।

প্রশ্ন-১৪২: মৃত ব্যক্তির ব্যবহার্য জিনিস তার পরিবারের লোকেরা ব্যবহার করতে পারবে কি না?

উত্তর: ব্যবহার যদি না করা যায়, তার গাড়িটা কী করবেন? তার ব্যবহার করা ঘরটা কী করবেন? দোকান কী করবেন? ছোটখাটো জামা নিয়ে মাসআলা জিজ্ঞেস করতে আইছেন! যেটা দরকার সেটা আমরা করি না। যেমন আমরা মুসলিমরা নবীজি ﷺ এর কিছু মানি না। কিন্তু তিনি দাড়িতে মেহেদি দিতেন, তাই মেহেদি আমরা পায়ে দিতে চাই না। অতিভক্তি চোরের লক্ষণ। মৃত ব্যক্তির সবই আমরা ব্যবহার করতে পারি। তিনি যা রেখে গেছেন, সবকিছু উত্তরাধিকারদের মধ্যে ভাগ হবে। সবকিছু ব্যবহার করা যাবে, কোনো সমস্যা নেই।

দুআ/আমল

প্রশ্ন-১৪৩: বিভিন্ন কাজের জন্য ভিন্নভিন্ন দুআ আছে। কিন্তু দুআগুলো না জানার কারণে কেউ যদি শুধু 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়ে, তাহলে কি হবে?

উত্তর: হবে। সব কাজ বিসমিল্লাহ্ বলে শুরু করলে হবে।

প্রশ্ন-১৪৪: এমন সময় কি আসবে যখন মুসলিমদের কোনো দুআই কবুল হবে না?

উত্তর: দুআ কবুল হবে না, ব্যাপার তা নয়। কিছু হাদীসে এসেছে, যখন সমাজে অন্যায় হয়, মুসলিমরা প্রতিবাদ করে না, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কিছু বলবে না, তখন আল্লাহ গযব দেবেন। ওই গযবের সময় দুআ করলে আল্লাহ শুনবেন না। যেমন বর্তমানে আমাদের সমাজে অন্যায় হচ্ছে। আমরা প্রতিবাদ করছি না। হুযুররা ভাবছেন আরামেই তো আছি। দাওয়াত খাচ্ছি। বিরানি খাচ্ছি। আল্লাহ গযব যখন দেবেন, হুযুররা তখন যতই দুআ করুক, আম গযবের সময় দুআ করলে আল্লাহ গ্রহণ করবেন না।

প্রশ্ন-১৪৫: উত্তমরূপে ওযু করে কালিমা শাহাদাত পড়লে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যায়– এটা কি সহীহ হাদীস?

উত্তর: জি, সহীহ হাদীস।[১]

প্রশ্ন-১৪৬: শুক্রবারে কোন কোন সময়ে দুআ করলে দুআ কবুল হয়?

উত্তর: খুতবার সময়ে এবং সূর্যাস্তের আগে দুআ কবুলের সময়। এ ছাড়া তাহাজ্জুদের সময়, নামাযের সিজদায় দুআ করবেন।

প্রশ্ন-১৪৭: শুক্রবারে সূরা কাহফ তিলাওয়াতের ফযীলত কী? রাত বলতে বৃহস্পতিবারের দিবাগত রাত কি না?

উত্তর: সূরা কাহফ শুক্রবার দিনে বা রাতে পড়লে সহীহ হাদীসে বিভিন্ন ফযীলতের কথা আছে। আল্লাহ তার আসমান-যমিন নূরে ভরে দেন। সাতদিন অথবা দশদিন পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য দুআ করতে থাকেন। শুক্রবার রাত মানে হল

---

[১] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৩৪; সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-১৬৯; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-১৭৩১৪; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস নং-২২২; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস নং-১০৫০।

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত।

প্রশ্ন-১৪৮: শুক্রবারে অর্থ ছাড়া সূরা কাহফ পড়লে ফযীলত পাওয়া যাবে কি না?

উত্তর: অর্থসহ তিলাওয়াত করলে হক তিলাওয়াত হয়। অর্থ ছাড়া পড়লে না-হক তিলাওয়াত হয়। তবে আশার করা যায় মূল যিকরের ফযীলত পাওয়া যাবে। অর্থ বোঝার চেষ্টা করবেন।

প্রশ্ন-১৪৯: দশবছর ধরে আল্লাহর কাছে একটা জিনিস চাচ্ছি। আল্লাহ দিলেন না। অথচ মায়ের কাছে চাইলে এতদিনে দিয়ে দিত।

উত্তর: মায়েরা তো বোঝে না। বাচ্চা আইসক্রিম চায়, মা কিনে দেয়। কিন্তু পরে এটা ক্ষতি করে। আমার ভবিষ্যতের জন্য কোন জিনিসটা ভালো, মা বোঝে না। কিন্তু আল্লাহ বোঝেন। আপনার সব চাওয়ার সাওয়াব আল্লাহ জমা করে রেখেছেন। আপনি যেটা চেয়েছেন, হতে পারে সেটা এই মুহূর্তে আপনার জন্য ক্ষতিকর। এ জন্য আল্লাহ তাৎক্ষণিকভাবে দেন নি। এতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই।

প্রশ্ন-১৫০: ফজর এবং মাগরিবের পর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়ার ফযীলত কী?

উত্তর: হাদীসটা একটু দুর্বল। ইমাম তিরমিযি রাহ. হাদীসটা এনেছেন। তিনি গরীব (হাদীসের একটা পরিভাষার নাম 'গরীব') বলেছেন। অন্যান্য মুহাদ্দিস যয়ীফ বলেছেন। তো এর ফযীলত হল, ফজর এবং মাগরিবের পরে 'আউযু বিল্লাহিস সামীয়িল আলীমি মিনাশ শায়তানির রাজীম' তিনবার অথবা একবার পড়ে হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়লে সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য দুআ করবেন। যদিও হাদীসটা একটু দুর্বল।[২] তবে একটা বিষয় খেয়াল করতে হবে। আমরা সকল মাসনুন ইবাদতকে বিদআত বানিয়ে ফেলি। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে আয়াতুল কুরসি পড়লে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত বরাদ্দ করবেন। সহীহ হাদীস। এর মানে কি নামাযের পরে আমরা দল ধরে আয়াতুল কুরসি পড়ব নাকি প্রত্যেকে যার যার মতো পড়ব? তেত্রিশ বার সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ পড়ারও অনেক ফযীলত। দল ধরে পড়ব না একা একা পড়ব? সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস– দল ধরে পড়ব না একা একা পড়ব? নামাযের পরের সকল মাসনুন যিকর একাকি করতে হবে। কাজেই যদি মসজিদে দল ধরে করা হয়, এটা একদিন দুইদিন শেখানোর জন্য হলে দোষ নেই, নইলে এটা কিন্তু বিদআত হয়ে

---

[২] সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-২৯২২; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-২০৩০৬।

যাবে। ফজর এবং মাগরিব বাদ হাশরের শেষ তিন আয়াত একাকি পড়তে হবে।

প্রশ্ন-১৫১: আমরা দুই বন্ধু মেসে এক রুমে থাকি। দুইজনই ঘুমের আগে দুই রাকআত নামায পড়ি এবং সিজদায় আল্লাহর কাছে চাই। কিন্তু আমার সকল আমল বন্ধু দেখে ফেলে, তাই মনে হয়, এতে আমার রিয়া হয়ে যাচ্ছে। এই বিষয়ে আপনার পরামর্শ কী?

উত্তর: অসুবিধা নেই। তুমি তোমার মতো আমল করো। কে কী শুনল, দেখল– এটা ব্রেন থেকে বের করে দাও।

প্রশ্ন-১৫২: চটি বইয়ে অনেক দুআ আছে। কিছু দুআ আছে, পড়লে আশি বছরের গোনাহ মাফ হয়, দুইলক্ষ নেকি হয়। এসব দুআ কতটুকু সঠিক?

উত্তর: এগুলোর বেশির ভাগই বানোয়াট কথা। চটি বই পড়বেন কেন! এমন বই পড়বেন, যেখানে রেফারেন্স দেয়া আছে। বড় আলিমদের লেখা বই পড়বেন।

প্রশ্ন-১৫৩: আল্লাহকে যারা ডাকে না, আল্লাহ তাদের অনেক দেন। আর আল্লাহকে যারা বেশি বেশি ডাকে আল্লাহ তাদের কিছুই দেন না কেন?

উত্তর: এটা ভুল কথা। আমি তো দেখি উল্টাটা। আল্লাহকে ডাকি বলে আমার মতো একজনকে ফকীরকে আল্লাহ সবই দিচ্ছেন। আল্লাহকে ডাকলে দেন না, এটা ভুল কথা। হয় আপনার ডাকাটা ঠিক মতো হচ্ছে না, অথবা আল্লাহ আপনাকে পরে দেবেন।

প্রশ্ন-১৫৪: আমরা কীভাবে সহজে জান্নাতে যেতে পারি?

উত্তর: জান্নাতে যাওয়া আসলেই সহজ। আপনি কুরআন কম হোক বেশি হোক কিছু পড়ার চেষ্টা করবেন। তরজমা কিছু পড়বেন। হাদীসের সহজ বই **রিয়াদুস সালিহীন** কিনে এনে পড়বেন। **মিশকাত** পড়বেন। অল্প অল্প। এর মাধ্যমে আপনার মধ্যে ঈমান-তাকওয়া তৈরি হবে। সমাজের যে আলিমদেরকে ভালো পাবেন, এই রকম অন্তত দু-চারজন আলিমের সোহবত নেবেন। শুধু কুরআন হাদীস পড়ে ফকীহ হওয়া যায় না। তাকওয়া অর্জন হয়। পাশাপাশি ভালো আলিমদের সোহবত নেবেন। আপনি আলিমদের সাথে মিশবেন। তাদের তাকওয়া, দীনদারি পছন্দ হলে সোহবত নেবেন। তবে কাউকে অ্যাবসলুট মানবেন না। অন্তত দুজন, চারজন আলিমের সোহবত নেবেন। তাদের কাছে বসবেন। দীনের আলোচনা করবেন। দীনদার লোকদের ভালোবাসবেন। এইভাবে, ইনশাআল্লাহ, খুব সহজে জান্নাত পাবেন।

প্রশ্ন-১৫৫: যিকির করলে লাভ কী?

উত্তর: যিকির করলে অনেক লাভ। তবে কথা হল, আপনি যিকির করা বলতে কী বোঝাচ্ছেন? যিকির যদি হয় ঘাড় নেড়ে, চিল্লায়ে, লাফালাফি করে, তাহলে এটার নাম যিকির নয়। আবার যিকিরের শব্দটা কী হবে? সুন্নাত যিকির, মাসনুন যিকিরগুলো যদি আমরা করি, সুন্নাত পদ্ধতিতে করি, সুন্নাত পদ্ধতি মানে স্বাভাবিক; সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা হাওলা ওয়া লা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ– এগুলো যিকিরের শব্দ। আবার দুআ করা– আল্লাহ আমার ভালো করো, আল্লাহ আমার ছেলেমেয়ে দাও, আল্লাহ আমার মেয়ের বিয়ের (ব্যবস্থা করে) দাও, ছেলের চাকরি দিয়ে দাও– এগুলো দুআ এবং এগুলোও যিকির। আমি যখন বলছি, আল্লাহ, আমার এটা দাও, ওটা দাও– কার কথা মনে করছি? আল্লাহর কথা মনে করছি। এটা কিন্তু যিকির। যিকির প্লাস চাওয়া। আর সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার– এগুলো যিকির। আল্লাহকে স্মরণ করা। আল্লাহর তা'যীম করা। এগুলোর ফায়দা হল, এক নাম্বার, আপনি যতক্ষণ এই মাসনুন যিকির করবেন, ওযু থাক না থাক, গোসল করেন না করেন, যে অবস্থাই থাকেন, আপনার আমলনামায় প্রতিটি বাক্যের মাধ্যমে আল্লাহ অফুরন্ত সাওয়াব দেবেন। দুই নাম্বার লাভ হল, আপনি যতক্ষণ আল্লাহর যিকির করবেন, আপনার কলবটা আল্লাহর সাথে জুড়ে থাকবে। এতে করে আপনার কলবটা রিচার্জ হবে। আপনার কলবে তাকওয়া, রুহানিয়্যাত বৃদ্ধি পাবে। তৃতীয় লাভ হল, কলব যখন শক্তি পাবে, আপনার ভেতর থেকে দুশ্চিন্তা কমে যাবে। আল্লাহর উপর নির্ভরতা আসবে। পাপের প্রতি ঘৃণা বাড়বে। নেকআমলের আগ্রহ জন্মাবে। এখন, আমি যখন যিকিরের কথা বলি, আমাদের সমাজে মানুষ তো অনেক রকম, বিশেষ করে বেশি আপত্তি করেন যারা ইসলামি রাজনীতি করেন। তাদের চাওয়া হল, ওয়ায মাহফিলে গেলেই রাজনীতির কথা বলতে হবে, আমরা তা বলি না। কারণ রাজনীতি দীনি দাওয়াতের একটা বড় দিক। কিন্তু সেই পর্যায়ে যাওয়ার জন্য তো আরো অনেক কিছু লাগবে। তো আমি এক জায়গায় গিয়ে যিকিরের কথা বলেছিলাম, 'আপনারা কিছু না পারেন, অন্তত সব সময় যিকির করবেন'। তো দুটো প্রশ্ন এসেছে। একটা হল, হারাম খায়, গোনাহ করে, বান্দার হক নষ্ট করে, তাহলে যিকির করে কী লাভ? কথাটা সত্য। আপনি সারা গায়ে গু মেখে রাখলেন। নাকে আতর মেখে তো লাভ নেই। তবে এক্ষেত্রে একটা লাভ আছে। সেটা হল, যদি সত্যই অন্তর দিয়ে যিকির করেন, এই হারাম কাজগুলোর প্রতি মনে ঘৃণা আসতে থাকবে। হালাল কাজ করার, ফরয কাজ করার, হারাম বর্জন করার শক্তি বাড়ার সম্ভাবনা আছে। আর কেউ যদি অন্তর দিয়ে যিকির না

করে, তাহলে লাভ হবে না। কিন্তু সত্যই আল্লাহর মুহাব্বতে কেউ যদি যিকির করে, সুন্নাত যিকিরগুলো করে, দুআ করে তাহলে ইনশাআল্লাহ, যে পাপের ভেতরে সে লিপ্ত আছে, এই পাপের প্রতি মনে ঘৃণা জন্মাবে, বেঁচে থাকার আগ্রহ বাড়তে থাকবে বলে আশা করা যায়। তবে মনে রাখতে হবে, যদি আপনি হারাম কাজে লিপ্ত থেকে নফল যিকির করেন, এটা মূলত আপনার ফায়দা দিচ্ছে না। যদি অন্তরের সাথে করেন, আপনার মূল ফায়দাটা এনে দেয়ার সম্ভাবনা আছে। আর একজন প্রশ্ন করছে, 'তাগুতের পক্ষে থেকে নামাযকে সহীহ করে, আল্লাহর যিকির করে কী লাভ'? তাগুতের পক্ষ থেকে কেন বললেন, বুঝতে পারছি। আমরা রাজনৈতিকভাবে দ্বিধাবিভক্ত। এখন হয়ত কেউ কোনো ইসলাম বিরোধি দলের ভোট দেয়। তাহলে তার নামাযের কী দাম! বিষয়টা ওরকম নয়। যে ব্যক্তি সত্যিকারের সহীহ নামায পড়ে, বুঝে যিকির করে, সে কখনোই আর তাগুতের পক্ষে থাকে না। বাহ্যিক কোনো দলের সাপোর্ট করে, এটা বড় কথা নয়। তবে তার অন্তরটা আস্তে আস্তে শয়তানের খপ্পর থেকে বেরোতে থাকে। তার মনে কুরআন পড়ার আগ্রহ হয়। তার মনে দীন জানার আগ্রহ হয়। এ জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ যিকিরের কথা বলেছেন। আমি বানিয়ে বলছি না। এক সাহাবি এসে বলছেন:

يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ شَرَائِعَ الإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ

ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইসলামের হুকুম-আহকাম তো অনেক। মানে নফল হুকুম। অনেক ইবাদত। কোনটা থুয়ে কোনটা করব বুঝি না। আপনি আমাকে একটা আমল বলেন যে, এইটা দিয়ে সব চলবে। যেটা আমি আঁকড়ে ধরে রাখব। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:

لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ

তোমার যবানটা যেন সব সময় আল্লাহর যিকিরে ভেজা থাকে।[৩] অনেকে আমরা বলি, যিকির মানে উচ্চারণ নয়, যিকির মানে আমল। যিকির মানে আমল ঠিক আছে। আপনি হালাল কাজটা করলেন আল্লাহর কথা মনে করে, অবশ্যই এটা যিকির। হারাম কাজ করলেন না, আল্লাহর ভয়ে, এটাও যিকির। তবে মুখের যিকিরেরও গুরুত্ব আছে।

প্রশ্ন-১৫৬: গোনাহ থেকে বাঁচার উপায় কী?

উত্তর: মানুষ গোনাহ করে ফেলে। এতে হতাশ হবেন না। তাৎক্ষণিক তাওবা

---

[৩] মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-১৭৬৮০; সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-৩৩৭৫; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং-৩৭৯৩; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস নং-৮১৪; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস নং-১৮২২।

করতে হবে। তাওবার যেন দেরি না হয়। গোনাহ হয়ে গেলেই আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করতে হবে। দুই রাকআত নামায পড়ে তাওবা করতে হবে– 'আল্লাহ, আমি আর করব না। মাফ করে দাও। আল্লাহ আর যেন না করি, তাওফীক দিও। কখনোই করব না'। নিয়্যাতে কোনো ত্রুটি থাকা চলবে না। দুই নাম্বার হল, গোনাহ থেকে বাঁচার প্রথম কাজ হল, যে পরিবেশে থাকলে গোনাহ হয়, সেই পরিবেশ বর্জন করতে হবে। যে ব্যক্তির জন্য, যে জায়গার জন্য গোনাহ হয়, সেই উপকরণগুলো বর্জন করত হবে। অবসর সময়ে বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করতে হবে। নফল ইবাদত করতে হবে। নেককার মানুষদের সোহবতে মাঝেমাঝে যেতে হবে। ভালো মানুষদের সোহবতে থাকা, খারাপ মানুষদের সঙ্গ ত্যাগ করা– এগুলো দরকার।

প্রশ্ন-১৫৭: পাগড়ি পরে নামায পড়লে আলাদা কোনো সাওয়াব পাওয়া যাবে কি না?

উত্তর: রাসূলুল্লাহ ﷺ পাগড়ি পরতেন, এ জন্য পাগড়ি পরা সুন্নাত। পাগড়ি পরে নামাযের সাওয়াবে যতগুলো হাদীস আছে, অর্থাৎ পাগড়ি পরে নামায পড়লে সত্তর গুণ, বাহাত্তর গুণ, একশ গুণ, এক হাজার গুণ সাওয়াব হবে– এই হাদীসগুলো সবই মুহাদ্দিসরা জাল বলেছেন।[৪]

প্রশ্ন-১৫৮: ছোট ছোট দরুদ শরীফ বলবেন কী?

উত্তর: আমার **রাহে বেলায়াত** বইয়ে দরূদের অনেক অপশন দেয়া আছে। মাসনুন দরূদ বড়। তবে ছোট দরূদ যদি যে কোনোভাবে আপনি বলেন, আদায় হয়ে যাবে।

প্রশ্ন-১৫৯: আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নামসমূহ স্মরণ ও বলার ফযীলত এবং বিশেষ বিশেষ সমস্যা ও বিপদ থেকে বাঁচার দুআ একত্রে কোন বইয়ে আছে?

উত্তর: আমাদের সমাজে আল্লাহ তাআলার নাম নিয়ে যত বই আছে, সব বাজে কথা। জাল-জালিয়াতি। আল্লাহ তাআলার একেক নামে একেক বিপদ কাটে– এসব ঠিক নয়। তবে আল্লাহ তাআলার সকল নাম পড়া, এগুলোর ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ চাওয়া– এগুলো ভালো। আর বিপদ কাটার জন্য, একেক বিপদের জন্য একেক মাসনুন দুআ আমার **রাহে বেলায়াতে** আছে। **হিসনুল মুসলিম** নামে একটা আরবি বইয়ের বাংলা অনুবাদ পাওয়া যায় এদেশে, এগুলো পড়তে পারেন।

---

[৪] মুল্লা আলী, আল মাসনূ', পৃ. ১১৮; আল আসরারুল মারফুআহ, পৃ. ২৩২-২৩৩; আলবানি, সিলসিলা যয়ীফাহ ১/২৫১; ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি, পৃ. ৬৩৪-৬৩৬।

প্রশ্ন-১৬০: 'আল্লাহ আল্লাহ', 'ইল্লাল্লাহ' যিকির জোরে জোরে কি সাহাবিরা কখনো করেছেন?

উত্তর: আস্তে আস্তেই কি করেছেন? আল্লাহ আল্লাহ যিকির সাহাবিরা কখনো জীবনে করেছেন, তাবিয়িরা কখনো করেছেন– কোথাও নেই। 'আল্লাহ আল্লাহ' যিকির ছিলই না। অধিকাংশ তরীকাতে নেই। যেমন শাজেলিয়া তরীকাতে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' যিকির আছে। নকশবন্দিয়া তরীকাতে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' যিকির আছে। মুজাদ্দেদিয়া তরীকাতে পরে 'আল্লাহ আল্লাহ' যিকির পরে ঢুকেছে। তাও মুখে না, মনে মনে। কোনো কাদীম (প্রাচীন) আলিম 'আল্লাহ আল্লাহ' যিকির করেন নি। পরবর্তী যুগে এটা এসেছে। যিকির মানে শুধু নাম জপা নয়। বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু– এর নাম যিকির নয়। বঙ্গবন্ধু জাতির নেতা– এর নাম যিকির। আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর– এর নাম যিকির নয়। আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর ভালো লোক– এর নাম যিকির। যিকির মানে স্মরণ এবং তা'যীম।

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

[আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি][৫]

তো এই জন্য হাদীস শরীফে আমরা যত যিকির পাই, কোনোটাই শব্দ নয়, বাক্য। আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহর নাম যিকির করে নামায শুরু করো। আমি আল্লাহ বলে নামায শুরু করলাম। হবে না। 'আল্লাহু আকবার' বলতে হবে। আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহর নাম যিকির করে জবাই করো। আমরা আল্লাহ বলে জবাই করি না। 'বিসমিল্লাহ' বলে জবাই করি।

শব্দ দ্বারা যিকির করা পরবর্তী বুযুর্গরা কেউ কেউ করেছেন, সাময়িক মনটাকে আল্লাহমুখি করার জন্য। কিন্তু এটা সুন্নাত নয়। এটাকে দীন বানালে বিদআত হয়ে যাবে। সুন্নাতের ভেতর ইবাদত করার চেষ্টা করতে হবে। আর 'ইল্লাল্লাহ'র যিকির তো কেউই করে নি। এটা আরো দুর্বল। এসবাতে মুজার্‌রদ বলা হয়– শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি 'আল্লাহ আল্লাহ'কে এসবাতে মুজার্‌রদ বলেছেন। 'ইল্লাল্লাহ' উনিও লেখেন নি। পরবর্তীতে এসে গত কয়েকশ বছর 'ইল্লাল্লাহ' যিকির কোনো কোনো তরীকায় ঢুকানো হয়েছে। এটা সুন্নাত নয়। এবং আপত্তিকর। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সর্বোচ্চ যিকির। সর্বোত্তম যিকির। আর মজা হল, এর ভেতর কোনো কঠিন শব্দ নেই। হারফে হালকি নেই। উচ্চারণে কষ্ট নেই। তো এটাকে আবার অর্ধেক কাটব কেন! কষ্ট হচ্ছে, গলা ব্যথা করছে! 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' যতক্ষণ বলব ততক্ষণ শ্রেষ্ঠ যিকির। এটাকে আবার ভেঙে টুকরো কেন করব! অর্থটাও ভালো নয়। 'আল্লাহ ছাড়া' 'আল্লাহ ছাড়া' 'আল্লাহ ছাড়া'। কেন করব!

[৫] সূরা: [৯৪] ইনশিরাহ, আয়াত: ৪।

এখন আমরা ব্যাকরণ দিয়ে করি। নাহ্ সরফ দিয়ে তো যিকির করা যায় না। তাহলে তো 'আকবার আকবার' বলেও যিকির করা যাবে। কারণ কুরআনে আছে, মুবতাদা (উদ্দেশ্য) হযফ (উহ্য) করে খবর (বিধেয়) বলা যায় (আরবি ব্যাকরণে পূর্ণাঙ্গ বাক্যের উদ্দেশ্য বিলুপ্ত করে বিধেয় উল্লেখ করা যায়)। যিকির হবে নবীজি ﷺ যে তরীকায় শিখিয়েছেন সেই তরীকায়। এ জন্য, 'ইল্লাল্লাহ' যিকির, 'আল্লাহ অল্লাহ' যিকির সাহাবিরা জোরে আস্তে কখনোই করেন নি। এগুলো কোনো কোনো তরীকায় আছে। আমরা এগুলো বর্জন করাটাকেই উত্তম মনে করি।

প্রশ্ন-১৬১: রোযার সময় কখন কুরআন তিলাওয়াত করা উত্তম?

উত্তর: দিনের বেলায় কুরআন তিলাওয়াত, রাত্রিবেলায় কিয়ামুল লাইলের মধ্যে নিজে কুরআন পড়া অথবা শোনা উত্তম।

প্রশ্ন-১৬২: ফরয নামাযের পর নাকি দলীয়ভাবে হাত তুলে মুনাজাত করা যায় না। এখন আমার প্রশ্ন হল, কোনো মাহফিলে দলীয়ভাবে হাত তুলে মুনাজাত করা যাবে কি না?

উত্তর: মুনাজাতে হাত তোলা আদব। রাসূলুল্লাহ ﷺ মাঝেমাঝে করতেন এটা। মাঝেমাঝে অনেকেই দুআ চেয়েছেন, উনি হাত তুলেছেন, সাহাবিরা সাথে হাত তুলেছেন। জুমুআর খুতবার সময় একজন বৃষ্টির জন্য দুআ করতে বলেছিলেন। তিনি হাত তুলেছেন, সাহাবিরাও হাত তুলেছেন। দুআর আবেগে হাত তোলা যায়।

প্রশ্ন-১৬৩: আমরা অনেক সময় বলি– 'হে আল্লাহ, অমুককে হায়াতে তায়্যিবা দান করুন'– এই দুআর ব্যাখ্যা কী?

উত্তর: হায়াতে তায়্যিবা মানে হল পবিত্র জীবন। এটা ভালো দুআ। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, নেকআমল করলে তিনি হায়াতে তায়্যিবা দান করেন। অথবা আমরা এমন দুআ করব– 'নেক আমলময় হায়াত দেন'।

প্রশ্ন-১৬৪: 'ইয়াহুদি-খ্রিস্টানদের হেদায়াত থাকলে হেদায়াত দেন, না থাকলে ধ্বংস করে দেন'– এমন দুআ করা যাবে কি না?

উত্তর: অবশ্যই করা যাবে। এই দুআই তো করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ হেদায়াতের দুআও করেছেন। আবার ধ্বংসের দুআও করেছেন। আমরা আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতাঈনুকা দুআ পড়ি এর সাথে সহীহ দুআ আছে– যারা ইহুদি-নাসারা, ইসলামের দুশমনি করে, ইসলামের ক্ষতি করে, আল্লাহর দীনের সাথে শত্রুতা করে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের হেদায়াত দেন অথবা ধ্বংস করেন।

যাকাত/উশর/ফিতরা/মানত

প্রশ্ন-১৬৫-ক: বর্তমানে কী পরিমাণ টাকা থাকলে তার উপর যাকাত ফরয?

উত্তর: একত্রিশ-বত্রিশ হাজার টাকা যদি কারো কাছে একবছর জমা থাকে তাকে যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন-১৬৫-খ: বর্তমানে কী পরিমাণ নগদ টাকা থাকলে যাকাত দিতে হবে?

উত্তর: সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার বর্তমান যে বাজারমূল্য– ওই পরিমাণ নগদ টাকা থাকলেই তার উপর যাকাত ফরয।

প্রশ্ন-১৬৬: আমার এক আত্মীয় দীনদার মানুষ। তিনি দরিদ্র এবং ঋণগ্রস্ত। আমার যাকাতের কথা প্রকাশ না করে ঋণ পরিশোধের জন্য তাকে আমি যাকাত দিতে পারব কি না?

উত্তর: আপনি যদি নিশ্চিত হন তিনি যাকাত পাওয়ার যোগ্য, তাহলে বলা লাগবে না। দেয়ার সময় আপনি নিয়্যাত করে দিয়ে দেবেন। যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

প্রশ্ন-১৬৭: বিভিন্ন ওয়ায মাহফিলে শুনেছি, বেনামাযিকে দান করা যাবে না। অথচ অধিকাংশ বেনামাযিই গরীব। তাদেরকে নামাযের কথা বলা হলে শোনে না। আবার খালি হাতে ফিরিয়ে দেয়াও যায় না। কী করা উচিত?

উত্তর: বেনামাযিকে দান করা যাবে না, ব্যাপারটা এমন নয়। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবাইকে দান করা যাবে। যদি অসহায় মানুষ হয়, তাকে দান করা যাবে। অমুসলিম হলেও দান করা যাবে। এক্ষেত্রে একজন মানুষকে সাহায্য করার সাওয়াব পাবেন। আর একজন অসহায় নামাযিকে সাহায্য করলে সাওয়াব বেশি হবে। তবে বেনামাযিকে ফরয দান, অর্থাৎ যাকাত-মানত দেয়া যাবে কি না– এটা নিয়ে কথা আছে। কারণ বেনামাযি অনেক সময় মুসলিম থাকে না। আর বেনামাযিকে ইকরাম (সম্মান) করা, বাড়িতে দাওয়াত দেয়া, সম্মান করা, দাওয়াত নেয়া– এগুলো গোনাহের কাজ।

প্রশ্ন-১৬৮: যাকাত আদায়কারী কোনো মহিলা তার যাকাতের টাকা একবারে রমাযান মাসে না দিয়ে সারাবছর বিভিন্ন সময়ে দিতে পারেন কি না?

উত্তর: জি, যে কোনো যাকাত আদায়কারী, নারী বা পুরুষ, বারোমাস যাকাত দিতে পারবেন। হিসাব রাখতে হবে। অ্যাডভান্সও দেয়া যায়, বাকিও দেয়া যায়। অর্থাৎ

রমাযানে আপনার বিশহাজার টাকা যাকাত হয়েছিল, পুরো দেন নি, আপনি পরবর্তী এক দুই মাস ধরে বাকি টাকা দিয়েছেন– এটা জায়িয আছে। আবার আপনি গত রমাযানে পুরো কমপ্লিট করেছেন, আগামী রমাযানে বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা হতে পারে– এই আশায় আপনি প্রথম থেকে বিভিন্ন মাসে দিয়ে দিয়ে লিখে রেখেছেন, রমাযান আসলে হিসাব করে বাকিটা দিয়ে দেবেন, দুটোই জায়িয।

প্রশ্ন-১৬৯: কন্যার জন্য তৈরিকৃত স্বর্ণালঙ্কার নিসাব পরিমাণ হয় নি। কিন্তু স্ত্রীর স্বর্ণ নিসাব পরিমাণ। কন্যার যাকাত কীভাবে দেব?

উত্তর: স্ত্রীর স্বর্ণ স্ত্রীর মালিকানায়। স্ত্রীর যাকাত স্ত্রী হিসাব করে দেবেন। আর মেয়ের জন্য যেটা বানিয়েছেন, এখনো মেয়েকে দেন নি, আপনার মালিকানায় আছে, ওটা আপনার অন্যান্য টাকা-পয়সার সাথে যোগ করে নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত দিয়ে দেবেন। আর মেয়েকে যদি গহনা বুঝিয়ে দিয়ে থাকেন, মেয়ের মালিকানায় চলে যায় তাহলে মেয়ের নিসাব পূর্ণ হতে হবে। নইলে যাকাত ফরয হবে না।

প্রশ্ন-১৭০: ডিপিএসের টাকার যাকাত দিতে হবে কি না?

উত্তর: অবশ্যই ডিপিএসের টাকার যাকাত দিতে হবে। ব্যাংকের যে কোনো টাকার যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন-১৭১: কাউকে টাকা ধার দিলে সেই টাকার যাকাত দিতে হবে কি না?

উত্তর: জি, টাকা ধার দিলে সেই টাকার যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন-১৭২: লেখাপড়ার জন্য আমার পিতা আমাকে কিছু টাকা প্রদান করেন। সেই টাকা যদি নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে কি যাকাত দিতে হবে?

উত্তর: জি, যদি একবছর অতিবাহিত হয় তাহলে যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন-১৭৩: সোনা এবং টাকা মিলে যদি নিসাব হয় তাহলে যাকাত দিতে হবে কি না?

উত্তর: সোনা এবং টাকা মিলে যদি সোনার নিসাব হয়, যেমন পাঁচভরি সোনা আছে এবং দুইলক্ষ টাকা আছে, তাহলে যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন-১৭৪: প্রভিডেন্ট ফান্ডের যাকাত দিতে হবে কি না?

উত্তর: এটা নিয়ে মতভেদ আছে। আমি সাধ্যমতো জানার চেষ্টা করেছি, তাতে

বুঝেছি প্রভিডেন্ট ফান্ডের যাকাত দিতে হবে না। কারণ আমরা এই টাকার মালিকই নই।

প্রশ্ন-১৭৫: আমি একজন ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ী পণ্যের দাম ওঠানামা করে। আমি কোন দামে যাকাত দিব?

উত্তর: বিক্রয়মূল্যের উপর হিসাব করে যাকাত দেবেন।

প্রশ্ন-১৭৬: ফসলের যাকাতের নিসাব কী?

উত্তর: এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কোনো কোনো হিসেবে চব্বিশ মণ হয়। কোনো হিসেবে বিশ মণ। যদি বৃষ্টির পানিতে হয়, তাহলে বিশ মণ ফসল থেকে দুই মণ যাকাত দিতে হবে। আর সেচের পানিতে হলে বিশ মণে এক মণ যাকাত দেয়া ফরয। প্রত্যেক মওসুমে। যদি বৃষ্টির পানি অল্প হয়, সেচের পানি মূল হয়, তাহলে সেচ হিসেবেই গণ্য হবে। আর যদি মূল বৃষ্টি হয়, সেচ অল্প হয়, তাহলে বৃষ্টির হিসাব ধরবেন।

প্রশ্ন-১৭৭: খেজুর, কিসমিস, জব, গম– যে কোনো একটার উপর ফিতরা দিতে হবে, নাকি সবগুলোর উপর দিতে হবে?

উত্তর: যে কোনো এক প্রকারের খাদ্য দ্বারা ফিতরা দিতে হয়। সবরকম না।

উত্তর-১৭৮: পানচাষীরা কীভাবে পানের যাকাত নির্ধারণ করবে? পান একবার লাগানোর পর সারা বছর অল্প অল্প করে বিক্রি হয়। এর বিধান কী?

উত্তর: পান যখন পোক্ত হবে অর্থাৎ বিক্রি করার উপযুক্ত হবে তখন হিসাব করবে, অথবা সারা বছর যে পরিমাণ বিক্রি হয়েছে ওই পানের দশভাগের একভাগ বা বিশভাগের একভাগ উশর আদায় করবে।

প্রশ্ন-১৭৯: ফসল উৎপাদন হলেই কি উশর দিতে হবে? নাকি উৎপাদন করতে গিয়ে যে খরচ হয়েছে সেই খরচ বাদ দিয়ে যদি বিশ মণ থাকে, সেই বিশ মণ থেকে উশর দিতে হবে?

উত্তর: মূলত ফসল উৎপাদন হওয়ার পরে যে ফসল হয়েছে সেই ফসল থেকে বিশ মণে এক মণ দিতে হবে। খরচ বাদ যাবে না। তবে কিছু খরচ যদি ঋণ থাকে, যেমন জনের টাকা বাকি আছে বা সারের টাকা বাকি আছে তাহলে ঋণগুলো দিয়ে দিতে হবে। এরপরে বাকি ফসলের উশর দিতে হবে। অধিকাংশ ফুকাহার মত এটাই। আধুনিক আরেকটা মত আছে। সেটা হল চার ভাগের এক ভাগ খরচ বাবদ

বাদ যাবে। অর্থাৎ আপনি একশ মণ ফসল পেয়েছেন, সেখান থেকে পঁচিশ মণ বাদ দেবেন খরচ বাবদ। আপনি পঁচাত্তর মণের যাকাত দেবেন। এটার পক্ষে বিপক্ষের দলীলগুলো আমার উশর বইয়ে বিস্তারিত পাবেন।

প্রশ্ন-১৮০: ফসলের যাকাতের খাত কী?

উত্তর: একদম যাকাতের খাত। শতভাগ যাকাত।

প্রশ্ন-১৮১: মুসলিম শরীফের হাদীসে এসেছে, ফসল থেকে যদি কিছু অংশ চুরি হয়, সেটা দানস্বরূপ। তাহলে যদি বিশভাগের একভাগ চুরি হয়, সেটা দ্বারা কি উশর আদায় হয়ে যাবে?

উত্তর: দান হবে। উশর হবে না। ফরয ইবাদত নিয়্যাতসহ করতে হয়। চুরি হলে দানের সাওয়াব পাবেন। কিন্তু উশরের ফরয আদায় হবে না।

প্রশ্ন-১৮২: মশুরি, ছোলা ও ফলের উশর দেয়ার জন্য কি কোনো পরিমাণ নির্ধারিত আছে?

উত্তর: যে কোনো ফল বা ফসলের যাকাতের জন্য নিসাব হল বিশ মণ। আমাদের দেশের মণে অন্তত বিশ মণ যদি হয়, তাহলে আপনার উপর যাকাত দেয়া ফরয হয়।

প্রশ্ন-১৮৩: ফিতরা কাদের উপর ওয়াজিব?

উত্তর: যাদের মোটামুটি ফিতরা দেয়ার তাওফীক আছে, সবাই দিবেন। অত হিসাব কিতাব না। রোযার ঈদে সবাই যেন আনন্দ করতে পারে সেই জন্য যাদের সামর্থ্য আছে, যাদের ব্যাংকে অন্তত ত্রিশহাজার টাকা আছে, সবাই দেবেন। আর যে কোনো এক প্রকারের খাদ্য দ্বারা ফিতরা দিতে হয়।

প্রশ্ন-১৮৪: যাদের নিসাব পরিমাণ সম্পদ নেই তারা কি ফিতরা দেবে? এদের উপর ফিতরা ফরয, ওয়াজিব না নফল?

উত্তর: ফিতরা সাধ্যমতো দেয়ার চেষ্টা করবেন। যারা একেবারে অসচ্ছল, দেবেন না। যারা একেবারে গরীব, অধিকাংশ ফকীহের মতে তাদের ফিতরা দেয়াটা নফল।

প্রশ্ন-১৮৫: কোনো হতদরিদ্র নিজের স্ত্রীকে ফিতরা দিলে তা আদায় হবে কি না?

উত্তর: ফিতরা আদায় হবে না। হতদরিদ্র কেন ফিতরা দেবে! আর দিলেও বাইরের কাউকে দেবে। স্ত্রীকে ফিতরা দেয়া যায় না। তবে স্ত্রী তার স্বামীকে ফিতরা দিতে

পারে। এটা অনেক ফকীহের অভিমত। কারণ স্ত্রীর ভরণপোষণ স্বামীর দায়িত্বে। স্বামীর ভরণপোষণ স্ত্রীর দায়িত্বে নয়। স্ত্রী তার স্বামীকে যাকাত দিতে পারে। এটা অনেকেরই মত।

প্রশ্ন-১৮৬: কতটুকু সম্পদের মালিক হলে ফিতরা দিতে হবে?

উত্তর: ঈদের দিনে নিজের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ছাড়া যদি অন্তত পঁচিশ হাজার টাকার মতো সম্পত্তি বা নগদ টাকা থাকে তাহলে ফিতরা দিতে হবে।

প্রশ্ন-১৮৭: ফিতরার টাকা দিয়ে কোনো গরীবকে পোশাক কিনে দেয়া যাবে কি না?

উত্তর: হাদীসে খাদ্য দেয়ার কথা এসেছে। অনেক ফকীহ বলেছেন খাদ্যই দিতে হবে। টাকাও দেয়া যাবে না। অন্যান্য ফকীহ বলেছেন, খাদ্যের বদলে টাকাও দেয়া যাবে এবং টাকা দিয়ে আপনি যদি তাকে জামাকাপড় কিনে দেন, তাহলেও হবে।

প্রশ্ন-১৮৮: ছাগল মানত করে টাকা দেয়া যাবে কি না?

উত্তর: জি না। আপনার মুখ দিয়ে যদি ছাগল শব্দ বেরিয়ে থাকে, ছাগলের নিয়্যাত যদি থাকে তাহলে ছাগলই দিতে হবে। ছাগলটা অসহায় মানুষকে দিতে হবে। কোনো বড়লোক বা যিনি দেবেন তিনি এটার কোনো গোশত খেতে পারবেন না।

প্রশ্ন-১৮৯: একব্যক্তি মানত করেছিল তার ভাই সুস্থ হলে দুটো খাসি যবাই করে মুসল্লিদের খাওয়াবেন। কিন্তু তার ভাই মারা গেছে। এই অবস্থায় করণীয় কী?

উত্তর: শর্তসাপেক্ষ মানত, 'এটা হলে ওটা করব', এমন মানতে শর্ত পূরণ না হলে বিষয়টা দেয়া জরুরি নয়। অনেকে তাও দিয়ে দেয়। মনে করে আল্লাহকে বলেছিলাম, এখন যদি না দিই তাহলে কেমন হয়ে যাবে! কিন্তু আপনি যেহেতু বলছিলেন, সুস্থ হলে মুসল্লিদের খাওয়াবেন, কিন্তু তিনি সুস্থ হন নি, সুস্থ হওয়ার আগেই মারা গেছেন, এই অবস্থায় মানত দেয়া জরুরি নয়।

প্রশ্ন-১৯০: মানতের গোশতের হকদার কারা?

উত্তর: গরীবরা পাবে। এমনকি সচ্ছল মুসল্লিরাও পাবে না। মানত গরীবদের জন্য। অসহায়দের জন্য।

প্রশ্ন-১৯১: একব্যক্তি তার অসুস্থ সন্তানের সুস্থতা কামনা করে মানত করল, কিন্তু সন্তানটি মারা গেল। এক্ষেত্রে সে মানত পূর্ণ করবে কি না?

উত্তর: জি না। মানত পূরণ করা জরুরি নয়।

প্রশ্ন-১৯২: কিছুদিন আগে ঢাকার টেলিভিশন প্রোগ্রামে একজন আপনাকে প্রশ্ন করেছিল, পড়ে পাওয়া টাকা কী করতে হবে। আপনি মসজিদে দান করে দিতে বলেছিলেন। কিন্তু প্রোগ্রাম আমার এক আত্মীয় শুনে বলল যে, এই উত্তর আমার কাছে সঠিক মনে হচ্ছে না। কারণ আমি অন্য এক আলিমের কাছ থেকে শুনেছি, টাকার পরিমাণ বেশি হলে বিভিন্ন মাধ্যমে মালিকের খোঁজ করতে হবে। মালিক না পাওয়া গেলে তখন দান করতে হবে।

উত্তর: অল্প কয়েক টাকার কথা যেন বলেছিল। এখন এই টাকার যদি মালিক পাওয়া না যায়, দান করে দেয়া যেতে পারে। আর মূল নিয়ম হল, পড়ে পাওয়া জিনিসের মালিক খুঁজতে হবে। মালিক না পাওয়া গেলে, আপনি নিজে ব্যবহার করতে পারেন কিংবা দান করতে পারেন। তবে এরপরেও যদি মালিক এসে চায়, তাকে দিয়ে দিতে হবে।

সিয়াম/রোযা

প্রশ্ন-১৯৩: সাহরির সময় মসজিদের মাইকে কুরআন তিলায়াত ও গযল বলা জায়িয আছে কি না?

উত্তর: আমি ষোলো বছর ধরে সংগ্রাম করছি এই নাজায়িয কাজটা বন্ধ করার জন্য। কিন্তু মানুষ শোনে না। সাহরির সময়, ফজরের আযানের আগে ও পরে মসজিদের মাইকে গযল গাওয়া, কুরআন তিলাওয়াত করা– পুরোটাই নাজায়িয কাজ। সাহরির জন্য ডাকা জায়িয কাজ। ভালো কাজ। ডাকা মানে কী? আপনি আড়াইটার সময়, তিনটার সময়, সাড়ে তিনটার সময় পাঁচসাত মিনিট ডাকলেন। 'সাহরির সময় হয়ে গেছে, ওঠেন গো'। ব্যস, হয়ে গেল। একটানা গযল গাওয়া, মাইক বাজানো, কুরআন তিলাওয়াত করা– এটা বিভিন্ন কারণে নাজায়িয। প্রথম কারণ, মসজিদের যে মিনারা এটা শুধু আযানের জন্য। মসজিদের যে মাইক, এটা আযানের জন্য। সালাতের জন্য। দুই নাম্বার হল, এই ধরনের গান-গযল, কুরআন তিলাওয়াত মানুষকে কষ্ট দেয়। মানুষের হক নষ্ট হয়। হারামের গোনাহ হবে। আপনি ৫/৭ মিনিট ডেকেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। এতে কোনো দোষ নেই। যার ওঠার দরকার উঠবে। যে উঠবে না, সে ঘুমিয়ে যাবে। কিন্তু একটানা বাজালে অনেকে অসুস্থ আছে, বৃদ্ধ মানুষ আছে। অনেকে রোযা রাখবে না, অনেকে আছে সাহরি খেয়ে একটু ঘুমায়, ঘুমের থেকে উঠে রিকশা চালাবে। অনেকে তাহাজ্জুদের নামায পড়তে চায়। এই সবগুলো কাজে বাধা দেয়া হয় একটানা মাইক চালিয়ে। কাজেই মাঝে মাঝে ডাকা, আড়াইটার সময় একবার, সাড়ে তিনটার সময় একবার, সাহরির শেষ হওয়ার দশ মিনিট আগে একবার– এগুলো ঠিক আছে।

প্রশ্ন-১৯৪: সাহরি খাওয়ার বিশেষ কোনো দুআ আছে কি না?

উত্তর: খাদ্য গ্রহণের দুআ ব্যতীত সাহরির বিশেষ কোনো দুআ রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন বলে আমার জানা নেই।

প্রশ্ন-১৯৫: সাহরি খেতেখেতে আযান পড়ে গেলে কি মুখের খাবার ফেলে দিতে হবে?

উত্তর: জি, ফেলে দিতে হবে।

প্রশ্ন-১৯৬: সাহরিতে আযান দেয়া অবস্থায় পানি খাওয়া যাবে কি না?

উত্তর: আযান বলতে..., সুবহে সাদিক শুরু হলে আর কিছুই খাওয়া যাবে না। এখন আপনারা সবাই ঘড়ি ব্যবহার (করেন), রেডিও-টেলিভিশন আছে। পেপারে সাহরির শেষ সময় দেয়া থাকে, তো রোযার ক্যালেন্ডার বা পেপারে সাহরির শেষ সময়ের যে ওয়াক্ত দেয়া আছে, এরপর আর কিছুই খাওয়া যাবে না। রমাযানে আযান দেয়া হয় সুবহে সাদিক শুরু হওয়ার সাথে সাথে। তাই আযান হলে আর কিছুই খাবেন না।

প্রশ্ন-১৯৭: একজন ফজরের আযানের পরেও পানাহার করেছেন। ভেবেছেন, এখনো সুবহে সাদিক হয় নি। তার রোযা হবে কি না?

উত্তর: এই ভাবনার কারণটা আমাদের বোধগম্য নয়। ফজরের আযান রমাযান মাসে সুবহে সাদিকের আগে দেয়া হয় না। তিনি যদি নিশ্চিত হন, কোনো মুআজ্জিন আগেই আযান দেন, সেটা ভিন্ন কথা। দীন নিয়ে আমাদের সতর্ক হতে হবে। সচেতন হতে হবে। কেউ যদি আযানের পরে পানাহার করেন এবং পরবর্তীতে তিনি নিশ্চিত হন যে, ওই সময় সুবহে সাদিক হয়ে গিয়েছিল, তাহলে তিনি ওই রোযাটা পূর্ণ করবেন এবং পরে ওই রোযাটার কাযা আদায় করবেন।

প্রশ্ন-১৯৮: একব্যক্তি সাহরি খাওয়ার জন্য ওঠেন নি। ফজরের নামাযও পড়েন নি। তিনি সিয়াম পালন করবেন কি না?

উত্তর: সিয়ামের জন্য সুবহে সাদিকের আগেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। অর্থাৎ নিয়্যাত করতে হয়। কেউ যদি ঘুমানোর আগে এই সিদ্ধান্ত নেন যে, আগামী সুবহে সাদিক থেকে তিনি রোযা রাখবেন, তাহলে সাহরি না খাওয়ার কারণে সিয়ামের কোনো ক্ষতি হবে না। সাহরি একটা পৃথক ইবাদত। সাহরি না খেলেও তিনি সিয়াম পালন করবেন। ফজরের নামায না পড়ার কারণ বোধগম্য হল না। ফজরের নামায যদি কেউ ইচ্ছা করে কাযা করেন, তাহলে এটা কঠিন গোনাহের কাজ। তবে এমন যদি হয়, ঘুম ভাঙে নি, ইচ্ছা ছিল সাহরি খাওয়ার, ফজরের নামায সময়মতো আদায় করার, কিন্তু শারয়ি কোনো ওযরের কারণে তার ঘুম ভাঙে নি, তাহলে তিনি সিয়াম পালন করবেন, যেহেতু আগেই সিয়ামের নিয়্যাত করেছেন এবং ঘুম থেকে ওঠার পরেই ফজরের সালাত আদায় করবেন।

প্রশ্ন-১৯৯: ইফতারের ব্যাপারে কুরআনে আছে লাইল (ইফতারি রাতে করতে হবে), অথচ আমরা করি গুরুবে শামসে (সূর্যাস্তে)। কুরআনের বর্ণনা মতে আমরা যদি সূর্যাস্তের সাথেসাথে ইফতার করি তাহলে রোযা ভেঙে যাওয়ার ভয় আছে, কিন্তু একটু দেরি করে করলে, মাকরুহ হতে পারে, কিন্তু একেবারে রোযা ভেঙে তো যাবে না। কোনটা ঠিক?

উত্তর: শিয়ারা খুব ভালো করেই ধরেছে। কুরআনে আছে লাইল (রাত)। লাইল বলতে লাইলের শুরু, না লাইলের মাঝ, না লাইলের শেষ? কুরআনের এই ব্যাখ্যাটা কে দেবেন? আমি দেব? না। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ দেবেন। খুব ভালো করে বোঝেন, কুরআনের ব্যাখ্যা দেয়ার যিম্মাদারি আল্লাহ তাআলা কাকে দিয়েছিলেন? আল্লাহ কুরআনে বলেছেন:

...لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

[(হে নবী,) আপনি যেন মানুষদের জন্য ব্যাখ্যা করে দেন, যা তাদের নিকট নাযিল করা হয়েছে][১]

রাত বলতে রাতের শুরু, না রাতের অন্ধকার? আল্লাহ বলেছেন:

أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

[রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ করো][২]

প্রশ্নটা আপানদেরকে আমি বোঝাই। শিয়ারা দাবি করেন, মাগরিবের পরে অন্ধকারে ইফতার করত হবে। আর রাসূল ﷺ এর কয়েক ডজন হাদীস আছে, সূর্য ডোবার সঙ্গেসঙ্গে ইফতার করতে হবে। রাতই ঠিক, তবে রাতের যখন যাত্রা শুরু হবে, তখনই ইফতার করতে হবে।

প্রশ্ন-২০০: একজন চিকিৎসক ইফতারির সময় অপারেশন থিয়েটারে আছেন। এক্ষেত্রে তিনি কি ইফতার বিলম্বিত করতে পারবেন?

উত্তর: এ ক্ষেত্রে আমাদেরকে বুঝতে হবে, মানুষের জীবন রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদত। এর জন্য নামায নষ্ট করা যায়। একজন মানুষ পানিতে ডুবে যাচ্ছে, আগুনে পুড়ে যাচ্ছে– আমরা নামায ভেঙে দিয়ে তাকে উদ্ধার করে এরপর নামায পড়ব। তবে চিকিৎসক যদি জানেন, অপারেশন করতে অনেক সময় লাগবে, ইফতারির সময় এসে যাবে, তাহলে তিনি ইফতারি করার মতো কিছু সাথে রাখতে পারেন। ইফতারি মানে কিন্তু পূর্ণ খাদ্য গ্রহণ করা নয়, পেট ভরে খাওয়া নয়। সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি ছোট্ট এক টুকরো খাবার খেয়ে নিয়েছেন, আপনার সুন্নাত আদায় হয়ে গিয়েছে। বাকি খাদ্য আপনি পরে খাবেন। কাজেই কোনো চিকিৎসক যদি জানেন, অপারেশন করতে দীর্ঘ সময় লাগবে, ইফতারির সময় এসে যাবে, তিনি এমন খাবার সাথে রাখবেন, যেটা চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। অর্থাৎ যে খাবার অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেলে জীবানুমুক্ত রাখা যায়, এমন খাবার অল্প পরিমাণে তিনি রাখবেন। আযান হলে সেই খাবার অল্প

---

[১] সূরা: [১৬] নাহল, আয়াত: ৪৪।

[২] সূরা: [২] বাকারা, আয়াত: ১৮৭।

একটু মুখে দিলেন। সেটা এক ঢোক পানিও হতে পারে। এরপর বাকি অপারেশন শেষ করে তিনি পূর্ণ ইফতার করলেন। এতে করে তার ইবাদতের পূর্ণতা অর্জিত হবে। আর যদি এমন হয়, তিনি জানতেন না যে, বেশি বিলম্বিত হবে, কিন্তু অপারেশন করতে সময় লাগছে, তাহলে প্রয়োজনে তিনি একটু বিলম্বে ইফতার করতে পারেন।

প্রশ্ন-২০১: ধনী আত্মীয় এবং অসহায়দের ইফতার করানোর সাওয়াব কি একই রকম হবে?

উত্তর: আসলে ইফতার করানো একটা ইবাদত। এখানে ধনী-দরিদ্র বড় কথা নয়। দরিদ্রদের সাহায্য করা একটা ভিন্ন ইবাদত, আবার আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখাটাও একটা ভিন্ন ইবাদত। কাজেই যিনি ইফতার করাবেন, তিনি ইফতার করানোর সাওয়াব পাবেন। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ উৎসাহ দিয়েছেন– তোমার খাদ্য যেন নেককার মুত্তাকি লোকে ভক্ষণ করে।[৩] আত্মীয়-স্বজনকে ইফতার করানোর ভেতর দুটো ইবাদত। একটা আত্মীয়তার হক আদায় করা, আরেকটা ইফতার করানো। মুত্তাকি ব্যক্তিকে খাওয়ানো একটা ইবাদত, ইফতার করানো আরেকটা ইবাদত। অসহায় মানুষদেরকে সাহায্য করা একটা ইবাদত, তাদেরকে ইফতার করানো আরেকটা ইবাদত। প্রতিটি ইবাদতের ভেতর বিভিন্ন দিক রয়েছে। আপনি আত্মীয়দের অবশ্যই ইফতার করাবেন। এবং এই ইফতার করানোর ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকতা, অপচয়ের চাইতে ইবাদতের চেতনা বেশি থাকতে হবে। পাশাপাশি আত্মীয়দের ভেতর যারা দরিদ্র রয়েছেন, তাদের দিকে লক্ষ রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে পানাহারের অনুষ্ঠানে ধনীদের দাওয়াত দেয়া হয়, গরীবদের বাদ দেয়া হয়, এরচে' নিকৃষ্ট অনুষ্ঠান আর হতে পারে না।[৪] কাজেই, আত্মীয়দের ভেতর দাওয়াত দিতে গিয়ে ধনী-দরিদ্র কোনো রকম বাছবিচার করা যাবে না। পাশাপাশি দরিদ্রদের সাহায্য করতে গিয়ে আমাদেরকে পৃথকভাবে সচেতন থাকতে হবে।

প্রশ্ন-২০২: সূর্যাস্তের সঙ্গেসঙ্গে ইফতার করা নাকি কিছুটা বিলম্ব করা উত্তম?

উত্তর: সূর্যাস্তের সঙ্গেসঙ্গে ইফতার করা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আচরিত এবং নির্দেশিত সুন্নাত। এখানে আরেকটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হল, আমরা যেন আমাদের মনের ভালোলাগা অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদত না করি। কোনো ইবাদতকে একটু শক্তিশালী

---

[৩] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৮৩২; সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-২৩৯৫; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-১১৩৩৭; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস নং-৫৫৪।

[৪] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-৫১৭৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৪৩২; সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-৩৭৪২; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং-১৯১৩।

করার জন্য বাড়িয়ে করা যাবে না। এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন। সূর্য অস্ত গিয়েছে, এরপর আরেকটু বিলম্ব করা এই ভেবে যে, এতে রোযা আরেকটু মযবুত হবে, এই চিন্তা যেন আমাদের ভেতর না আসে। আমি আল্লাহর হুকুম পালন করব তাঁর নির্দেশ অনুসারে, নিজেদের মনগড়াভাবে নয়।

প্রশ্ন-২০৩: ইফতার দ্রুত করা সুন্নাত কি না– জানতে চাই।

উত্তর: রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আচরিত এবং নির্দেশিত সুন্নাত হল, সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করতে হবে। বিলম্ব করা যাবে না।

প্রশ্ন-২০৪: রোযাদারকে ইফতার করালে তার প্রতিদানে কী পাওয়া যাবে?

উত্তর: রাসূলুল্লাহ ﷺ ইফতার করাতে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন হাদীসে বলেছেন, যদি কেউ রোযাদারকে ইফতার করায়, ওই ব্যক্তি সারাদিন রোযা রেখে যে সাওয়াব পেল, ওই পরিমাণ সাওয়াব যিনি ইফতার করালেন তিনি পাবেন। তবে এই কারণে রোযাদারের সাওয়াব কমবে না।[৫] আমরা অনেক সময় মনে করি, কারো কাছে ইফতার করলে তাকে সাওয়াবটা দেয়া হয়ে গেল, আমার সাওয়াব বোধহয় কম পড়ে গেল– এটা ভুল ধারণা। আল্লাহর রাসূল ﷺ বারবার উল্লেখ করেছেন, রোযাদারের সাওয়াব কমবে না। তিনি তার পূর্ণ সাওয়াব লাভ করবেন। তবে যিনি তাকে ইফতার করাবেন, তিনি তার সাওয়াবের পরিমাণ বোনাস লাভ করবেন। কাজেই, সাহাবায়ে কিরামের সুন্নাত থেকে আমরা দেখি, তারা নিজের ইফতার অন্যকে দিতেন, অন্যের ইফতার নিজে নিতেন। যদি অনেক মানুষকে ইফতার কারানোর সুযোগ আমাদের না থাকে, তাহলে আমরা অন্তত সাহাবিদের এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারি। তাহলে আমি দুজন রোযাদারের সাওয়াব পেয়ে যাব, তিনিও দুজন রোযাদারের সাওয়াব পেয়ে যাবেন।

প্রশ্ন-২০৫: ইফতারের সময় কোন দুআ পড়া সুন্নাত?

উত্তর: রাসূলুল্লাহ ﷺ ইফতারের সময় বলতেন:

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ

(অর্থ) পিপাসা চলে গেল, দেহের শিরা-উপশিরাগুলো পানি পেল, আর্দ্র হল এবং আল্লাহ তাআলার মর্যিতে সাওয়াব অর্জিত হয়ে গেল।[৬]

---

[৫] সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-৮০৭; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং-১৭৪৬; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-১৭০৩৩; মুসনাদ বাযযার, হাদীস নং-৩৭৭৫।

[৬] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-২৩৫৭; মুসনাদ বাযযার, হাদীস নং-৫৩৯৫; সুনান দারাকুতনি,

অন্য হাদীসে এসেছে, কোনো কোনো সাহাবি ইফতারের সময় দুআ করতেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي

(অর্থ) হে আল্লাহ, আপনার সর্বব্যাপী রহমত, যে রহমত সবকিছুকে ঘিরে নিয়েছে, সেই রহমতের ওসীলায় আমি আপনার কাছে দুআ চাচ্ছি– আপনি আমরা গোনাহগুলোকে মাফ করে দিন।[৭]

বিভিন্ন দুর্বল সনদের বর্ণনায় এসেছে:

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

(অর্থ) হে আল্লাহ, আপনার জন্যই সিয়াম পালন করেছি এবং আপনার রিযিক দিয়েই আমি ইফতার করছি।[৮]

প্রশ্ন-২০৬: আমি একটি কোম্পানিতে চাকরি করি। কোম্পানিটি প্রায়ই ইফতার পার্টির আয়োজন করে। সেখানে ইফতার প্যাকেট করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে একজন অমুসলিমকে। তিনি নিজে হাতে শরবত গুলিয়ে পরিবেশন করেন। এই ইফতার করা যাবে কি না?

উত্তর: জি, ইফতার করা যাবে। তবে মুসলিমদেরই করা উচিত। মুসলিমদের হালাল দ্রব্য কোনো অমুসলিম, যিনি কর্মচারী, কাজ করে বেতন নেন, তিনি মিশ্রণ করলে দ্রবটি হারাম হবে না। তবে এগুলো মুসলিমদের করা উচিত।

প্রশ্ন-২০৭: এক হুযুরকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার মাদরাসায় ছাত্র কত জন? হুযুর বললেন ষাটজন? আমি পঁয়ষট্টি জনের ইফতার পাঠালাম। ইফতার করল আটত্রিশ জন। আমার ইফতার করানোর ফযীলত কতটুকু আদায় হল?

উত্তর: আপনি যে নিয়্যাতে দিয়েছেন সেই নিয়্যাতের ফযীলত পাবেন। এখানে আপনার নিয়্যাতটাই আসল। নিয়্যাত মানে কিন্তু 'নাওয়াইতু আন...' নয়। নিয়্যাত মানে মনের ইচ্ছা। আপনাদের দুটো হাদীস বলি। প্রথম হাদীস, এটা বুখারি, মুসলিমের হাদীস। নাসায়িতেও আছে। একজন নিয়্যাত করল: لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ আজকে রাত্রে আমি সাদকাহ করব। রাতে গোপনে দান করেছে। সকালে জানা গেল, যাকে দান করা হয়েছে সে জিনকারিণী। লোকজন বলাবলি করতে লাগল–

হাদীস নং-২২৭৯; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস নং-১৫৩৬।

[৭] সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং-১৭৫৩; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, হাদীস নং-৩৬২১।

[৮] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-২৩৫৮; মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস নং-৯৭৪৪; বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ, হাদীস নং-১৭৪১।

অমুক এক জিনাকারিণীকে টাকা দান করেছে। সে মনে মনে বলল, আল্লাহ আমি তো ভালো নিয়্যাতই করেছিলাম। যাই হোক, আজকে আবার দান করব। রাতে গোপনে দান করেছে। অন্ধকারে বুঝতে পারে নি। সকালে জানা গেল, যাকে দান করা হয়েছে, সে একজন চোর। দিনের বেলা লোকজন বলাবলি করতে লাগল– হায়! চোরকে দান করেছে! তৃতীয় রাতে দান করেছে এক বড়লোককে। পরে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাকে জানানো হল, তোমার দান আল্লাহ কবুল করেছেন। কারণ তুমি তো নিয়্যাত সহীহ করেই দিয়েছ।[৯] আরেক হাদীসে এসেছে, এক ধনী বাবা, কিছু সাদকাহ করবে, মসজিদে একজনের কাছে টাকাটা দিয়ে বলল যে, টাকাটা রেখে গেলাম, কোনো গরীব মানুষ পেলে দিয়ে দিও। তো ঘটনাক্রমে তখন মসজিদে আসল ওই ধনীর ছেলে। তাকে বলা হল, তোমার কি টাকার প্রয়োজন আছে? বলল, হ্যাঁ আছে। সে টাকা নিয়ে চলে গেল। পরে জানাজানি হল, ছেলে বাপের টাকা নিয়েছে। বাবা ছেলের কলার ধরেছে– আমি তোকে টাকা দেব না। আমি তো গরীবের দেয়ার জন্য রেখে আসছিলাম। তুই নিছিস ক্যান! ছেলে বলে, আমি নিছি তাই কী হয়েছে! মসজিদের লোক আমাকে দিয়ে দিয়েছে, আমি নিয়েছি। তখন দুইজন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বাপকে বললেন, তুমি যে নিয়্যাত করেছ, তোমার নিয়্যাত কবুল হয়ে গেছে। আর ছেলেকে বললেন, তুমি যেহেতু নিয়ে নিয়েছ, তাই এই টাকা তোমার।[১০] তো এখন বিষয় হল, আপনি যদি পঁয়ষট্টি জনের নিয়্যাতে দেন, না জেনে দেন, আপনার পূর্ণ সাওয়াব হবে। গোনাহর দায়ভার অবশ্যই হুযুরের উপর পড়বে। মিথ্যা বলার গোনাহ হবে। অপচয়ের গোনাহ হবে। ধোঁকা দেয়ার গোনাহ হবে। কিন্তু আপনি পূর্ণ সাওয়াব পেয়ে যাবেন। আর আপনি যদি জানেন তারা এমনই করে, তাহলে দেবেন না।

প্রশ্ন-২০৮: হিন্দুর বাড়িতে ইফতার করা জায়িয কি না?

উত্তর: হিন্দুর বাড়িতে দাওয়াত খাওয়া, বিয়ের দাওয়াত খাওয়া– এগুলো জায়িয। কিন্তু ইবাদত বন্দেগি করা ঠিক নয়। ইফতারি তারা কেনই বা দেবেন! যেমন হিন্দুকে এনে মসজিদে নামায পড়ানো, মুসলিমকে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে পূজা করানো– এগুলো ঠিক নয়। আমরা যদি দুর্গাপূজার সময় পূজা উপলক্ষে তাদের প্রতিমা বানিয়ে দিই, আমাদের ঈমান চলে যাবে। তারা তাদের ইবাদত করবে আমরা আমাদের ইবাদত করব। সামাজিকতা হবে একসাথে।

[৯] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-১৪২১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১০২২; সুনান নাসায়ি, হাদীস নং-২৫২৩; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-৮২৮২।

[১০] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-১৪২২; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-১৫৮৬০।

প্রশ্ন-২০৯: মাগরিবের আযানের সময় কোন কাজের গুরুত্ব বেশি, ইফতার করা, নাকি আযানের জবাব দেয়া?

উত্তর: এই দুটোর ভেতর তো কোনো বৈপরীত্য বা সংঘর্ষ দেখছি না। আযানের শুরুতে আপনি একটা খেজুর খেয়ে নিবেন। এরপর আপনি ইচ্ছা করলে একদম চুপ করে বসে থেকে, পানাহার বন্ধ রেখে আযানের জবাব দিতে পারেন। দ্রুত ইফতার করার অর্থ আপনি রোযাটা আযানের শুরুতেই শেষ করবেন। এরপর আপনি খাওয়া বন্ধ রেখে আযানের জবাব দিতে পারেন। এটাকে ইফতার বিলম্ব করা বলা হবে না। দ্রুত ইফতার করার সুন্নাত আপনার পালন হয়ে যাবে। তবে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, আযানের জবাব দেয়ার জন্য পানাহার বর্জন করা জরুরি নয়। পানাহারের ভেতরেও আযানের জবাব দেয়া যায়। জবাব দেয়াটা মুসতাহাব। দিলে আমরা সাওয়াব পাব। না দিলে গোনাহ নেই। কাজেই কেউ যদি চান, ইফতারের ফাঁকে ফাঁকে আযানের জবাব দিবেন, দিতে পারেন। কেউ যদি চান ইফতার কিছু গ্রহণ করে পানাহার অফ রেখে আযানের জবাব শেষ করে, আযানের শেষের দুআ পাঠ করার পর তিনি বাকি ইফতার শেষ করবেন, সেটাও তিনি পারেন।

প্রশ্ন-২১০: কোনো বাচ্চা যদি ভুল করে খেয়ে ফেলে, তাহলে কি তার রোযা ভেঙে যাবে?

উত্তর: ভুল করে শুধু বাচ্চা নয়, বাচ্চার বাপ খেলেও রোযা ভাঙে না। কথা বুঝেছেন? বাচ্চা তো দূরের কথা, বাচ্চার বাপও যদি ভুল করে খায়, অর্থাৎ রোযার কথা মনে নেই, অভ্যাসবশত খেয়ে ফেলেছে, তাহলেও রোযা ভাঙবে না। আর বাচ্চারা তো একদিনে তিনটে রোযার রাখতে পারে। ওদেরকে অভ্যাস করাবেন। বাড়াবাড়ি করবেন না।

প্রশ্ন-২১১: রোযা রেখে কুলি করা যাবে কি না? কুলি করার পর দুই-তিনবার থুতু ফেলার পরেও গলার ভেতর ভেজাভেজা অনুভূতি হয়। এতে রোযার কোনো ক্ষতি হবে কি না?

উত্তর: রোযা রেখে কুলি করা যাবে। কোনো দোষ নেই। দু'তিনবার থুতু ফেলার পরে গলার ভেতর যে আর্দ্রতা থাকে, ওটাতে কোনো দোষ নেই। ওটা আর পানি না। ওটা লালা হয়ে গেছে।

প্রশ্ন-২১২: অনেকে বলে তারাবীহ না পড়লে রোযা হবে না– কথাটা কতটুকু সঠিক?

উত্তর: এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা। এটা যারা বলে, তারা জেনে অথবা না জেনে

ইসলামের বিরুদ্ধে বলে। রোযা একটা ইবাদত। তারাবীহ আরেকটা ইবাদত। রোযা ফরয ইবাদত, তারাবীহ সুন্নাত ইবাদত। তারাবীহ না পড়লে রোযার কোনো ক্ষতি হবে না। আবার কেউ রোযা রাখতে পারছে না, তারা তারাবীহ পড়তে পারে। তার তারাবীহর কোনো ক্ষতি হবে না। তবে তারাবীহ না পড়ার কারণে একটা সুন্নাত তরক করার কারণে তার কিছু গোনাহ হতে পারে। আর না পড়ার অর্থ একেবারে না পড়া। যদি সে ঘরে পড়ে, তার তারাবীহ আদায় হয়ে যাবে।

প্রশ্ন-২১৩: দাঁত ব্রাশ করলে রোযার কোনো ক্ষতি হয় কি না?

উত্তর: পেস্ট দিয়ে দাঁত ব্রাশ করলে রোযা মাকরুহ হয়, এটা অনেক ফকীহ বলেছেন। দিনের বেলা মিসওয়াক ব্যবহার করবেন। পেস্ট ব্যবহার না করাই ভালো।

প্রশ্ন-২১৪: রোযা অবস্থায় যদি উত্তেজিত হয়ে বীর্যপাত হয় তাহলে রোযা ভাঙে কি না?

উত্তর: অনিচ্ছাকৃত বের হলে রোযা ভাঙে না।

প্রশ্ন-২১৫: আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণিত, একজন রোযাদার যদি গীবত করে, তাহলে তার রোযা ভেঙে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়। এটা একটু বুঝিয়ে বলুন।

উত্তর: গীবত করা মানে মরা ভাইয়ের গোশত খাওয়া। গরু জবাই করে গোশত খেলে যদি রোযা ভাঙে, মরা ভাইয়ের গোশত খেলে ভাঙবে না কেন! তবে এই খাওয়াটা যেহেতু রুহানি খাওয়া, রোযা রুহানিভাবে ভেঙে যায়। অর্থাৎ সাওয়াবটা একদম শেষ হয়ে যায়। তবে ওই রোযার কাযা করা লাগবে না। রোযা রেখে গীবত করার চেয়ে ভয়ঙ্কর কাজ আর নেই।

প্রশ্ন-২১৬: রোযা রেখে কোনো ছেলে যদি কোনো মেয়ের সাথে ফোনে স্বাভাবিক কথা বলে, তাহলে কি রোযা হবে? এভাবে নিয়মিত কথা বলা কি কবীরা গোনাহ?

উত্তর: জি, এভাবে কথা বলা কবীরা গোনাহ। রোযা হয়ে যাবে। তবে রোযা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। গোনাহ হবে। রোযা থেকে গোনাহ করা হল। কিশোরদের জন্য, যুবকদের জন্য এটা একটা বড় ফিতনা-পরীক্ষা। বাঁচার উপায় হল, নিজের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে হবে। ভালো বন্ধুদের সাথে থাকতে হবে। তাকওয়া তৈরি হয়, এমন মানুষের সোহবতে বেশি থাকার চেষ্টা করতে হবে। নেশা কেটে যাবে। আর এটা কন্টিনিউ করা হলে, ঝাল লেগেছে, পানি খাওয়া হচ্ছে, যতক্ষণ গালে পানি আছে মজা লাগছে। তারপর আবার ঝাল। বান্ধবীর সাথে গল্প করাটা এমন।

মজা লাগছে কিন্তু কোনো লাভ নেই। এর দ্বারা কষ্ট বাড়ছে।

প্রশ্ন-২১৭: রোযা রেখে ওযুর সময় যখন কুলি করি, তখন থুথু ফেলার নিয়ম কী? দুইবার থুথু ফেলার পরেও পানি মুখে আছে কি না সন্দেহ থেকে যায়। এই অবস্থায় কী করব?

উত্তর: কোনো সমস্যা নেই। এই ওয়াসওয়াসাটা বাদ দিতে হবে। পানি মুখে নিয়ে কুলি করা হয়ে গেছে, ব্যস, ওটুকুই যথেষ্ট। লালার সাথে যদি কিছু পানি যায়, ওটা নিয়ে টেনশন করা লাগবে না। ইবাদত সাধ্যের মধ্যে করতে হবে। পানি গিললে রোযা ভেঙে যায়। কিন্তু থুথুর সাথে যে পানি থাকে ওটা পানি না, লালা। ওটা খেলে রোযা ভাঙে না।

প্রশ্ন-২১৮: রোযা রেখে ওযুর সময় নাকে টানা পানি যদি গলায় চলে যায় তাহলে কি রোযা ভেঙে যাবে?

উত্তর: রোযা ভেঙে যাবে। রোযা রেখে নাকের পানি টানতে হয় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

তুমি ভালো করে নাকের ভেতর পানি টেনে পরিষ্কার করবে, তবে রোযা অবস্থায় নয়।[১১]

প্রশ্ন-২১৯: রোযা রেখে ধূমপান করা যাবে কি না?

উত্তর: ধোঁয়া অনেক রকম আছে। অনেক ধোঁয়া অনিচ্ছাকৃতভাবে আমাদের গলায় ঢুকে পেটে চলে যায়। এটা পানাহার নয়। কিন্তু কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে নাক বা মুখ দিয়ে গভীরভাবে টেনে আহারের মতো করে দেহের ভেতর প্রবেশ করায়, এটা অবশ্যই রোযা ভঙ্গ করবে। এ জন্য ধূমপানের মাধ্যমে রোযা ভঙ্গ হবে– এ ব্যাপারে গবেষক আলিমদের ভেতর কোনো মতভেদ নেই। ধূমপান রাসূল ﷺ এর যুগে ছিল না। কাজেই এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা হাদীসে নেই। প্রায় হাজার বছর পরে ধূমপানের উদ্ভব হয়েছে। প্রথমদিকে আলিমগণ কিছু মতভেদ করেছেন। কেউ স্বাভাবিক বৈধ কাজ বলেছেন। কেউ কেউ দুর্গন্ধ ইত্যাদির দিকে লক্ষ রেখে মাকরুহ বলেছেন। কিন্তু সময়ের আবর্তনে ধূমপানের অপকারিতাগুলো যখন স্পষ্ট হয়েছে,

---

[১১] মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-১৬৩৮০; সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-১৪২; সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-৭৮৮; সুনান নাসায়ি, হাদীস নং-৮৭; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস, নং-৪০৭; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস নং-১৫০; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস নং-১০৮৭।

বিশ্বের প্রসিদ্ধ প্রায় সকল আলিম এটাকে হারাম বলেছেন। এটা একটা পাপ। বড় গোনাহের কাজ। পাশাপাশি এটা যেহেতু ইচ্ছা করে পান করা হয়, পানীয়র মতো দেহের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়, তাই এর মাধ্যমে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন-২২০: দাঁতের ভেতর আটকে থাকা খাবার গলায় প্রবেশ করলে রোযা ভঙ্গ হবে কি না?

উত্তর: একেবারেই ক্ষুদ্র খাদ্যকণা, যেটা বোঝাই যায় না– এই ধরনের খাদ্য পেটে চলে গেলে রোযা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু যে খাদ্যকণা বড়, বোঝা যায়, যেটা আমার জন্য ঠেকানো সম্ভব ছিল, এগুলো গিলে ফেললে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।

প্রশ্ন-২২১: অনেকে বলে, 'কেউ যদি নামায না পড়ে তাহলে তার রোযা হবে না'– কথাটা কতটুকু সঠিক?

উত্তর: এখানে দুটো বিষয় আমাদের বুঝতে হবে। প্রথম বিষয় হল, রোযা রাখি কিন্তু নামায পড়ি না, এটা কেন হয়? ১৪/১৫ ঘণ্টা না খেয়ে থাকছি, প্রচণ্ড কষ্ট করে আমরা একটা ইবাদত করি। অথচ দশ থেকে পাঁচ মিনিটের ভেতরে আমরা ফরয নামাযটা পড়ে নিতে পারি। কিন্তু এটা করছি না। এটা মুমিনের কোন চেতনা থেকে আসতে পারে? আমাদের বুঝতে হবে, রোযার চেয়ে নামায অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। নামায যিনি ইচ্ছা করে আদায় করেন না, কুরআনে এবং হাদীসে তাকে কাফির বলা হয়েছে। কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সাহাবাগণ মুমিনকে কোনো পাপের কারণে কাফির মনে করতেন না। কিন্তু নামায ত্যাগকারীকে তাঁরা কাফির মনে করতেন। দ্বিতীয় বিষয় হল, আমরা রোযা রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট আছি। অথচ এর ভেতরে নামায ত্যাগ করার মতো মহাপাপ করছি। এটা আমাদের দ্বারা কেন হবে! এর পাশাপাশি আমাদের বুঝতে হবে, একজন ব্যক্তি রোযা রেখেছেন, কিন্তু নামাযের গুরুত্ব তিনি বুঝতে পারেন নি, অভ্যাসবশত নামায ত্যাগ করেছেন, সেক্ষেত্রে তাকে যদি আমরা মুমিন হিসেবে গণ্য করি তাহলে বাহ্যিকভাবে তার রোযা হয়ে যাবে। কিন্তু নামায তরক করার কারণে তিনি পাপী হবেন। এবং এই রোযাটা পরে আর তাকে কাযা করতে হবে না। তবে সবসময় এটা মনে রাখতে হবে, অধিকাংশ ইসলামিক পণ্ডিত ইচ্ছাকৃত নামায পরিত্যাগকারীকে অমুসলিম বলেই গণ্য করেছেন।

প্রশ্ন-২২২: রোযা রেখে সিনেমা অথবা খেলা দেখলে রোযা নষ্ট হবে কি না?

উত্তর: রোযা নষ্ট হওয়ার দুটো দিক রয়েছে। এক ধরনের নষ্ট হওয়া আছে, যার ফলে রোযা কাযা করতে হয় অথবা কাফফারা দিতে হয়। একটা রোযার বদলে

একটা রোযা রাখতে হয় অথবা একটা রোযার বদলে ষাটটা রোযা রাখতে হয়। আরেকটা দিক হল, রোযার সাওয়াব নষ্ট হয়ে যাওয়া। এক্ষেত্রে রোযা কাযা করতে হয় না। পানাহার এবং দাম্পত্য সম্পর্কে কারণে রোযা ভেঙে গেলে, এর কাযা অথবা কাফফারা দিতে হয়। আর যদি রোযা রেখে সারাদিন সিনেমা দেখা হয়, খেলা দেখা হয়, এগুলো বড় পাপ। রোযা রেখে এই পাপগুলো করার কারণে আমাদের রোযার বরকত নষ্ট হয়ে যায়। এই রোযার মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করা সম্ভব হয় না। তবে এর কারণে রোযার বাহ্যিক ইবাদতের দিকটা নষ্ট হয় না। এই রোযার কাযা করতে হয় না।

প্রশ্ন-২২৩: কোন রক্তের কারণে রোযা ভঙ্গ হয়?

উত্তর: নারীদের নিয়মিত যে অসুস্থতা এবং সন্তান প্রসবকালীন যে রক্তপাত, এর মাধ্যমে রোযা নষ্ট হয়ে যায়। এবং এই অবস্থায় নারীরা রোযা পালন করবেন না। পরবর্তীতে কাযা করবেন। এর বাইরে শরীর থেকে কেটে গিয়ে রক্ত বের হলে, অপারেশন ইত্যাদির মাধ্যমে রক্ত বের হলে রোযা ভাঙবে না।

প্রশ্ন-২২৪: সঙ্গম ব্যতীত স্বামী-স্ত্রীর বাহ্যিক নৈকট্যের মাধ্যমে রোযা ভাঙবে কি না?

উত্তর: রোযা ভাঙবে না। তবে রোযা রেখে এগুলোও বর্জন করা উচিত। কারণ এগুলো আমাদেরকে রোযা নষ্টের দিকে ধাবিত করতে পারে। তার ফলে কিন্তু আমাদের উপর কাফফারা ওয়াজিব হয়ে যাবে। অর্থাৎ একটা রোযার পরিবর্তে ষাটটা রোযা রাখতে হবে।

প্রশ্ন-২২৫: বমি হলে রোযা নষ্ট হয় কি না?

উত্তর: অনিচ্ছাকৃত বমির দ্বারা রোযা নষ্ট হয় না। ইচ্ছাকৃত বমি করলে রোযা নষ্ট হয়ে যায়।

প্রশ্ন-২২৬: স্বপ্নদোষ হলে রোযা নষ্ট হবে কি না?

উত্তর: নষ্ট হয় না। কারণ এতে মানুষের ইচ্ছার কোনো হাত নেই।

প্রশ্ন-২২৭: রোযা রেখে ইনজেকশন নেয়া যাবে কি না?

উত্তর: ইনজেকশনের কারণে রোযা নষ্ট হয় না। চাই সেই ইনজেকশনটা মাংসে, পেশিতে, শিরায় দেয় হোক না কেন। শুধুমাত্র যে ইনজেকশন আমাদের পানাহারের পরিবর্তে দেয়া হয়, যার মাধ্যমে আমাদের পুষ্টি গঠন করা হয়, এর মাধ্যমে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে বলে অনেক ফকীহ মত প্রকাশ করেছেন। স্বাভাবিক ইনজেকশনের

মাধ্যমে দেহে কিছু প্রবেশ করানো হলে রোযা ভাঙবে না।

প্রশ্ন-২২৮: কৃত্রিম অক্সিজেন নিলে রোযা নষ্ট হবে কি না?

উত্তর: জি না। এটা পানাহারের বিষয় নয়। এতে রোযা নষ্ট হবে না। আর অক্সিজেন আমাদের পাকস্থলিতে যায় না। এটা আমাদের ফুসফুসে প্রবেশ করে। কাজেই এর মাধ্যমে রোযা নষ্ট হবে না।

প্রশ্ন-২২৯: রোযা রেখে লিপস্টিক ব্যবহার করলে রোযা ভাঙবে কি না?

উত্তর: জি না। এটা পানাহারের বিষয় নয়। এর দ্বারা রোযা ভাঙবে না।

প্রশ্ন-২৩০: রোযা রেখে কানে-নাকে ওষুধ লাগানো, ড্রপ ব্যবহার করা, অথবা ক্ষতস্থানে মলম লাগানো যাবে কি না?

উত্তর: এতে রোযার কোনো ক্ষতি হবে না।

প্রশ্ন-২৩১: রোযা রেখে আলট্রাসনোগ্রাম করা যাবে কি না?

উত্তর: আলট্রাসনোগ্রাম করলে, দেহের কোনো অংশে এক্স-রে করলে, যে কোনো ধরনের শারীরিক পরীক্ষা করা হলে– এতে রোযা নষ্ট হবে না। রোযা নষ্ট হয় পানাহারের কারণে। তাই যে বিষয়গুলো পানাহার বলে গণ্য নয়, সেগুলোর দ্বারা রোযা নষ্ট হবে না।

প্রশ্ন-২৩২: একজন রোযা রেখে শিশুর ঠোঁটে চুমু দিয়েছে। শিশুর মুখের লালা সে গিলে ফেলেছে কি না সে নিশ্চিত নয়। তার রোযা ভেঙে গেছে কি না জানতে চাই।

উত্তর: অনিশ্চয়তার কারণে রোযা নষ্ট হয় না। তবে রোযা রেখে চুমু দেয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক হতে হবে।

প্রশ্ন-২৩৩: রোযা রেখে নাক দিয়ে রক্ত বের হলে রোযা নষ্ট হবে কি না?

উত্তর: জি না। রোযা নষ্ট হবে না।

প্রশ্ন-২৩৪: রোযা রেখে ছাত্রদের সাথে চিল্লাচিল্লি করা, ছাত্রদেরকে মারধোর করা– এতে রোযার ক্ষতি হবে কি না?

উত্তর: জি না। ক্ষতি হবে না।

প্রশ্ন-২৩৫: রোযা রেখে মিথ্যা কথা বললে রোযা হবে কি না?

উত্তর: এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

যে ব্যক্তি রোযা রেখে মিথ্যা কথা, মিথ্যা কাজ পত্যিাগ করতে পারল না, তার পানাহার পরিত্যাগের কোনো প্রয়োজন আল্লাহর কাছে নেই।[১২] কাজেই মিথ্যা বলা মহাপাপ। রোযা রাখা আল্লাহর ফরয হুকুম। রোযার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর ফরয হুকুম পালন করি, ক্ষুধা-পিপাসায় কষ্ট করি, কিন্তু আল্লাহর অন্য হারাম যদি আমরা বর্জন করতে না পারি, তাহলে কিন্তু আমরা রোযার মূল বরকত, সাওয়াব অর্জন করতে পারব না।

প্রশ্ন-২৩৬: রোযা রেখে রান্না করা যাবে কি না?

উত্তর: রোযা রেখে রান্না করাতে কোনো নিষেধ নেই। রান্নার ধোঁয়া, রান্নার ঘ্রাণ– এগুলো আমাদের নাক দিয়ে ফুসফুসে ঢুকলেও কোনো সমস্যা নেই। রান্না করা আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার একটা অংশ। কাজেই নারী-পুরুষ সবাই রোযা রেখে রান্না করতে পারবেন। এতে রোযার কোনোই ক্ষতি হবে না। এমনকি প্রয়োজনে তরকারির স্বাদ চাখার জন্য জিহ্বার উপর খাবার নিয়ে ফেলে দেয়া– এটাও ফকীহগণ বৈধ বলেছেন।

প্রশ্ন-২৩৭: রোযা রেখে মিসওয়াক করা যাবে কি না?

উত্তর: রাসূলুল্লাহ ﷺ সিয়াম অবস্থায় মিসওয়াক করতেন, মিসওয়াক করতে উৎসাহ দিয়েছেন; সকালে, বিকালে, ইফতারের আগ দিয়ে, সকল সময়ে। কাঁচা ডাল দিয়ে মিসওয়াক করা, শুকনো ডাল দিয়ে মিসওয়াক করা– সবই সুন্নাহ নির্দেশিত। তবে মিসওয়াকের কোনো টুকরো যেন পেটে না যায় এদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

প্রশ্ন-২৩৮: রোযা রেখে চুল, হাতের নখ কাটা যাবে কি না?

উত্তর: শুধু হাতের নখ নয়, হাত কেটে ফেললেও রোযা ভাঙবে না।

প্রশ্ন-২৩৯: রোযা রেখে নিমের ডাল দিয়ে মিসওয়াক করা যাবে কি না?

উত্তর: যাবে। কাঁচা কিংবা শুকনো উভয় ডাল দিয়ে করা যাবে।

প্রশ্ন-২৪০: রমাযানে কুরআন খতম করা কি মুসতাহাব?

---

[১২] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-১৯০৩; সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-২৩৬২; সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-৭০৭; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং-১৬৮৯।

উত্তর: জি, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমাযানে জিবরীল আ.কে কুরআন শোনাতেন। তার অনেকগুলো সুন্নাতের একটা হল, তিনি রমাযানে কুরআন বারবার শোনাতেন।[১৩] সাহাবাগণ দিনের বেলা কুরআন পড়তেন, রাত্রিতে পুরো রমাযানে কয়েকবার কুরআন খতম করতেন। এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত।

প্রশ্ন-২৪১: রমাযান মাসে দিনের বেলা কুরআন তিলাওয়াত করা এবং নফল নামায– এই দুটোর কোনটা উত্তম?

উত্তর: নফল নামাযে আমরা কুরআনই তিলাওয়াত করি। কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া নফল নামায আদায় করা যায় না। তবে যাদের পূর্ণ কুরআন মুখস্ত আছে, যারা হাফিয, তারা নামাযের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে। বরং নামাযের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত করা, খতম করা এটা আরো বেশি কল্যাণকর। পাশাপাশি কুরআন দেখে দেখে পড়া একটা ভিন্ন ইবাদত। প্রত্যেক ইবাদতে নিজস্ব মজা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ রমাযান মাসে জিবরীলকে কুরআন শোনাতেন। যারা কুরআনের হাফিয নন, তারা অবশ্যই নামাযের বাইরে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াতের চেষ্টা করবেন।

প্রশ্ন-২৪২: রোযাদারের কোন সময়ের দুআ আল্লাহ কবুল করেন?

উত্তর: রোযা অবস্থায় সকল সময়ই দুআ করা যায়। এই বিষয়ে বেশ কিছু হাদীস এসেছে। আমরা চেষ্টা করব, রোযা অবস্থায় বেশি বেশি আল্লাহর কাছে চাওয়ার। বিশেষ করে ইফতারের পূর্ব মুহূর্তে, অর্থাৎ ইফতার শুরু করার আগে আমরা দুআ করব। একটা হাদীসে এসেছে, ইমাম হাকিম হাদীসটাকে সহীহ বলেছেন, এই মুহূর্তে যতটুকু মনে পড়ে...

إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةً ...

প্রত্যেক রোযাদারের ইফতারের সময়ের দোআ আল্লাহ কবুল করেন। আর এই হাদীস বলেই, যতটুকু এই মুহূর্তে মনে পড়ে, আব্দুল্লাহ ইবন আমর ﷺ দুআ করতেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي

(অর্থ) হে আল্লাহ, আপনার সর্বব্যাপী রহমত, যে রহমত সববিছুকে ঘিরে নিয়েছে, সেই রহমতের ওসীলায় আমি আপনার কাছে দুআ চাচ্ছি– আপনি আমরা

---

[১৩] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৩০৮; সুনান নাসায়ি, হাদীস নং-২০৯৫; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-২৬১৬।

গোনাহগুলোকে মাফ করে দিন।[১৪] কাজেই আমরা ইফতারের আগ দিয়ে দুআ করব। ইফতার চলাকালেও করতে পারেন।

প্রশ্ন-২৪৩: রমাযান মাসে উমরাহ্ আদায় করতে যাওয়ার কারণে মুসাফির হিসেবে রোযা কাযা করা যাবে কি না?

উত্তর: যিনি মুসাফির তার জন্য রোযা কাযা করার বিধান আল্লাহ্ কুরআনে উল্লেখ করেছেন:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

যে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা যে ব্যক্তি সফরে আছে তার জন্য রমাযানে রোযা পালন না করে পরে অন্য মাসে রোযা রাখার বৈধ্যতা আল্লাহ্ কুরআন কারীমে দিলেন।[১৫] এ জন্য মুসাফির রমাযানে রোযা না রেখে প্রয়োজনে অন্য সময় রোযা কাযা করতে পারেন। যিনি উমরাহয় গমন করেছেন, তিনি পথ চলা অবস্থায় মুসাফির। তিনি সিয়াম থেকে বিরত থাকতে পারেন। তবে তিনি যদি সিয়াম পালন করতে পারেন, করবেন। আর মক্কায় পৌঁছানোর পর সেখানে পনেরো দিনের বা তার বেশি অবস্থানের নিয়্যাত করলে তিনি আর মুসাফির থাকবেন না। কোনো কোনো ফকীহ্ চারদিনের কথা বলেছেন।

প্রশ্ন-২৪৪: একব্যক্তি সফরের নিয়্যাত করেছেন, কিন্তু এখনো বাড়ি থেকে বের হন নি, তিনি কি বাড়ি থেকেই নামায কসর করতে পারবেন বা রোযা বাদ দিতে পারবেন?

উত্তর: কুরআনে আল্লাহ্ পাক যেটা বললেন, যে ব্যক্তি সফরে রত আছে, অথবা অসুস্থ, সে রোযা কাযা করতে পারে। কাজেই সফরে আমি রত নই, কেবল সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এখনো সফর শুরু করি নি, আমরা জন্য নামায কসর করা অথবা রোযা না রাখা সঠিক নয়। এটাই ফুকাহাদের সঠিক মত। কোনো কোনো ফকীহ্ বলেছেন, সে বাড়ি থেকে কসর করে বেরোতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ তো কুরআনে স্পষ্টভাবেই বলেছেন, কসর করা যাবে সফরে রত থাকা অবস্থায়। তার আগে নয়।

প্রশ্ন-২৪৫: ট্রাকের চালকরা তো সব সময় সফরের উপর থাকেন। তাদের জন্য নামায-রোযার বিধান কী?

উত্তর: তারা যতক্ষণ না কোথাও স্থিতি হবেন, তার আগ পর্যন্ত তারা মুসাফির। তারা

---

[১৪] মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস নং-১৬৩৬; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং-১৭৫৩।

[১৫] সূরা: [২] বাকারা, আয়াত: ১৮৪।

এই অবস্থায় সর্বদা নামায কসর করবেন। তিনি রোযাও না রাখতে পারেন রমাযানে। কিন্তু তিনি যেহেতু সারাবছর পথেই থাকেন, কবে মুকীম হবেন তার ঠিক নেই, তাই তিনি রমাযানেই রমাযানের পরিবেশে সবার সাথে রোযা রাখার চেষ্টা করবেন। তবে যদি রমাযানে রোযা রাখতে কষ্ট হয়, তিনি পরে কাযা করবেন। এই ধরনের চালকরা, নাবিকরা ছুটি পান। কয়েক মাসের জন্য বাড়িতে আসেন। সে সময় তিনি কাযা আদায় করে নেবেন।

প্রশ্ন-২৪৬: কোনো কোনো ব্যক্তি বলে থাকেন, মুসাফির এবং অসুস্থের জন্য রোযা না-রাখাটা জরুরি। অর্থাৎ রোযা রাখাটা গোনাহের কাজ। এটা কতটুকু সঠিক?

উত্তর: আসলে বিষয়টা অমন না। আল্লাহ কুরআনে আমাদের বলেছেন, মুসাফির এবং অসুস্থ ব্যক্তি রমাযানে রোযা নাও রাখতে পারে। এই নির্দেশনাটা আমাদেরকে রাসূল ﷺ এর সুন্নাত থেকে আমাদেরকে বুঝতে হবে। অনেক মানুষ আছেন, যারা অসুস্থ অবস্থায়ও রোযা রাখেন এবং আরো বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এটা কিন্তু আল্লাহর বিধান পালন করা হল না। আপনি অসুস্থ, নিশ্চিতভাবে জানেন রোযা রাখলে আপনি আরো বেশি অসুস্থ হয়ে পড়বেন, তারপরেও জোর করে, শরীরের উপর কষ্ট দিয়ে রোযা রাখবেন, এটা অবৈধ। এটা মনের আবেগের ইবাদত হল। আল্লাহ এবং রাসূল ﷺ এর আনুগত্যের ইবাদত হল না। রাসূল ﷺ এর শেখানো পদ্ধতিতে আল্লাহর বিধান পালন হল না। পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তাঁর কর্ম দ্বারা শিখিয়েছেন, সফর অবস্থায় কষ্ট হলে রোযা রাখবে না, কষ্ট না হলে রোযা রাখবে। সাহাবাগণও এটা করেছেন। কাজেই, মুসাফিরের জন্য বা অসুস্থের জন্য রোযা ভাঙা ফরয– এই মতটা সঠিক নয়।

প্রশ্ন-২৪৭: একব্যক্তি তিনমাসের জন্য সফর করবেন, তার নামায-রোযার বিধান কী?

উত্তর: এক জায়গায় তিনমাস থাকলে তিনি আর মুসাফির থাকবেন না। প্রসিদ্ধ মতে, পনেরো দিন, কোনো কোনো ফকীহের মতে চারদিন বা তার বেশি কেউ যদি অবস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাহলে তিনি মুকীম হয়ে যাবেন। স্থানীয় মানুষ হিসেবে গণ্য হবেন। তিনি পুরো নামায পড়বেন এবং রোযা রাখতে হবে। তবে যদি এমন হয়, তিনি তিনমাস কোথাও দাঁড়াবেন না, অর্থাৎ সফর অবস্থায় থাকবেন, এখানে একদিন ওখানে দুইদিন, যেমন পাইলটগণ, নাবিকগণ, ট্রাকের ড্রাইভারগণ– সেক্ষেত্রে তিনি মুসাফিরের বিধানে থাকবেন। নামায কসর করবেন। রোযা সম্ভব হলে পালন করবেন। নইলে পরে কাযা আদায় করবেন।

প্রশ্ন-২৪৮: কী কী কারণে রোযা পরবর্তীতে কাযা করার সুযোগ রয়েছে?

উত্তর: আল্লাহ কুরআনে মূলনীতি বলে দিয়েছেন। অসুস্থ এবং মুসাফির রোযা কাযা করতে পারে। অসুস্থতা বলতে এমন অসুস্থতা, রোযা রাখলে যেটা আরো বেড়ে যাবে, রোযা রাখতে অনেক কষ্ট হবে। কিংবা গর্ভবতী নারী, অথবা কোলে দুধের শিশু আছে, রোযা রাখলে মা অসুস্থ হয়ে পড়বে অথবা শিশু অসুস্থ হয়ে পড়বে বলে চিকিৎসকরা বলেন, তারা ওই সময় রোযা না রেখে অন্য সময় রাখবেন।

প্রশ্ন-২৪৯: ই'তিকাফে থাকা অবস্থায় মোবাইলের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করলে ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে কি না?

উত্তর: ই'তিকাফ নষ্ট হবে না। কিন্তু ই'তিকাফের বরকত পাবেন না।

প্রশ্ন-২৫০: আমি ই'তিকাফে বসতে চাই। কিন্তু সমস্যা হল আমার ছোট্ট একটা কারখানা আছে। শ্রমিকের বেতন দেয়া, পাওনা টাকা আদায়ের জন্য আমি তাদের সাথে কথা বলতে পারব কি না?

উত্তর: অবশ্যই করা যাবে। তারা এসে আপনার সাথে কথা বলে যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ই'তিকাফে থাকা অবস্থায় তাঁর স্ত্রীরা আসতেন, কথা বলে চলে যেতেন।

প্রশ্ন-২৫১: আমি কি যে কোনো দিন ই'তিকাফ করতে পারব?

উত্তর: নফল-মুসতাহাব ই'তিকাফ যে কোনো সময় করা যায়।

প্রশ্ন-২৫২: কদরের রাত কখন খুঁজব? শেষ দশরাতে নাকি শেষ দশকের বেজোড় রাতে?

উত্তর: দুটোতেই খুঁজতে হবে। শেষ দশদিন এটাও হাদীসে আছে। বিশেষ করে বেজোড় রাত।[১৬] দুটোতেই ইবাদত করবেন।

প্রশ্ন-২৫৩: আমি কি যেকোনো দিন ই'তিকাফ করতে পারব?

উত্তর: নফল-মুসতাহাব ই'তিকাফ যে কোনো সময় করা যায়।

প্রশ্ন-২৫৪: পিস টিভিতে শুনেছি শেষ দশরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে জাগতেন, স্ত্রীদেরকে ডেকে তুলতেন। শবে কদর খোঁজার জন্য। এটা কি সঠিক?

উত্তর: জি, এটা ঠিকই আছে।[১৭]

---

[১৬] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-২০১৬, ২০২০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১১৬৫, ১১৬৭, ১১৬৯।
[১৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১১৭৪; সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-১৩৭৬; সুনান নাসায়ি, হাদীস

প্রশ্ন-২৫৫: একজন মহিলা বেশ কয়েক বছরের কাযা রোযা পালন করতে পারেন নি। তিনি কী করবেন?

উত্তর: এ বিষয়ে ফুকাহাদের কিছু মতামত রয়েছে। শরীআতসঙ্গত কারণে মহিলাদের যে রোযাগুলো কাযা হয়ে যায়, সেগুলো পরবর্তী রোযা আসার আগেই আদায় করে ফেলতে হবে। এটাই হল বিধান। যদি কেউ এই এক বছরের মধ্যে কাযা আদায় না করেন, তাহলে পরের বছর তিনি কাযা করবেন নাকি ফিদইয়া দেবেন– এটা নিয়ে ফুকাহাদের মতভেদ আছে। তবে এক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব হল, দ্রুত রোযাগুলো কাযা আদায় করে নিতে হবে।

প্রশ্ন-২৫৬: রোযা হালকা হয় কীভাবে?

উত্তর: আমি এগুলো– রোযার হালকা-ভারী হওয়া বুঝি না। রোযা রেখে গোনাহ করলে রোযার সাওয়াব পাওয়া যায় না। এ জন্য অনেক আলিম এটাকে রোযা হালকা হওয়া বলেছেন।

প্রশ্ন-২৫৭: রমাযানের প্রথম দশদিন রহমত, দ্বিতীয় দশদিন মাগফিরাত, তৃতীয় দশদিন নাজাত– কথাটা কতটুকু সত্য?

উত্তর: এটা একটা হাদীসে এসেছে। হাদীসটা সনদগতভাবে একটু দুর্বল। তবে জাল নয়।

প্রশ্ন-২৫৮: রমাযানে অর্থসহ না পড়ে এমনিতে কুরআন খতম করা যায় কি না?

উত্তর: খতম তো দেয়াই যায়। তবে সব সময় মনে রাখবেন, অর্থ বুঝে তিলাওয়াত করাটাই হল তিলাওয়াতের পূর্ণতা। যদি কষ্ট হয় রমাযানে, এমনিতে খতম দেবেন। এরপর সারা বছর অর্থসহ পড়বেন।

প্রশ্ন-২৫৯: অসুস্থতার কারণে রোযা রাখতে না পারলে কাফফারা-স্বরূপ গরীবকে খাওয়ানোর টাকা কোনো মসজিদের গরীব ইমাম সাহেবকে দিলে আদায় হবে কি না?

উত্তর: প্রথম কথা হল, যদি রোযা রাখতে স্থায়ী অক্ষম হন, তাহলে তিনি ফিদইয়া দেবেন। একে কাফফারা বলে না। এটা গরীব ইমামকে দেয়া যেতে পারে। তবে এটা ইমামের পারিশ্রমিক হিসাবে দেয়া যাবে না। ইমামকে বলে দিতে হবে যে, এটা ফিদইয়ার টাকা।

নং-১৬৩৯; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং-১৭৬৮।

প্রশ্ন-২৬০: রোযার কিছু সুন্নাত সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়ার অনুরোধ রইল।

উত্তর: রোযাসহ সকল ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য শর্ত হল তা সুন্নাহ অনুযায়ী পালন করা। রাসূল ﷺ এর শেখানো পদ্ধতিতে পালন করা। মূল ইবাদত পালন করার পদ্ধতি সুন্নাত হওয়া প্রয়োজন। এবং এই ইবাদতের ভেতরে কোন কোন কর্ম করা প্রয়োজন সেটাও সুন্নাহ থেকে দেখতে হবে। রোযার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেকগুলো নির্দেশনা দিয়েছেন। এগুলোর ভেতর রয়েছে সাহরি খাওয়ার সুন্নাত। ইফতার করার সুন্নাত। রোযা রাখা অবস্থায় করণীয় কর্মগুলো। রমাযানের রাত্রিকালীন সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সাহরি খেতে উৎসাহ দিয়েছেন, নির্দেশ দিয়েছেন, নিজে সাহরি খেতেন; এবং এক্ষেত্রে সুন্নাত হল সাহরিকে বিলম্বিত করা। যতদূর পারা যায় সাহরিকে ফজরের আযানের কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে। কাজেই সাহরি গ্রহণের ক্ষেত্রে সুন্নাত হল, শেষ সময়ে সাহরি খাওয়া। ইফতার গ্রহণের ক্ষেত্রে সুন্নাহ হল, সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করা। এক্ষেত্রে দুটো বিষয় আমাদেরকে লক্ষ রাখতে হবে। একটা হল, আমাদের ইচ্ছা মতো আল্লাহর ইবাদত করা যাবে না। ইসলাম অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শেখানো পদ্ধতিতে, তাঁর অনুকরণে আল্লাহর ইবাদত করা। এ জন্য কোনো ইবাদতের সাথে অতিরিক্ত তাকওয়া, অতিরিক্ত ভালোবাসা, বেশি আবেগ মিশিয়ে আরেকটু বেশি করে আমলটা করব– এই সুযোগ ইসলামে রাখা হয় নি। রমাযানের দুদিন আগ থেকে রোযা শুরু করব, রমাযান শেষ হলেও আরো দুদিন রোযা রাখব, সাহরি আগে থেকে খেয়ে নেব, ইফতার একটু দেরি করে করব, যাতে রোযাটা আরো মযবুত হয়– এই ধরনের তাকওয়া আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অনুকরণ-অনুসরণ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। এ জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ম বলে দিয়েছেন। আমাদেরকে সেই নিয়মে ইবাদত করতে হবে। রাত্রে ইবাদত করা, সালাত আদায় করা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। কিন্তু ফজরের আযানের পরে আমরা আর কোনো নফল ইবাদত করতে পারব না। অনেককেই ওই সময় বসে থাকতে হয়। হাতে সময় আছে, ফজরের আযান হয়ে গিয়েছে, ঘুম ভেঙে গিয়েছে, দু রাকআত সুন্নাত পড়েছি, আরো অনেক রাকআত নামায পড়ার সুযোগ আমার রয়েছে, কিন্তু না, এই সময় তুমি আর কোনো নফল ইবাদত পালন করতে পার না। দীন তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদত নয়। সঠিক ইবাদতও আল্লাহর রাসূল ﷺ এর নির্দেশনার বাইরে হলে তা ইবাদত বলে গণ্য হবে না।

কী দিয়ে ইফতার করব, কী দিয়ে সাহরি খাব– এটাও রাসূলুল্লাহ ﷺ শিখিয়েছেন। সাহরি এবং ইফতার উভয় ক্ষেত্রে অল্প খাদ্য গ্রহণ করা, স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণ করা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাত। তিনি ইফতারের সময় টাটকা খেজুর, না হলে খুরমা

খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। বেজোড় সংখ্যক খেজুর তিনি গ্রহণ করতেন। খেজুর না পেলে তিনি পানি পান করতেন। আমরা বাংলাদেশের মানুষ যুগযুগ ধরে ইফতার করার সময় পানি মুখে দিয়ে থাকি। আমাদের নিয়ম হল, প্রথমে পানি মুখে দিয়ে তারপর অন্যান্য খাবার গ্রহণ করা। এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাতের অংশ। অর্থাৎ খেজুর না পেলে পানি দিয়ে ইফতার শুরু করা। তবে আগে আমাদের দেশে খেজুর ছিল না বলে এটাই সুন্নাত ছিল। বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে বাজারে বিভিন্ন ধরনের খেজুর পাওয়া যায়। ইফতারে আমাদের সামনে খেজুর থাকে। তারপরেও আগের অভ্যাস মতো আমরা পানি দিয়ে ইফতার শুরু করি। এটা সুন্নাতের ব্যতিক্রম। সুন্নাত হল, আমরা প্রথমেই খেজুরের মাধ্যমে ইফতার শুরু করব। ইফতারের সময় ব্যাপক খাওয়া, অতিভোজন– এটাও সুন্নাতের খেলাফ। স্বাভাবিক খাওয়াটাই রাসুল ﷺ এর সুন্নাত। সাহরিতেও একই অবস্থা। রাসূলুল্লাহ ﷺ মধ্যম পরিমাণ খাবার গ্রহণ করতেন। ইফতার এবং সাহরির উদ্দেশ্য এই নয় যে, সারাদিন কিছু খাব না, তাই এটার পরিপূরক হিসেবে দুপুরে এবং বিকালে যা কিছু খেতাম তার সবগুলো রাতে একবারে খেয়ে নেব– এটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এটার উদ্দেশ্য স্বাভাবিক কিছু খাদ্য গ্রহণ করা, যেন আমাদের সিয়াম পালন সহজ হয়। ইফতারের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ মাগরিবের নামাযকে একটু বিলম্বিত করতেন। অপরদিকে ফজরের ক্ষেত্রে ফজরের নামায তাড়াতাড়ি পড়তেন। সাহরি শেষ করার অল্পকিছু সময় পরেই ফজর আদায় করতেন। এটা বিভিন্ন হাদীস থেকে আমরা দেখতে পাই। কাজেই, রমাযান মাসে সুবহে সাদিকের পরপরই রাসূলুল্লাহ ﷺ ৪০/৫০ আয়াত পড়ার সময় পরিমাণ বিলম্ব করে ফজরের নামায শুরু করতেন বলে হাদীস শরীফে এসেছে। মাগরিবের নামায একটু বিলম্ব করা, ইফতার সামনে রয়েছে, পেটে ক্ষুধা রয়েছে, আহারের যে আগ্রহ, সেটা নিবৃত্ত করে মাগরিবের নামায আদায় করার কথা হাদীস শরীফে এসেছে। রোযারত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন ইবাদত করতে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি নিজে করেছেন। এর অন্যতম হল, কুরআন তিলাওয়াত, মানুষদের সাহায্য করা, দান করা, মানুষদের জন্য ব্যয় করা– এই জাতীয় ইবাদত রাসূলুল্লাহ ﷺ রমাযান মাসে বেশি বেশি করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস ﵁ বলেছেন:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ... كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রকৃতিগতভাবেই অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। দান করতে, সাহায্য করতে খুবই ভালোবাসতেন। আর রমাযান মাসে তাঁর দানের সীমা-পরিসীমা থাকত না। তিনি সবাইকে সাহায্য করতে উদগ্রীব হয়ে থাকতেন। বাতাস যেমন কোনো

বাধ মানে না, সবার ঘরে ঢুকে পড়ে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর রমাযানের দান সবার কাছে পৌঁছে যেত।[১৮] রমাযানের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত শিখিয়েছেন– কিয়ামুল লাইল– যাকে আমরা তারাবীহ নামে চিনি। মনের আবেগ দিয়ে, আল্লাহ তাআলার জন্য, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করার নাম কিয়ামুল লাইল। রাসূলুল্লাহ ﷺ রমাযানের রাত্রিতে এবং সারাবছর কিয়ামুল লাইল করতেন। তিনি বলতেন:

لَا بُدَّ مِنْ صَلَاةٍ بِلَيْلٍ وَلَوْ حَلْبَ (فُوَاقَ نَاقَةٍ) شَاةٍ

রাতের কিছু সময় কিয়াম করতেই হবে। একটা উটের দুধ দহন করার সময় পরিমাণ হোক না কেন, কিয়াম করতেই হবে।[১৯] কিয়ামুল লাইল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। কিয়ামুল লাইল ইশার সালাতের পর থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত পড়া যায়। ঘুমানোর আগে রাত্রিবেলা আমরা যত সালাত আদায় করি, সেটা কিয়ামুল লাইল-রাতের দাঁড়ানো বা সালাতুল লাইল-রাতের নামায নামে ইসলামি পরিভাষায় আখ্যায়িত হয়। তবে এই কিয়ামুল লাইলটা যদি ঘুম থেকে উঠে আদায় করা হয়, তাহলে তাকে বলা হয় তাহাজ্জুদ। তাহাজ্জুদও কিয়ামুল লাইল। কিন্তু কিয়ামুল লাইল ঘুম থেকে উঠে অথবা ঘুমের আগে করলে উভয় অবস্থায় সেটা কিয়ামুল লাইল বলে গণ্য হবে। তবে তাহাজ্জুদ বলে গণ্য হতে হলে ঘুম থেকে উঠতে হবে। কেউ ইশার সালাত আদায় করে দশটার দিকে ঘুমিয়ে পড়েছে, এরপর বারোটার দিকে ঘুম থেকে উঠে যদি তিনি কিয়ামুল লাইল আদায় করেন, সেটা তাহাজ্জুদ হিসেবে গণ্য হবে। অন্য আরেকজন, তিনি রাত একটা পর্যন্ত ঘুমান নি, তিনি একটার সময়ও যদি কিয়ামুল লাইল আদায় করেন, তবু সেটা কিয়ামুল লাইল হবে, তাহাজ্জুদ হবে না। কিয়ামুল লাইলকে তাহাজ্জুদ হিসেবে আদায় করতে কুরআন আমাদেরকে উৎসাহ দিয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন। বিশেষ করে রমাযানের রাত্রিতে কিয়ামুল লাইল আদায় করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি নিজেও পালন করেছেন। আর যেহেতু শেষ রাতে উঠতে অনেকেই ভয় পান, তাই সাহাবিদের যুগ থেকেই রমাযানে প্রথম রাত্রিতে কিয়ামুল লাইল আদায় মুসলিম উম্মাহর গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ। এক্ষেত্রে সুন্নাতের নির্দেশনা হল, মুহাব্বতের সাথে যত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা যায়। দুঃখজনক হল, রাকআত নিয়ে আমরা ঝগড়া করি, কিন্তু কত ঘণ্টা কিয়ামুল লাইল আদায় করা হবে, এটা নিয়ে গুরুত্ব দেয়া হয় না। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন/চার

---

[১৮] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৩০৮; সুনান নাসায়ি, হাদীস নং-২০৯৫; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-২৬১৬।

[১৯] তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস নং-৭৮৭; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ২/২৫২।

ঘণ্টার কমে তারাবীহ পড়েন নি। রমাযানে তিনি তিন রাতে কিয়ামুল লাইল আদায় করেন। তেইশ রমাযানের রাত্রিতে, ইশার সালাতের পর থেকে রাত তিন ভাগের একভাগ পার হওয়া পর্যন্ত বা মাঝরাতের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত। অর্থাৎ আমরা ধারণা করতে পারি, ইশার পর থেকে রাত এগারোটা বারোটা পর্যন্ত। চব্বিশের রাত্রিতে তিনি জামাআতে কিয়ামুল লাইল আদায় করেন নি। পঁচিশের রাত্রিতে তিনি আরো কিছু বেশি সময়, মাঝরাত পর্যন্ত কিয়ামুল লাইল আদায় করেন। আমরা ধারণা করতে পারি, রাত নটা থেকে একটা পর্যন্ত বা এর কাছাকাছি সময় পর্যন্ত তিনি কিয়ামুল লাইল আদায় করেন। ছাব্বিশের রাত্রিতে তিনি জামাআতে কিয়ামুল লাইল আদায় করেন নি। সাতাশের রাত্রিতে তিনি কিয়ামুল লাইল আদায় করেন, সাহাবিদের ভাষায়– আমরা ভয় পেয়ে গেলাম, আমরা তো সাহরিই খেতে পারব না। অর্থাৎ রাত প্রায় তিনটা পর্যন্ত।[২০] এভাবে আমরা দেখছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নূন্যতম কিয়ামুল লাইলের সময় ছিল প্রায় তিনঘণ্টা। আর সাতাশের রাত্রিতে তিনি রাত নটা থেকে প্রায় তিনটা পর্যন্ত, দীর্ঘ সময়, ছয়ঘণ্টা কিয়ামুল লাইল আদায় করেন। সাহাবাগণও দীর্ঘ সময়, ৩/৪/৫ ঘণ্টা কিয়ামুল লাইল আদায় করেছেন। আমরা রাকআত নিয়ে, আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে ঝগড়া করি, কিন্তু ইবাদতের যে মূল সুন্নাহ, দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইবাদত করা– এদিকটা আমরা কেউ লক্ষ করছি না।

প্রশ্ন-২৬১: রমাযানে করা যায় এমন ছোটছোট সহজ আমলের নাম বলুন।

উত্তর: রমাযানে আমাদের অনেক কিছুই করা দরকার। ছোটছোট আমলের ভেতরে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেগুলো পছন্দ করেছেন, কুরআন তিলাওয়াত করবেন। না-হলে কুরআন তিলাওয়াত শুনবেন। ক্যাসেটে শুনবেন। তরজমা পড়বেন, শুনবেন। যদি এগুলো না পারেন, তাসবীহ তাহলীল করবেন। সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, দরূদ এবং তাসবীহগুলো সব সময় পড়বেন। বেশি বেশি দুআ করবেন। রোযা অবস্থায় দুআ কবুল হয়। দুআ মানে ওযু করে হাত তুলে দুআ নয়। দুআ মানে আল্লাহর সাথে কথা বলা। 'আল্লাহ, আমাকে মাফ করো। আল্লাহ আমার আব্বা-আম্মাকে মাফ করো। আল্লাহ আমাকে এটা দাও, ওটা দাও। ছেলের চাকরি দিয়ে দাও, মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও'। আর দান-সাদাকাহ করবেন। মানুষকে টুকটাক যতটুকু পারেন সাহায্য করবেন। আর একটা কাজ করবেন। কাজটা সহজ কিন্তু

[২০] মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-২১৪৪৭; সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-১৩৭৫; সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-৮০৬; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং-১৩২৭; সুনান নাসায়ি, হাদীস নং-১৩৬৪; তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস নং-২০৫৬।

করাটা কঠিন। মানুষদেরকে ভালো কথা বলবেন। ভালো কথা সুন্দর করে বলা আমাদের জন্য কঠিন। আমরা যখন কাউকে ভালো কথা বলতে যাই, বলি, 'ওই ব্যাটা মুসলিম, রোযা রাখিস না ক্যান! তুই কেমন মুসলিম! তুই কাফির'। এটা বললে আমাদের শান্তি লাগে। কিন্তু 'ভাই, আপনি তো মুসলিম, আপনার ঈমান আছে, একদিন রোযা রাখেন না ভাই'– এইভাবে বলা কষ্টকর। কষ্টকর কাজটা যদি করতে পারেন, পয়সা লাগে না, কিন্তু অনেক সাওয়াব আছে।

প্রশ্ন-২৬২: অসুস্থতার কারণে মেয়েরা রমাযানে পুরো রোযা রাখতে পারে না। রমাযানের বাদ পড়া রোযাগুলো শাওয়াল মাসে রাখলে কি শাওয়ালের ছয় রোযা রাখার সাওয়াব পাওয়া যাবে?

উত্তর: জি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রমাযানের রোযা পূর্ণ করার পর ছয় রোযা রাখতে হবে। কাজেই রমাযানের রোযা পূর্ণ না করে যদি ছয় রোযা করেন, তাহলে তো হবে না। তবে যদি এমন হয়, কাযা পূর্ণ করার পর আর ছয় রোযা রাখার সময় না থাকে, তাহলে ছয় রোযা আগে রেখে দেবেন। এরপর শাওয়াল শেষে অন্য সময় কাজাটা আদায় করে নেবেন।

প্রশ্ন-২৬৩: শাওয়াল মাসে তিনটি রোযা করলে কি হবে?

উত্তর: তিনটি করলে তিনটের সাওয়াব পাবেন। ছয়ের সাওয়াব তো পাবেন না।

হজ্জ/উমরাহ

প্রশ্ন-২৬৪: আমার শেয়ার ব্যবসা আছে। শেয়ার বিক্রি করলে আমার উপর হজ্জ ফরয হয়। কিন্তু এতে আমার ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ব্যবসাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে হজ্জ করা যায় কি না?

উত্তর: আপনার ব্যবসার পুঁজি নষ্ট করলে যদি আপনার সংসার অচল হয়ে যায়, আপনার না চলে, তাহলে আপনি এই ব্যবসা নষ্ট করতে পারেন না। আপনার হজ্জ ফরয নয়। আর যদি আপনার নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদার বাইরে এমন কিছু টাকা থাকে, যে টাকায় হজ্জ করলে আপনার নিত্যপ্রয়োজন নষ্ট হবে না, অভাবে পড়বেন না, তাহলে হজ্জ ফরয।

প্রশ্ন-২৬৫: স্বামী সচ্ছল কিন্তু স্ত্রী সচ্ছল নয়। স্বামী হজ্জ করে। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর হজ্জ করানোর দায়িত্ব কার?

উত্তর: স্ত্রী অসচ্ছল হলে তার উপর হজ্জ ফরয নয়। তবে স্বামী যদি তাকে হজ্জ করান, স্ত্রীর ফরয আদায় হবে, স্বামীও অনেক বড় সাওয়াব পাবেন। কাজেই এটা স্বামীর দায়িত্ব নয়, তবে কর্তব্য। স্বামীর যদি সচ্ছলতা থাকে নিজের সঙ্গে স্ত্রীকে নিয়ে যাবেন। আর যারা হজ্জে যান নি, তাদের বলি। হজ্জ হল পারিবারিক ইবাদত। একা গেলে শান্তি পাবেন না। যত মানুষ একা হজ্জে গেছে, এসে আফসোস করেছে, কেন বউকে নিয়ে যাই নি! কেন ছেলেমেয়েকে নিয়ে যাই নি! হজ্জে আরাফাতে, হারাম শরীফে স্ত্রী, ছেলেমেয়ে নিয়ে দিন কাটাতে পারলে যে আনন্দ পাওয়া যায়, যে তৃপ্তি পাওয়া যায়, এটা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। ইসলামে সব ইবাদতই স্বামী-স্ত্রী একসাথে আদায় করার কথা বলা হয়েছে। তাহাজ্জুদের কথা বলা হয়েছে। বিশেষ করে হজ্জ। রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জে স্ত্রীদের না নিয়ে যান নি। সাহাবায়ে কিরাম নিয়ে যেতেন।

প্রশ্ন-২৬৬: কোনো বিত্তশালী ব্যক্তি যদি তার কর্মচারিকে হজ্জ করার জন্য টাকা দেন, তার হজ্জ কি শরীআতসম্মত হবে?

উত্তর: অবশ্যই হবে। কেউ যদি আপনাকে টাকা দেয়– 'ভাই আপনি হজ্জ করে আসেন'– আপনার হজ্জও আদায় হবে, ফরযও আদায় হবে।

প্রশ্ন-২৬৭: বদলি হজ্জ করার ক্ষেত্রে শরীআতের নির্দেশনা কী?

উত্তর: যিনি মারা গিয়েছেন অথবা অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়েছেন, হজ্জ করার ক্ষমতা নেই, তার পক্ষ থেকে বদলি হজ্জ করানোর কথা হাদীস শরীফে এসেছে। যদি ওসিয়ত করে যান, খুবই ভালো। না করলেও বদলি হজ্জ করানো যায়। যিনি আগে হজ্জ করেছেন, তাকে দিয়ে বদলি করানোর কথা হাদীস শরীফে এসেছে। যদি আপনার উপর হজ্জ ফরয হয়, আগে নিজে করে এরপর পিতামাতার জন্য বদলি হজ্জ করাতে পারেন। এটা ভালো।

প্রশ্ন-২৬৮: যার উপর হজ্জ ফরয হয় নি সে বদলি হজ্জ করতে পারবে কি না?

উত্তর: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিজের হজ্জ আদায় করে এরপর বদলি হজ্জ করতে। এ জন্য উচিত হল, শুধু ফরয হয়েছে তা নয়, যিনি আগে হজ্জ করেছেন, তাকে দিয়ে বদলি হজ্জ করাতে হবে।

প্রশ্ন-২৬৯: যার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে সে নিজের হজ্জ করার আগে অন্যের বদলি হজ্জ করতে পারবে কি না?

উত্তর: এটা উচিত নয়। হাদীসে নিষেধ আছে।

প্রশ্ন-২৭০: সৌদি সরকার হজ্জের তারিখ নির্ধারণ নিয়ে যে প্রতারণার আশ্রয় নেয়, তার জন্য হজ্জের কোনো ক্ষতি হবে কি না?

উত্তর: প্রথম কথাটাই তো মিথ্যা। সৌদি সরকার প্রতারণার আশ্রয় নেবে কেন? আমাদের দেশে মিথ্যা আর মূর্খতায় ভরা। 'শুক্রবারে হজ্জ হলে হাজিদের প্রত্যেককে হাদিয়া দিতে হয়, এই ভয়ে সৌদি সরকার হজ্জের তারিখ উল্টে দেয়'। জাহিল, পাগল, মূর্খ ছাড়া এই কথা কেউ বলে না। শুক্রবারে হজ্জ হলে হাদিয়া দিতে হয়, কোথাও নেই। কুরআন-হাদীসে কোথাও নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ শুক্রবারে হজ্জ করেছেন, একজন হাজিকেও হাদিয়া দেন নি। এটা বানোয়াট মিথ্যা কথা। আর হাজিদের হাদিয়া যদি দিতে হতই, সৌদি সরকার যেভাবে হাজিদের থেকে টাকা নিয়ে কামাই করে, হাজিদের পেছনে খরচও করে। একটা হাজির একটা হার্ট অপারেশনের জন্য বাংলাদেশে যেখানে পাঁচলাখ লাগে, সৌদি সরকার ফ্রি করে। লক্ষ লক্ষ টাকা তারা হাজির পেছনে ব্যয় করেন। হাদিয়াও দেন। শুক্রবারে হোক আর বুধবারে হোক, হাদিয়া দেন। জমজমের পানি দেয় ফ্রি। কোরআন শরীফ দেয় ফ্রি। একেবারে দেয় না যে, তাও না। হজ্জের ডেট নিয়ে প্রতারণা করে সৌদি সরকারের লাভটা কী! পাগল ছাড়া কেউ এই কল্পনা করে না। কারণ হজ্জ যেদিনই হোক, সৌদি সরকারের কী আসে যায়?

দুই নাম্বার হল, সরকার প্রতারণা করলেও এর উত্তর হাদীসে আছে। আয়িশা ﵂

এর কাছে তাবিয়ি মাসরুক এসেছেন। ওই দিন জিলহজ্জ মাসের নয় তারিখ। মাসরুক রোযা নেই। আয়িশা ﷺ বললেন, মাসরুককে ছাতু খাওয়াও। উনি একটু লজ্জা পেলেন। বললেন, ইয়া উম্মাল মুমিনীন, আজকে নয় তারিখ, রোযা রাখার দরকার ছিল, কিন্তু ইয়াযীদের যুগের যালিম শাসকেরা হজ্জের তারিখ ঠিকমতো ঘোষণা করেছে কি না, আজকে দশ তারিখ কি না, রোযা হারাম হয় কি না, সেই ভয়ে আমি রোযা রাখি নি। আয়িশা ﷺ বকা দিলেন। তিনি বললেন, যেদিন রাষ্ট্রপ্রধান ঘোষণা দেবে, ওই দিনে হজ্জ, ওই দিনে ঈদ, ওই দিনে কোরবানি। তোমার অত চিন্তা করতে হবে না।

আমাদের চার ইমাম লিখেছেন, সরকার যদি হজ্জের তারিখ ইচ্ছা করেও নষ্ট করে, মানুষদের হজ্জ হয়ে যাবে। সরকারের গোনাহ হবে। কারণ:

عَرَفَةُ يَوْمَ يُعَرِّفُ الْإِمَامُ

যেদিন রাষ্ট্রপ্রধানের আরাফাতের ঘোষণা দিবে, ওই দিনে হজ্জ হবে।

الفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ

ঈদুল ফিতর হবে কবে? যেদিন সব মানুষ করবে আর রাষ্ট্র ঘোষণা দেবে।[১] কাজেই আপনার দুটো চিন্তাই ভুল। সৌদি সরকার হজ্জের তারিখ নিয়ে প্রতারণা করে- এরচেয়ে ফালতু, বাজে, পাগলামি কথা দুনিয়াতে নেই। কারণ এতে ওদের কোনো লাভ নেই। হজ্জ যে কোনো একদিন হয়ে গেলেই হল। আর যদি করেও থাকে, এতে হাজিদের হজ্জের কোনো ক্ষতি হবে না।

প্রশ্ন-২৭১: তাওয়াফের পরে দুই রাকআত নামায পড়তে হয় কি না?

উত্তর: এ ব্যাপারে সাহাবিদের যুগ থেকেই ইখতিলাফ আছে। যে কোনো মত মানুষ গ্রহণ করতে পারে।

প্রশ্ন-২৭২: রমাযান মাসে উমরাহ পালন করার ফযিলত কী?

উত্তর: একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মহিলা সাহাবিকে বললেন, তোমাকে তো (বিদায়) হজ্জে দেখলাম না। তুমি হজ্জে যাও নি? তিনি বললেন, আমাদের দুটো উট। একটা উট নিয়ে আমার স্বামী আর ছেলে আপনার সাথে হজ্জে গিয়েছিল। বাকি একটা উট নিয়ে যদি আমিও হজ্জে চলে যাই, তাহলে আমাদের সেচ বন্ধ হয়ে

---

[১] সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-৮০২; আসার আবু ইউসুফ, হাদীস নং-৮১৮; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং-১৬৬০; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস নং-৯৮২৭; তাবারানি, আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস নং-৬৮০২।

যেত। সে জন্য আমি যাই নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যখন রমাযান আসবে, তুমি উমরাহ পালন কোরো। কারণ কেউ যদি রমাযানে উমরাহ পালন করে, রমাযানে উমরাহ পালন করলে হজ্জের সমপরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যায়। অন্য হাদীসে এসেছে, যদি কেউ রমাযানে উমরাহ পালন করে, রাসূলের সাথে হজ্জ আদায় করার মতো সাওয়াব লাভ করবে।[২] কাজেই রমাযানে উমরাহ পালন করা একটা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। জীবনে একবার উমরাহ আদায় করা অধিকাংশ ফকীহের মতে ওয়াজিব। বাকি অন্যান্য সময় যখন সুযোগ পাওয়া যায়, আদায় করা নফল ইবাদত। যে কোনো সময় এটা করা যায়। তবে রমাযানে করলে অতিরিক্ত সাওয়াব পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন-২৭৩: একজন শা'বান মাসের শেষ দিনে উমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছেন। এরপর রমাযান মাসে উমরাহ সম্পন্ন করেছেন। তার উমরাহটা কোন মাসে ধরা হবে? শা'বান মাসের উমরা হল নাকি রমাযান মাসের?

উত্তর: আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্কটা প্রেম-ভালোবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তো আমাদেরকে দিতে চান। আমরা রমাযানে উমরাহ আদায় করব, অথচ একটু আগে নিয়্যাত করার কারণে আল্লাহ আমাদের সাওয়াব কম দেবেন– আমরা আল্লাহর উপর এই রকম ধারণা রাখব না। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ বলেন:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي

আমার বান্দা আমার ব্যাপারে যেমন ধারণা করবে আমাকে তেমনই পাবে।[৩] কাজেই, কেউ যদি রমাযান মাস আসার আগেই উমরাহর নিয়্যাত করে নেন, অথবা ইহরামও শুরু করেছেন শা'বান মাসের শেষ দিনে, এরপর রমাযানের চাঁদ দেখার পরে উমরাহ আদায় করেছেন, এক্ষেত্রে তার উমরাহটা রমাযানেই আদায় হয়েছে বলে ধরতে হবে। উমরাহর একটা অংশ কেবল রমাযানের বাইরে আদায় হয়েছে। আমরা আশা করব, তিনি রমাযানে উমরাহ করার পুরো সাওয়াবটাই পেয়ে যাবেন। আল্লাহ তাআলা তো আমাদেরকে দিতে চান। এবং আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক হিসাব-নিকাশের নয়। তার সাথে আমাদের সম্পর্ক বেহিসাবের।

---

[২] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-১৮৬৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১২৫৬।

[৩] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-৭৪০৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৬৭৫; সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-২৩৮৮; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং-৩৮২২।

কুরবানি/আকীকা

প্রশ্ন-২৭৪: ভাগে কুরবানি দেয়া যাবে কি না?

উত্তর: অবশ্যই যাবে। সহীহ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাতভাগে উট-গরু কুরবানি দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন। এমনকি উঠের ক্ষেত্রে দশজনের হাদীসও এসেছে। যদিও জমহুর ফুকাহা দশের উপরে ওঠেন নি। এবং এ ব্যাপারে ফুকাহাদের কোনো মতভেদ নেই। আমাদের ভারত উপমহাদেশের কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাতজনের ভাগের অনুমতি দিয়েছেন সফরের ক্ষেত্রে। কাজেই বাড়ি থেকে ভাগ নেয়া যাবে না। কিন্তু হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো শর্ত করেন নি। তিনি বলেন নি যে, তোমাদের ভাগে কুরবানির অনুমতি দিলাম, কেবল সফরে থাকলে করতে পারবে– এটা বলেন নি। তিনি বলেছেন, কুরবানিতে সাতভাগ নিতে পারবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোনো নির্দেশ দেন এবং শর্ত না জোড়েন, সেখানে মনগড়াভাবে আমাদের পক্ষ থেকে কোনো শর্ত জোড়া ঠিক নয়। এ জন্য সৌদি আরবের আলিমরা সকল মুজতাহিদিনরা, চার ইমামসহ সকল আলিম একমত, কুরবানিতে গরু এবং উটের ভাগ নেয়া যাবে।

প্রশ্ন-২৭৫: কুরবানি তিনদিন কেন করা যায়?

উত্তর: সব কেন'র উত্তর একটাই– মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনদিন করার অনুমতি দিয়েছেন তাই তিনদিন করা যায়। একদিন হলে মানুষ একদিনেই খেয়ে শেষ করে ফেলে। তিনদিন হলে উৎসবটা বেশি হয়।

প্রশ্ন-২৭৬: কুরবানি দেয়ার নিয়্যাতে একটি ছাগল পোষা হয়। কিন্তু কুরবানি আসার আগেই ছাগলটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। ছাগলটি জবাই করে মাংস বিক্রি করা হয়। এখন কুরবানির জন্য নতুন ছাগল কিনতে হবে। নতুন ছাগলের জন্য বাড়তি টাকা যোগ দিতে হবে কি না?

উত্তর: কুরবানিতে নিয়্যাত কোনো ব্যাপার নয়। যারা সচ্ছল, কুরবানি দেবেন, তারা একটা ছাগলের নিয়্যাত করলে সেটা মরে গেলে কিছু হবে না। আরেকটা ছাগল কিনে কুরবানি দিয়ে দিলেই হবে। মানতটা হল সমস্যা। তবে মানত আমরা সাধারণত করি না। যেমন, 'আল্লাহ, আমার অমুক বিপদ কেটে গেলে একটা ছাগল কুরবানি দেব', এটা হল মানতের কুরবানি। আর নিয়্যাত হল, 'আমি এই ছাগলটা কিনলাম, ইনশাআল্লাহ কুরবানি দেব'। নিয়্যাতের ছাগল মরে গেলে আরেকটা ছাগল দিলেই হয়ে যাবে কোনো সমস্যা নেই।

প্রশ্ন-২৭৭: কোরবানির গরুর ভাগের মধ্যে আকীকার ভাগ নেয়া যাবে কি না?

উত্তর: হানাফি ফুকাহারা এটাকে জায়িয বলেছেন। কুরবানিও হবে, আকীকাও হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ আকীকাকে নুসুক [نُسُك] বলেছেন। আর কুরবানিকেও নুসুক বলা হয়। নুসুক মানে ইবাদত। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবাগণ দুটো একসাথে করেন নি। তারা কুরবানির সময় কুরবানি দিতেন। আকীকার সময় আকীকা দিতেন। আলাদা করে দিতেন। এমনকি তারা উট বা গরু দিয়ে আকীকা দেন নি। আয়িশা ﷺ কে একজন বলেছে, আপনার ভাতিজা হয়েছে, উট আকীকা দেন। আয়িশা ﷺ বললেন, কেন আমি উট আকীকা দেব! রাসূলুল্লাহ ﷺ তো ভেড়া, দুম্বা, ছাগল এগুলো আকীকা দিতে বলেছেন।[১]

প্রশ্ন-২৭৮: কুরবানির গরুর সাথে আকীকা দেয়া যাবে কি না?

উত্তর: না করাই ভালো। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবিরা এমন করেন নি। কারণ আকীকা একটা ভিন্ন আনন্দ, কুরবানি ভিন্ন ইবাদত। আকীকার সম্পর্ক জন্মের সাথে। জন্মের সপ্তম দিনে আকীকা দেবেন। না পারলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দিবেন। কুরবানির সাথে কেন দেবেন! তবে একসাথে দিলে জায়িয হবে, ফুকাহারা তাই বলেছেন।

প্রশ্ন-২৭৯: ছেলেদের জন্য কি দুটো ছাগল আকীকা দিতে হবে?

উত্তর: দুটো দিতে হবে। একটা দিলেও হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসানের জন্য একটা, হুসাইনের জন্য একটা আকীকা দিয়েছেন। এটা হাদীসে এসেছে।[২]

প্রশ্ন-২৮০: আকীকার মাংসের একভাগ গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে বাকি দুইভাগ রান্না করে আত্মীয়দের খাওয়ালে বৈধ হবে কি না?

উত্তর: হবে।

প্রশ্ন-২৮১: আমার বয়স বিয়াল্লিশ। বাবা-মা আমার আকীকা করেন নি। আমি কি নিজের আকীকা নিজে দিতে পারব?

উত্তর: জি, করতে পারবেন। আকীকা জন্মের সপ্তম দিনে করা সুন্নাত। যদি না করা হয়, বড় হয়ে করা যাবে। এতে মূল আকীকার সুন্নাত আদায় হবে, তবে সপ্তম দিনে আদায় করার যে সুন্নাত, সেটা আদায় হবে না।

---

[১] মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস নং-৭৫৯৫

[২] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-২৮৩৪, ২৮৪১; সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-১৫১৩; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং-৩১৬২।

বিবাহ/তালাক

প্রশ্ন-২৮২: ইসলামে বিবাহের প্রকৃত নিয়ম কী?

উত্তর: বিবাহ হল, সাক্ষীদের সামনে ইজাব-কবুল।

প্রশ্ন-২৮৩: শরীআত-নির্দেশিত বিবাহ আর রেজিস্টার বিবাহের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর: রেজিস্ট্রেশন হল আইনের জন্য। আপনি আমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন, বিনিময়ে জমি দিয়েছেন। রেজিস্ট্রি ছাড়াই জমির মালিকানা আমার। তবে রেজিস্ট্রি করা হয় জাগতিক আইনের জন্য। সাক্ষীদের সামনে ইজাব-কবুল হলেই সেটা শরীআতসম্মত বিয়ে। রেজিস্ট্রেশন করা ভালো। মসজিদ একজন ওয়াকফ্ করে দিয়েছে। ওয়াকফ্ মানে কিন্তু দলীল করে দেয়া নয়। মসজিদ বানিয়েছেন। আপনারা নামায পড়বেন। ওয়াকফ্ হয়ে গেছে। কিন্তু রেজিস্ট্রেশন যদি না করেন, পরবর্তীতে কেউ ঝামেলা করতে পারে। এ জন্য রেজিস্ট্রেশন করা হয় আইনের জন্য।

প্রশ্ন-২৮৪: চুক্তিবদ্ধ বিবাহ, যে এত বছর পর তালাক দিয়ে দেব, বৈধ কি না?

উত্তর: চুক্তিবদ্ধ বিবাহ বৈধ নয়। তালাকের চুক্তিতে বিবাহ হারাম। এটা কোনো বিবাহই না।

প্রশ্ন-২৮৫: ইসলামের দৃষ্টিতে ছেলেমেয়ের বিবাহের ন্যূনতম বয়স কত?

উত্তর: বিবাহের ক্ষেত্রে ছেলেমেয়ের বয়স কত হবে- ইসলাম এটা নির্ধারণ করে দেয় নি। তবে আল্লাহ কুরআনে বলেছেন:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

তোমাদের মধ্যে যাদের বয়স হয়েছে, অর্থাৎ তেরো-চোদ্দ-পনেরো-ষোলো-সতেরো-আঠারো-উনিশ-বিশ, এদের বিয়ে দাও।[১] কাজেই, বালিগ-বালিগা হলেই বিয়ে দেয়া শরীআতে বৈধ। আলী ﷺ এর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মেয়ে ফাতিমার বিবাহ হয়েছিল। এক রিওয়ায়াতে এসেছে তখন ফাতিমার বয়স ছিল আঠারো। আলীর বয়স ছিল একুশ। আবার অন্য রিওয়ায়াতে কমের কথাও এসেছে। পনেরো-ষোলোর কথাও আছে। বিবাহের ন্যূনতম কোনো বয়স নেই। যে কোনো বয়সে বিবাহ হতে পারে। তবে সাধারণভাবে সতেরো-আঠারোতে বিবাহ হওয়া উচিত।

[১] সূরা: [২৪] নূর, আয়াত: ৩২।

এটা হল ইসলামি ব্যবস্থা। আর কাফিরদের ব্যবস্থা হল, বিবাহ কঠিন করো, ব্যভিচার সহজ করো। আমরা বর্তমানে এই আইনে চলি। যেমন ছেলের বয়স বিশ-বাইশ-পঁচিশ হয়ে গেছে, বিয়ে করবে, বাপ-মা বিয়ে দেবে না। চাকরি পাও, তারপর বিয়ে করো। আগে বিল গেটস হও, তারপর বিয়ে। তখন তো আর বউয়ের দরকার থাকবে না। অর্থাৎ বিয়ে হল শার্ট-প্যান্টের মতো। ওটা গায়ে পরতে হবে। যখন যুবক-যুবতির ভেতর ইমোশন থাকে... সিমেন্টে আপনি পানি দেন, জমাট বাধবে। মাটিতে পাঁচদিন ফেলে রাখেন, তারপর পানি দেন, জমাট বাধবে না। ইমোশনের বয়সের ভেতর যখন যুবক-যুবতিদের বিয়ে হবে, তখন সংসারের ঝামেলার আগেই তাদের ভালোবাসাটা জমে যাবে। এটা ভালো। বিশেষ করে তাদের যৌবনের চাহিদা, উচ্ছলতা, উন্মাদনা– এই সময় বিয়ে দেবেন না, নানা রকম পাপের ভেতর ডুববে, এরপর যখন বিয়ের আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে, তখন বলবে যে বিয়ে করাই লাগবে একটা। কী জন্য? বুকশেলফে সাজিয়ে রাখার জন্য। এটা হল ব্যভিচারি সভ্যতা। দুর্ভাগ্যজনক হল, এটা আপনারাও করেন। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। তাদের ভেতর বিয়ের আবেগ আসলে তখন বিয়ে দেবেন না। আপনি জানছেন, বিয়ে না দিলে সে পাপে জড়াতে পারে, তাও মেনে নেন। এটা অন্যায়। ছেলেমেয়ের বয়স আঠারো-উনিশ-বিশ হলে বিয়ে দিয়ে দেন। আল্লাহ কুরআনে কী বলেছেন সেটা শেষ করি। তিনি বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত, তাদেরকে বিয়ে দাও। যদি তারা অসচ্ছল হয়,

وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

আল্লাহ বরকত দেবেন।

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ[২]

এরপর আল্লাহ দারিদ্রকে দুইভাগ করলেন। কোনো যুবক অসচ্ছল, মোটামুটিভাবে বউ চালাতে পারে, বাবার পয়সা আছে, আল্লাহ বললেন, বিয়ের পরে তিনি বরকত দিয়ে দেবেন। আর যার মোটেও টাকা নেই, তাকে আল্লাহ বলেন নি, আল্লাহর উপর তায়াক্কুল করে বিয়ে করে ফেলো। আল্লাহ বলেছেন, তারা নিজেকে পবিত্র রাখুক। কর্ম করে সচ্ছলতা অর্জন করুক। বাল্যবিবাহ নিয়ে আমাদের আইন খুব কঠিন। সরকার বয়স একটু কমাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশের মানবাধিকারবাদিরা নাকি খুব প্রতিবাদ করছেন। বাল্যবিবাহ ইসলাম উৎসাহ দেয় নি। কিন্তু বৈধ রেখেছে। বাল্যবিবাহ মানে আঠারোর আগে যে মেয়ের বিয়ে হল, সেটা বাল্যবিবাহ। বাল্যবিবাহের ক্ষতি কী? বাল্যবিবাহ হলে যে মেয়েটার বিবাহ হল, তার শরীর ভেঙে যায়, তার উপর অত্যাচার হয়, বিভিন্ন রোগব্যাধিতে আক্রান্ত

---

[২] সূরা [২৪]: নূর, আয়াত: ৩২-৩৩।

হয়। ঘটনা তো এরকমই, নাকি ভাই? আরেকটা জিনিস হয়, সেটা হল, ওর যে বাচ্চাকাচ্চা হয়, তারা মানুষ হয় না। এখন বলেন তো, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, ডক্টর ইউনুস, বঙ্গবন্ধু, আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর– আমরা কি বাল্যবিবাহের সন্তান নই? আমাদের মায়েদের কারোরই আঠারোর পরে বিয়ে হয় নি। সব আঠারোর আগে। তার মানে আমরা কেউ মানুষ হই নি! এখন সন্তানরা বেশি মানুষ হচ্ছে! দ্বিতীয় কথা হল, আমাদের মায়ের প্রজন্ম এবং দাদি-নানির প্রজন্ম ৯০ বছর বয়স পর্যন্ত টনটনে সুস্থ। তেরো-চৌদ্দ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে, আট-নয়টা সন্তান হয়েছে, বাড়িতে মেহমান আসলে মেহমানদারি করেছে, পাশের বাড়িতে বেশি মেহমান এসেছে, সেই বাড়ি গিয়ে রান্না করে দিয়ে এসেছে, এরপরেও ৭০/৭৫ বছর বয়সেও টনটনে। আর আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যারা ২৫ থেকে ৩০ বছরে বিয়ে হচ্ছে। ৩৫ এর আগেই মাথা ব্যথা, গায়ে ব্যথা, নানান অসুখ। বাড়িতে মেহমান আসলে কান্নাকাটি শুরু হয়ে যায়। এমনকি বাড়ির নিজের রান্না করতেও চায় না। কী লাভ হচ্ছে এতে, আমি জানি না।

প্রশ্ন-২৮৬: অনেকেই মনে করে, আধুনিক মেয়েকে বিয়ে করে দীনদার বানানোর ভেতর কৃতিত্ব আছে। ভালো মেয়েকে বিয়ে করার মধ্যে কৃতিত্ব নেই। এই যুক্তি কতটুকু সঠিক?

উত্তর: এটা পুরাটাই বোকাসুলভ কথা। যেমন ধরো, তুমি একটা সাবজেক্ট মোটেও পারো না, বোঝো না। এখন তুমি কি বলবে, আমি যে সাবজেক্ট পারি না, ওই কঠিন সাবজেক্টে পড়ব, এতে আমার কৃতিত্ব? তুমি কখনোই এটা করবে না। কারণ জীবন কোনো জুয়া নয়। জীবন কোনো গেম নয়। তুমি এমন কোনো মেয়েকে বিয়ে করবে না, যে সম্ভাবনাময়, পরে ভালো হতে পারে। তুমি একটা এমন মেয়েকে বিয়ে করলে, হতে পারে ওই মেয়ে তোমাকে কান ধরে ওর দলে নিয়ে ভিড়িয়ে নেবে। তখন সব কৃতিত্ব চলে যাবে ওই মেয়ের দিকে। আর এসব ক্ষেত্রে সাধারণত মেয়েরাই বিজয়ী হয়। জীবন নিয়ে এই রিস্ক নেয়ার কোনো সুযোগ নেই। তুমি ভালো মেয়েকে বিয়ে করবে। যে ছোট থেকে ভালো, এখন ভালো আছে, তাকে বিয়ে করবে। যে এখনো ভালো হয় নি তাকে তুমি ভালো করে কৃতিত্ব নেয়ার জন্য বিয়ে করতে পারো, তবে ফেল করার আশঙ্কা ৯৯%।

প্রশ্ন-২৮৭: কোনো সুস্থ মানুষ কি বোবা বা অন্ধকে বিয়ে করতে পারেন?

উত্তর: পারবে না কেন! বোবাকে বিয়ে করা যাবে না, অন্ধকে বিয়ে করা যাবে না– এই কথা কে বলেছে আপনাকে!

প্রশ্ন-২৮৮: দুই তালাক দেয়ার পর তিন তালাক দেয়ার সময় হয়ে গেল, কিন্তু তালাক দিল না, ওই মহিলা অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে কি না?

উত্তর: জি। দুই তালাকই নয়, এক তালাক দেয়ার পরেও যদি ইদ্দত পার হয়ে যায়, স্ত্রী বায়িন হয়ে যায়। আগের স্বামীর সাথে আর সম্পর্ক থাকে না। তিনি অন্য জায়গায় বিয়ে করতে পারেন আবার, অথবা আগের স্বামীকেও নতুন করে বিয়ে করতে পারেন। আর তিন তালাক হলে আগের স্বামীকে বিয়ে করতে পারেনই না।

প্রশ্ন-২৮৯: খেলা দেখে আনন্দের সাথে হাততালি দিলে বউ তালাক হয় কি না?

উত্তর: বউ তালাক হবে না। খেলা দেখা সর্বাবস্থায় মাকরুহ।

পোশাক/পর্দা/সাজসজ্জা

প্রশ্ন-২৯০: বাইরের যাওয়ার সময় বোরকা-নেকাব পরি। কিন্তু ঘরের ভেতর মাথায় কাপড় না দিলে কতটুকু গোনাহ হবে?

উত্তর: কিছুই হবে না। ঘরের ভেতরে আপনার মাহরাম পুরুষ– স্বামী, ছেলে, ভাই, শ্বশুর– এদের সামনে মাথায় কাপড় দেয়া ফরয নয়। মাহরামদের সামনে মাথা খোলা, হাত খোলা জায়িয। কাজেই ঘরের ভেতরে মাথায় কাপড় নেই– কোনো গোনাহ নেই। এটা নিয়ে আপনারা বাড়াবাড়ি করবেন না। মেয়েদের মাথা ঢাকতে হয় গায়রে মাহরাম পুরুষদের সামনে।

প্রশ্ন-২৯১: আমাদের মা-বোনেরা ইন্ডিয়ান সিরিয়ালের নামে ঝিলিক, পাখি ইত্যাদি পোশাক কেনাকাটায় ব্যস্ত। এর বিধান কী?

উত্তর: জি, এই বিষয়ে বলব। তার আগে আরেকটা বিষয় বলি পোশাক সম্পর্কে। আজকাল নাকি ছেলেদের প্যান্ট নাভির নিচে ছাড়া পরা যায় না। নাভির উপরে ওঠে না। মানে মুসলিমদেরকে কাফির বানানোর জন্য সব প্রক্রিয়া চলছে। আপনারা এই প্যান্ট বর্জন করেন। তাহলে দেখবেন আগামী বছর আর এই প্যান্ট থাকবে না। আর পাখি ইত্যাদি ড্রেস কেমন আমি জানি না। তবে কাফিরদের সাদৃশ্য– এটা নাজায়িয। কাফিররা যে পোশাক পরে, অর্থাৎ দেখলেই বোঝা যায় সে অমুসলিম– এটা হারাম। আর সেই পোশাকটা শাড়ি হয় বা ম্যাক্সি কিংবা অন্য কোনো পোশাক হয়, যেটা দ্বারা পর্দা রক্ষা হয়, ছবি না থাকে, সেটা জায়িয হতে পারে। ফ্রক যদি পুরো শরীর ঢাকে, পর্দা হয়, তাহলে জায়িজ হতে পারে। তবে যেটা অমুসলিমের সাথে জড়িত, সেটা বর্জন করা উচিত।

প্রশ্ন-২৯২: মহিলারা পুরুষের কাছে কুরআন শিক্ষা করতে পারবে কি না?

উত্তর: পর্দা করা ফরয। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুরআন তিলাওয়াত, শুদ্ধ করে তিলাওয়াত শেখা– এগুলো নফল পর্যায়ের ইবাদত। নফলের জন্য ফরয তরক করা যাবে না। পুরুষের কাছে মেয়েরা কুরআন শিখতে পারেন পর্দার সাথে। এবং একজন ছেলে একজন মেয়ে নয়। মাঝখানে পর্দা দিয়ে অন্তত ৪/৫ জন মেয়ে একজন উস্তাদের কাছে শিখতে পারেন।

প্রশ্ন-২৯৩: মৃত মহিলাকে দেখলে কি গোনাহ হবে?

উত্তর: ডাবল গোনাহ হবে। বেচারি হয়ত পর্দা করত, মরার পরে আপনি তাকে

বেপর্দা করলেন। মাহরাম ছাড়া কোনো পুরুষ যদি কোনো মৃত নারীকে দেখেন তাহলে গোনাহ হবে।

প্রশ্ন-২৯৪: ঘরের ভেতর উলঙ্গ হলে কি পর্দার বিধান লঙ্ঘন হবে?

উত্তর: নিজে যখন একা থাকবেন সতর খুললে গোনাহ হবে না। তবে একটা আবরণ অন্তত রাখা দরকার। এটা আদব।

প্রশ্ন-২৯৫: দুই বোনকে একত্রে বিবাহ হারাম। এক্ষেত্রে আমার স্ত্রীর বোন মাহরামদের মাঝে পড়বে কি না?

উত্তর: স্ত্রীর বোনকে বিবাহ করা হারাম, তবে যেহেতু অস্থায়ী হারাম, এ জন্য সে মাহরাম নয়। বউকে তালাক দিলে বা বউ মারা গেলে আপনি তাকে বিয়ে করতে পারেন।

প্রশ্ন-২৯৬: ছেলেমেয়ে একসাথে প্রাইভেট পড়া জায়িয আছে কি না?

উত্তর: এটা হারাম। যুবক-যুবতি, কিশোর-কিশোরীদের একসাথে মেশা হারাম। যদিও বোরকা পরা হয়।

প্রশ্ন-২৯৭: টাখনুর উপর কাপড় পরা ফরয। যদি তাই হয়, তবে তা কি শুধু নামাযের সময়? অধিকাংশ মুসলিমকে দেখা যায় ওযুর সময় প্যান্ট গুটিয়ে নেয়। এরপর নামায শেষে গোটানো প্যান্ট ছেড়ে দেয়।

উত্তর: জি না। পুরুষদের জন্য টাখনুর উপর কাপড় পরা সব সময়ই ফরয। টাখনুর নিচে কাপড় নামানো সব সময়ই হারাম। তবে দুঃখজনকভাবে আমাদের সমাজে এটা একটা ফ্যাশন হয়ে গেছে। আমি সব সময় আল্লাহর কাছে দুআ করি– আল্লাহ, ভালো কয়েকজন সিনেমার নায়ক যদি টাখনুর উপর কাপড় পরার অভ্যাসটা শুরু করত, তাহলে আমাদের ছেলেরা সবাই টাখনুর উপরে কাপড় পরত। কিন্তু এটা হচ্ছে না। এটা হলেই হয়ে যেত। এখন ছেলেরা টাখনুর নিচে কাপড় পরে। উপরে পরলে নাকি খারাপ দেখা যায়। আর মেয়েরা যত উঁচু করে পরে তত নাকি ভালো দেখা যায়! অথচ আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, মেয়েরা টাখনুর নিচে আধা হাত ঝুলিয়ে দেবে। আর পুরুষদের কাপড় টাখনুর নিচে নামবে না।[১] রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রায় ত্রিশটা হাদীস আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ কাপড় টাখনুর নিচে নামাতে নিষেধ

---

[১] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-৫৭৮৭; সুনান নাসায়ি, হাদীস নং-৫৩৩১; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-৯৩১৯।

করেছেন। কারো নামানো দেখলে তুলে দিয়েছেন। কেউ বলেছে, হুযুর, আমার পা'টা একটা ব্যাঁকা। রাসূল ﷺ বলেছেন, হোক ব্যাঁকা! কাপড় উঁচু করে পরো। কাজেই আল্লাহর ওয়াস্তে সবাই চেষ্টা করবেন।
এখানে আমরা যারা আছি, সবাই নামাযি দীনদার মানুষ। কেন অকারণে গোনাহ করব! যদি কাপড় টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরে দু-এক টাকা লাভ হত, তাহলে একটা কথা ছিল। মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন, দুইহাজার টাকা পকেটে নিয়ে বাড়ি এসেছেন, গোনাহ হয়েছে হোক, একদিন বিরানি খেলেন। কিন্তু টাখনুর নিচে কাপড় পরে কী লাভ! টাখনুর উপরে কাপড় পরলে মোটেও খারাপ দেখায় না। এক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গিটা কী সেটা দেখতে হবে। আপনি উমারের চোখ দিয়ে দেখছেন নাকি আদভানির চোখ দিয়ে দেখছেন, এটা হল বড় কথা। উমারের চোখ দিয়ে যদি আপনি দেখেন, তাহলে দেখবেন খুব সুন্দর দেখা যায়। তো এ জন্য ছেলেদের টাখনুর নিচে কাপড় পরা সব সময়ই হারাম। মেয়েদের জন্য টাখনুর নিচে কাপড় পরা ফরয। আমার পোশাক বইটা (পোশাক পর্দা ও দেহসজ্জা) সুযোগ পেলে পড়বেন।

প্রশ্ন-২৯৮: অনেকে বলে, আপনার বিশ্বদ্যিালয়ে চাকরি করা ঠিক নয়। কারণ আপনার সামনে মেয়েরা থাকে।

উত্তর: আমার বাংলাদেশে থাকাই ঠিক নয়। আমার সামনে প্রধানমন্ত্রী থাকে। বিরোধীদলীয় নেত্রী থাকে। গাড়িতে, প্লেনে আমার পাশে মেয়েরা বসে। বাজারে গেলে মেয়েরা থাকে। আমার তো তাহলে বাংলাদেশেই থাকা ঠিক নয়। দুই নাম্বার কথা হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সামনেও মেয়েরা থাকতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে ইচ্ছা করে মেয়েদের সামনে যেতেন। ঈদের নামাযে নামায পড়িয়ে প্রথম খুতবা দিতেন। মেয়েরা দূরে থাকতেন, আম খুতবার পরে আবার মেয়েদের সামনে গিয়ে খাস খুতবা দিতেন। সামনে মেয়েরা থাকতেন। মেয়েরা সামনে থাকলে সেখানে থাকা যাবে না, এটা কুরআন-হাদীসে কোথায় পেয়েছেন? পর্দা আছে কি না, সেটা হল বড় কথা। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্দা নেই ঠিক, কিন্তু আমাদের কুরআন-হাদীস-দাওয়াহ বিভাগে মেয়েরা ষোলোআনাই পর্দা করে। নেকাব-হিজাব-সহই চলে। বাইরে কী করে জানি না। অন্য বিভাগগুলোতে পর্দা নেই।

প্রশ্ন-২৯৯: আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষা রয়েছে। নারী-পুরুষ একত্রে চাকরি করে। আবার অধিকাংশ স্কুল-কলেজে নারী-পুরুষ একত্রে চাকরি করে। এটা শরীআতসম্মত হবে কি না?

উত্তর: বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেমেয়ে একসাথে চাকরি করে খুবই কম। বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলা স্টাফ কম। দু-একটা অফিসে আছে। আপনি দোকানে কেনাবেচা করতে

যান, আপনার পাশে অনেক সময় নারী কাস্টমার এসে দাঁড়ায়। আপনি যদি এমন অফিসে কাজ করেন, মহিলা নেই, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। আবার মহিলা থাকলেও যদি পর্দাসহ থাকে, আলহামদুলিল্লাহ। বেপর্দা হলে আপনি যদি চোখ সংযত করে রাখতে পারেন, অথবা অন্য কোনো সেকশনে ভর্তি হয়ে যেতে পারেন, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা যে সমাজে বাস করি, আমি যে বাসে উঠি, পাশে এসে অনেক সময় মেয়েরা বসে। আমার সামনে একটা মেয়ে বেপর্দা দাঁড়িয়ে থাকে। এখন আমি তো এদেশ থেকে পালিয়ে যেতে পারব না। বিশেষ করে পুরুষদের জন্য পর্দা হল চোখে। আমি চোখটাকে সংযত করব। সাধ্যমতো বাঁচার চেষ্টা করব। যদি দেখি কোথাও থেকে বাঁচতে পারছি না, চাকরি বাদ দিয়ে দেব। অনেক জায়গায় ছেলেমেয়ে একত্রে চাকরি করছে। এর ভেতর থেকেও আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে হবে। বাধ্য না-হলে মেয়েরা চাকরি করবেন না। করলে পর্দাসহ করবেন। ছেলেমেয়ে পাশাপাশি বসা, একজন মাত্র ছেলে আর মেয়ে এক অফিসে বসা– এগুলো গোনাহের কাজ। যদি এই ধরনের বিপদে কেউ পড়েন, তিনি চক্ষু সংযত রাখবেন। মহিলারা প্রাইমারি স্কুলে চাকরি করেন পুরুষদের সাথে। আপনি যত সাবধানই থাকেন, কিছু না কিছু ক্ষতি আসবেই আসবে। পুরুষদের সাথে কথা বলা, হাসি-মশকারা করা– এটা এমন একটা দরজা, যেটা খুললে বের হওয়া কঠিন। আমাদের এক বন্ধুর স্ত্রী, প্রাইমারিতে চাকরি পেয়েছেন, অ্যাপয়েনমেন্ট লেটার পেয়েছেন। আমাকে বলছেন, স্যার কী করব? আমি বললাম, চাকরি দিতে পারেন। এখন চাকরি দেয়া আপনার অপশনে আছে। এখন হয়ত ভাবীও বলবে, চাকরি থাকুক। দরকার নেই। কিন্তু দুবছর পরে ভাবীকে যখন বলবেন চাকরি বাদ দিতে, তখন ভাবী বলবে, তোমাকেই বাদ দিলাম, আমার চাকরি থাক। কারণ চাকরিতে গিয়ে সেখানে বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে গল্প, মজা; ঘরে-সংসারে আবদ্ধ থাকা আর ভালো লাগবে না। তখন আপনাকে মাইনাস করা সহজ হবে। চাকরি মাইনাস করতে পারবে না।

প্রশ্ন-৩০০: মহিলাদের ক্ষেত্রে ম্যাক্সির নিচে পায়জামা না পরলে কি নামায হবে?

উত্তর: জি, হবে। যদি মোটা ম্যাক্সি হয়, ম্যাক্সির নিচে সতর না বেরোয়, পাজামা বা সায়া না পরলেও নামায হবে। কিন্তু উপরে বড় ওড়না পরবেন, যেন আপনার মাথার চুল, ঘাড়, গলা, থুতনির নিচের অংশ বেরিয়ে না থাকে। এদিকটা লক্ষ রাখতে হবে। অর্থাৎ মূল ফরয হল সতর ঢাকা। মেয়েদের সতর হল, মুখমণ্ডল এবং কব্জি পর্যন্ত হাত বাদে পুরো দেহ। কাজেই এই দেহের কোনো অংশ যেন নামাযের ভেতর বেরিয়ে না যায়– এটাই বড় কথা।

প্রশ্ন-৩০১: আমাদের গ্রামের মেয়েরা শুধু আযানের সময় মাথায় কাপড় দেয়। শরীআতে এর কোনো নিয়ম আছে কি না?

উত্তর: আযানের সময় যদি আপনি ঘরে থাকেন, যেখানে মাথায় কাপড় দেয়া ফরয নয়, তখন যদি আপনি মাথায় কাপড় দেন আল্লাহর নামের আদবে– এটা খারাপ কিছু নয়, আবার ভালো কিছুও নয়। আল্লাহর নাম তো আমরা মাথায় কাপড় ছাড়া নিতে পারি। আল্লাহর যিকির করতে পারি। তবে মসজিদে আযান হচ্ছে, আল্লাহর নাম নেয়া হচ্ছে, আমি ঘরে আছি, আমার মাথায় কাপড় নেই, মাথায় কাপড় দেয়া জরুরি নয়। তবু আল্লাহর নামের মুহাব্বতে মাথায় কাপড় দিচ্ছি– এটা খারাপ কোনো কিছু নয়। তবে খুবই মুশকিল হল, পার্কে অর্ধোলঙ্গ হয়ে খেলা করে বেড়াচ্ছে, যেই আযান হয়েছে, তাড়াতাড়ি ওড়নাটা মাথায় দিয়েছে। এখন নিজেই ভেবে দেখেন, এর কারণ কী? মা-বাবা শিখিয়েছে, আযান হলেই ওড়না মাথায় দিতে হয়। কিন্তু ঘরের থেকে বাইরে যেতে যে ওড়না মাথায় দেয়া ফরয, পুরো শরীর ঢেকে রাখা যে ফরয– এটা আমরা শেখাই নি। তো ঘরের ভেতর দুলাভাই, ভাসুর, দেবরের সামনে, অথবা বাইরে একটা চুল বের করেও যান, কান বের করেও যান, তাহলে আপনি ভয়ঙ্কর কবীরা গোনাহে পতিত হলেন। লানতের মধ্যে পড়ে গেলেন। ফেরেশতারা লানত করছে। তখন আযানে মাথায় কাপড় দিলেই কি আর না দিলেই কি! যেমন একজন টুপি-পাগড়ি পরল, দাড়ি রাখল, কিন্তু লুঙ্গি পরল না। তার যেমন দুরাবস্থা, এটারও একই রকম দুরাবস্থা।

প্রশ্ন-৩০২: ভিডিও ধারণ যদি ছবির আওতায় না পড়ে তাহলে ভিডিওর নোংরা মহিলার ছবির হুকুম কী হবে?

উত্তর: সেগুলোর নোংরা এবং অশ্লীলতার গোনাহ হবে। ছবির গোনা না হোক, নোংরা দেখার গোনাহ তো হবে। এটার তো আর মাফ নেই। আমরা বলেছি, ভিডিও হল আয়না। নোংরা ভিডিও হারাম ছবি হিসেবে নয়, নোংরা হিসেবে। একজন মহিলা ন্যাংটো হয়ে গোসল করছে, আরেকজন আয়না দিয়ে দেখছে, জায়িয হবে? ছবি তো না। আয়না দিয়ে দেখা জায়িয হবে না? আসলে অশ্লীল নোংরা জিনিস হারাম ভিডিওর জন্য নয়। ভিডিও তো সেকেন্ডারি বিষয়। যেটা বাইরে দেখা হারাম, সেটা ছবিতে দেখাও হারাম। এই জন্য অশ্লীল ভিডিও ধারণ করা, দেখা, অশ্লীলতার কারণে হারাম। এবং অশ্লীলতা ধারণ করা হারাম। অশ্লীলতা দেখা হারাম। সেটার ছবি তুলে টাঙিয়ে রাখা হারাম। এটা আরেকটা অতিরিক্ত হারাম।

প্রশ্ন-৩০৩: আমরা জানি, সাহাবাদের যুগ থেকে মহিলাদের মসজিদে যাওয়া নিষেধ

ছিল। এখন তো আরো কঠিন সময়। এমতাবস্থায় মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেয়া কি ঠিক হবে? সুন্নাতের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর: আপনি বলেছেন, আমরা জানি সাহাবিদের যুগে মহিলাদের মসজিদে যাওয়া নিষেধ ছিল। কিন্তু আমি তো জানি না। আমি আজকেই শুনলাম, সাহাবিদের যুগে মহিলাদের মসজিদে যাওয়া নিষেধ ছিল। আমি জানি, নবীজি ﷺ এর যুগ থেকে খুলাফায়ে রাশেদার যুগ এবং তাবিয়িদের যুগে মহিলাদের মসজিদে যাওয়া পুরোটাই জায়িয ছিল। আপনি মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা পড়েন, মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক পড়েন, অনেক মহিলা মানত করেছে, অমুক মসজিদে ই'তিকাফ করব। তারা গেছে। ফুকাহারা বিভিন্ন মাসআলা দিয়েছেন। কেউ জায়িয বলেছেন। কেউ নাজায়িয বলেছেন। মসজিদের দরজা মেয়েদের জন্য কখনোই বন্ধ করা হয় নি। হ্যাঁ, তাদের মসজিদে আসতে আপত্তি করা হয়েছে, ফিতনা হবে, যেয়ো না। তবে তারাবীহ ভিন্ন। তারাবীহর জন্য হযরত উমার رضي الله عنه, উসমান رضي الله عنه, আলী رضي الله عنه মেয়েদের জামাআতের ব্যবস্থা করতেন। কারণ তারাবীহ তো কুরআন শোনার জন্য। আর মেয়েরা তো হাফিয নয়। পুরুষদের মতো তারাবীহর কুরআন শোনার সুযোগ, অধিকার তাদের দেয়া হয়েছে। ওয়াক্তিয়া নামায মেয়েদের বাড়িতে পড়লে সাওয়াব বেশি। মসজিদে যাওয়া বৈধ। তবে শর্ত আছে। ফিতনার ভয় থাকবে না। পর্দা রক্ষা করতে হবে। মসজিদে নামায পড়তে এসেছে, বেপর্দা। হারামের গোনাহ হবে, কোনো সাওয়াব হবে না। কাজেই, মেয়েদের মসজিদে যাওয়া সাহাবিদের যুগে নিষেধ ছিল, কোথায় আছে এটা আমার ইলমে ঢোকে নি কোনোদিন। আমি যেটা পেয়েছি, সেটা আপনাদেরকে বলি। হযরত উমার رضي الله عنه এর কথা বলা হয়, তিনি নিষেধ করেছেন। অথচ তিনি যেদিন শহীদ হন, ওইদিনের জামাআতেও, বুখারি শরীফের হাদীসে আসছে, তাঁর স্ত্রী জামাআতে ছিলেন, ফজরের নামাযে। তাহলে নিষেধ করলেন কি মরার পরে? তিনি অপছন্দ করতেন। তিনি মেয়েদের বলতেন জামাআতে যেয়ো না। তিনি নিজের বউকে বলতেন, তুমি মসজিদে যাও কেন! তুমি জানো না আমি এটা অপছন্দ করি? মাকরূহ মনে করি। أَنَا أَكْرَهُهُ। তাঁর স্ত্রী বলতেন, আপনি আমাকে নিষেধ করেন, আর যাব না। তিনি বলতেন, না, আমি তোমাকে নিষেধ করতে পারব না। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মেয়েরা মসজিদে গেলে নিষেধ কোরো না। উমার رضي الله عنه এর ছেলে আব্দুল্লাহ ইবন উমার رضي الله عنه, তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর ছেলে তাঁর ছেলেকে বলছেন, নবীজি ﷺ বলেছেন, মেয়েরা মসজিদে যাবে। আব্দুল্লাহ ইবন উমারের নাতিছেলে বলছে, আমি আমার বউ-মেয়েকে মসজিদে যেতে দেব না। ওরা মসজিদে গিয়ে বেহায়া হবে। বাপ তখন ছেলের বুকে ধাক্কা মেরে উল্টে দিয়েছে। বলেছে, তোর সাথে আর জীবনে কথা

বলব না। আমি নবীর হাদীস বললাম আর তুই নবীর হাদীসের বিপরীত তোর কথা বলিস! তোর সাথে আর কথাই বলব না। কাজেই, মেয়েদের মসজিদে যাওয়া সাহাবিদের যুগে নিষেধ ছিল, এই ইলমটা আমার নেই। তারা বেহায়া বেপর্দার আপত্তি করতেন। আয়িশা ﷺ বলেছেন, নবীজি যদি জানতেন, মেয়েরা এমন বেহায়া-বেপর্দা হবে, তাহলে নিষেধ করে দিতেন। তিনি বেয়াদবি করতে, বেহায়া হতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু তিনি নিজেও মসজিদে জামাআতে নামায পড়েছেন। তাঁর সময়ের মেয়েরাও জামাআতে পড়েছে। তিনি মেয়েদের নিয়ে আলাদা জামাআত করেছেন। পুরুষের পেছনে তারাবীহ জামাআতে পড়েছেন। বিভিন্ন ঘটনা আছে।[২] তাই এই বিষয়গুলো ফিতনার কারণে নিষেধ করা ঠিক আছে। কিন্তু সাধারণভাবে হারাম নাজায়িয বলা কখনোই ছিল না। আর আপনি ঠিকই বলেছেন। এখন তো কঠিন সময়। প্রথম কথা হল, সাহাবিদের যুগে নিষেধ ছিল এটা ঠিক না। তাবিয়ীন, তাবি'-তাবিয়িদের যুগে তারা ফিতনার কারণে আপত্তি করেছেন।

আপনারা যদি তাবিয়িদের মতো হতে পারেন, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। একটা মেয়ে কোনো সময় বাইরে যাবে না। তাহলে মসজিদেও যাবে না। সাতক্ষীরার একটা মাহফিলে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, মেয়েদের জামাআতে নামায পড়া কী? আমি বললাম, কোন মেয়ের কথা বলছেন? যে মেয়ে সবসময় ঘরে থাকে, তার ঘরে নামায পড়া উত্তম। বাইরে গেলে সাওয়াব কম হবে। বেপর্দায় গেলে হারামের গোনাহ হবে। কিন্তু আমাদের সময়ে তো মেয়েরা সবাই বাইরে। মাগরিবের আযান হয়েছে, ঝিনাইদহ বাজারের ভেতর পাঁচশ' মেয়ে, এখন তারা কোথায় নামায পড়বে? তাদের মাসআলাটা আলিমগণ বলুন। এক নাম্বার মাসআলা, নামায কাযা করবে। ঠিক তো? নামায পড়বে না? কোন হাদীসে আছে যে, মেয়েদের আল্লাহ ঘরে থাকতে বলেছেন, ওরা থাকে নি তাই নামায পড়তে পারবে না? পুরুষদের আল্লাহ দাড়ি রাখতে বলেছেন, তারা দাড়ি রাখে নি, তাই মসজিদে যেতে পারবে না? পুরুষদের আল্লাহ হালাল খেতে বলেছেন, কিন্তু হারাম খেয়েছে, কাজেই মসজিদে যেতে পারবে না? আছে নাকি এমন বিধান? একটা হারাম করার জন্য নামাযের অধিকার বঞ্চিত হয়, এমন আছে নাকি? হাজার হাজার মেয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন। মাগরিবের ওয়াক্তে, আসরের ওয়াক্তে তারা হাটে-ঘাটে, অফিসে-আদালতে, বাজারে আছে। তারা হয়ত নামায কাযা করবে। অথবা রাস্তাতেই নামায পড়বে। অথবা মসজিদে নামাযের জন্য তাদের আলাদা ব্যবস্থা থাকবে। এটার ভেতর কোনটা উত্তম বা কোনটা সঠিক, আপনারা আলিমদের থেকে জেনে নেবেন। মেয়েদেরকে আমরা মসজিদে যেতে উৎসাহ দিই না। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর

---

[২] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-৯০০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৪৪২, ৪৪৫; সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-৫৬৫-৫৭০; মুআত্তা মালিক, হাদীস নং-৫৪২

মতো অনুমোদন রাখছি। মেয়েরা বাইরেই আছে। তাদেরকে কিছু ওয়ায নসীহতের চেষ্টা করি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে মেয়েরা জুমুআর নামাযের অনুমতি চাইল অনেক বছর আগে। তখন সিদ্দীক সাহেব বেঁচে ছিলেন। তখন অনেকেই বললেন, এটা ফিতনা হবে। জায়িয হবে না। কথা ঠিক। ফিতনা হলে নাজায়িয হবে। কিন্তু ফিতনা হবে নাকি ফিতনা কমবে, একটু ভালো করে বোঝেন। আমাদের মেয়েরা শুক্রবারে একটা ছেলে একটা মেয়ে একটা ছেলে একটা মেয়ে গাছতলায় বসে থাকে। এখনো থাকে শুক্রবারে। মেয়েরা বলল যে, স্যার, শুক্রবারের দিন আমরা সকাল নয়টা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত গাছতলায় বসে থাকি। আমরা এখন থেকে এগারোটা বারোটা পর্যন্ত থাকব। এরপরেই আমরা মসজিদে যাব। তো ফিতনা বাড়ল না কমল? মেয়েদের যদি আমরা ঘরে রাখতে পারি, আলহামদুলিল্লাহ। এসব মেয়ে মসজিদের অজুহাতে বেরোবে না। বেরোলে ফিতনা হবে। কিন্তু মেয়েরা তো বেরিয়েই গেছে, ঘরে তো কেউ নেই। ফিতনা তো যা হওয়ার হয়ে গেছে। ফিতনা তো মসজিদে হয় না। ফিতনা হচ্ছে ঘরের ভেতর। ফিতনা হচ্ছে রাস্তায়। ফিতনা হচ্ছে স্কুলে, দরজা বন্ধ করে। অফিসে-আদালতে হচ্ছে। বাসে-ট্রেনে হচ্ছে। ফিতনা সব জায়গায়। শুধু মসজিদেই ফিতনা হয় না। এ জন্য মসজিদে তাদের অনুমতি রাখা বৈধ। তবে তাদের মসজিদে আসার উৎসাহ আমরা কখনোই দিই না। তবে তারাবীহর নামাযের ব্যবস্থা সাহাবিদের যুগ থেকে ছিল। আমরাও রাখি। আর আমরা বরং পুরো তারাবীহ পর্দার ওয়ায করি। মেয়েগুলো এসেছেন, তাদেরকে একটু বলেকয়ে যদি দীনটা শেখানো যায়।

প্রশ্ন-৩০৪: স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করি। অনেক সময় ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও চোখের গোনাহ হয়ে যায়। মনটা দুনিয়ামুখি হয়ে যায়। এই পরিবেশে কীভাবে মনকে নিয়ন্ত্রণ করব?

উত্তর: এটা তো খুবই স্বাভাবিক। এই যে খারাপ লাগছে তোমার, এটা প্রমাণ করে তোমার ঈমানটা ভালো আছে। তাজা আছে। নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আজকে যেটা মসজিদে বলেছিলাম, ইলম, যিকির, সোহবত, মুহাব্বত। বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করতে হবে। এটাতে মনের উপর জোর বাড়বে। আত্মনিয়ন্ত্রণ বাড়বে। সুন্নাত যিকির করবে সব সময়। বেশি বেশি ইলম অর্জন করতে হবে। প্রতিদিন কিছু কুরআন-হাদীসের ইলম অর্জন করলে মনটা আল্লাহমুখি হবে। ভালো আলিমদের সোহবত নিতে হবে মাঝেমাঝে। তাদের কাছে বসতে হবে। দীনি প্রোগ্রামে যেতে হবে। ইনশাআল্লাহ, এইভাবে চলতে থাকলে...। কিছু ভুল তো হবেই। আল্লাহর কাছে তাওবা করতে হবে। হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই।

প্রশ্ন-৩০৫: বয়স হলে তো চুল-দাড়ি পাকবেই। আমার জানা মতে চুল-দাড়িতে কলপ নেয়া জায়িয নয়। আবার বাজারে বিভিন্ন ধরনের কলপ মেহেদির নামে পাওয়া যাচ্ছে, যাতে ক্যামিক্যাল থাকে। আমি দূর-দর্পণের (Television) সাহায্যে দেখেছি অমুসলিমরা এগুলো ব্যবহার করে। এগুলো কি আমাদের ব্যবহার করা ঠিক? যদি আমরা এগুলো ব্যবহার করি তাহলে অমুসলিমদের সাথে আমাদের পার্থক্য থাকল কোথায়?

উত্তর: আমাদের সাথে অমুসলিমদের পার্থক্য নেই তো! হিন্দুরা ভাত খায়, আমরাও ভাত খাই। তাহলে আমরাও হিন্দু। হিন্দুরা ঘরে ফ্যান লাগায়, আমরাও লাগাই। কোনো পার্থক্য নেই। এটা কোনো চিন্তা হল নাকি! আমাদের সাথে অমুসলিমদের পার্থক্য হবে ঈমানে, আমলে, চরিত্রে, সততায়। দীনের ব্যাপারে তাদের অনুকরণ করা হারাম। অর্থাৎ যেটা দেখলেই, প্রথমেই অমুসলিম মনে হয়। যেমন আপনি টিকি রেখেছেন। ধুতি পরেছেন। ঠিক ইয়াহুদিদের মতো একটা টুপি পরেছেন। যেটা দেখলেই, প্রথমেই আপনাকে অমুসলিম মনে হয়, সেটা হারাম। অমুসলিমদেরকে অনুকরণ করা মানে কী? তারা চেয়ারে বসে, তাই আমরা বসলে কি কাফির হয়ে যাব? রাসূলুল্লাহ ﷺ কালো ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। কালো ছাড়া বাকি রঙ ব্যবহার করা জায়িয।[৩] কাজেই আমরা জোর করে এগুলো নাজায়িয বলব কেন! আমরা যে কাপড় দিয়ে জামা বানাই, প্যান্ট বানাই– অমুসলিমরাই তো বানিয়েছে এগুলো। তাই বলে কি নাজায়িয হয়ে যাবে?

প্রশ্ন-৩০৬: আমি দাড়ি রেখেছি। এখনো একমুষ্টি পরিমাণ হয় নি। সৌন্দর্যের জন্য আমি কি দাড়ি ছাটতে পারব?

উত্তর: রাসূলুল্লাহ ﷺ দাড়ি বড় রাখতে বলেছেন। ছোট দাড়িতে সুন্নাত পুরা আদায় হয় না। এ জন্য সবারই দাড়ি রাখার, দাড়ি বড় করার চেষ্টা করতে হবে। সৌন্দর্যের চেতনাটা আপেক্ষিক। যেমন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক মেয়ে আছে খুব সেজেগুজে অর্ধেক ন্যাংটো হয়ে থাকে। অনেক প্রফেসর বলে এটা সুন্দর। কিন্তু আমার কাছে পেত্নী পেত্নী মনে হয়। দেখলেই জানের মধ্যে অস্থির লাগে। আবার অনেক মেয়ে বোরকা পরে। আমার কাছে খুব সুন্দর লাগে। আবার অনেক প্রফেসরের এটা খারাপ লাগে। আপনি কার দৃষ্টি দিয়ে দেখছেন, উমারের দৃষ্টি দিয়ে নাকি আবু লাহাবের দৃষ্টি? সেটাই হল আসল। দৃষ্টিভঙ্গি যখন পাল্টে যাবে, আপনার সৌন্দর্যের চেতনাও পাল্টে যাবে। তো আমরাও রাসূল ﷺ এর চোখে সুন্দর হয়ে উঠি না কেন! পারস্য থেকে দাড়ি চাঁছা দূত এসেছে, নবীজি ﷺ তাদের দিকে

[৩] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-৪২১২; সহীহ বুখারি, হাদীস নং-৫৮৯৯।

তাকাতে রাজি হন নি। এ জন্য বড় করেই রাখতে হবে। সৌন্দর্য ভালো। এদিক ওদিক চলে গেলে একটু ছোট করেন। কিন্তু দাড়িটা লম্বা করে রাখাটাই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাত। যারা একেবারেই অপারগ, ছোট করে রেখেছেন, তারা চেঁছে ফেলার হারাম থেকে বেঁচেছেন। কিন্তু বড় রাখার চেষ্টা করতে হবে। বিশেষ করে যুবক বয়সে দাড়ি রাখতে হবে যাতে দুষ্টু বন্ধুরা কাছে ভিড়তে না পারে।

প্রশ্ন-৩০৭: মাথা বা দাড়িতে কালো রং লাগালে জান্নাতের নিকটেই যেতে পারবে না– এই কথাটা সঠিক কি না? এর দ্বারা কি সকল নেকআমল বাতিল হয়ে যাবে?

উত্তর: এটা হাদীসে আসছে। কালো রং নেয়া, এটা হারাম পর্যায়ের গোনাহ। বড় গোনাহ হিসেবে বলা হয়েছে যে, সে জান্নাতে যেতে পারবে না।[৪] তবে এই গোনাহের কারণে নেকআমল সব বাতিল হয়ে যাবে, এমন নয়। চুল দাড়িতে কালো রঙ নেওয়া গোনাহের কাজ।

প্রশ্ন-৩০৮: সুন্নাত মোতাবেক দাড়ি-মোচ কেমন হবে?

উত্তর: দাড়ি বড় হবে আর গোঁফ ছোট হবে। গোঁফ একেবারে চেঁছে ফেলা, কেউ কেউ জায়িয বলেছেন। কেউ কেউ মাকরুহ বলেছেন।

প্রশ্ন-৩০৯: টাই পরার বিধান কী?

উত্তর: আমার কাছে জোরালো মত হল টাই পরা নাজায়িয। আমার পোশাক বইটা পড়বেন।

প্রশ্ন-৩১০: অনেকে বলে, মাথা টাক করা সুন্নাত। যে সাহাবিরা মাথা টাক করতেন রাসূলুল্লাহ ﷺ কি তাদের জন্য দুআ করতেন?

উত্তর: মাথা টাক সুন্নাত নয়। সাহাবিরা কখনোই মাথা টাক করেন নি হজ্জ ছাড়া। হজ্জে যারা মাথা টাক করতেন, তাদের জন্য রাসূল ﷺ দুআ করেছেন। একমাত্র আলী رضي الله عنه নবীজি ﷺ এর পরে মাথা টাক করতেন। এছাড়া কোনো সাহাবি হজ্জ ছাড়া কখনোই মাথা টাক করতেন না। সবাই বড় বড় চুল রাখতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও বড় চুল রাখতেন। এ জন্য চুল বড় রাখাই সুন্নাত। মাথা টাক করা জায়িয বা মুবাহ। চুল একটা মুআমালাত। কাপড়ের মতো। কাপড়ের পকেট কোনদিকে হবে, ডানে না বামে, হাতা কতটুকু হবে, ঝুল কতটুকু হবে, ফাড়া হবে, না গোল

---

[৪] মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-২৪৭০; সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-৪২১২; সুনান নাসায়ি, হাদীস নং-৫০৭৫।

হবে– এটা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্ধারিত কোনো নির্দেশ নেই। সতর ঢাকলেই হয়ে গেল। আর কিছু নিয়ম আছে, যেগুলোর ভেতর যাওয়া যাবে না। বেশি পাতলা পরা যাবে না, সতর খোলা যাবে না, ইহুদি নাসারা বা অমুসলিমদের অনুকরণ করা যাবে না। এছাড়া বাকি সব আমাদের জন্য উন্মুক্ত। একজন আছে, ইমামের জামা গোল না হলে তার পেছনে নামায পড়ে না। রাসূল ﷺ গোল পরতেন। কিন্তু গোলের নিচে কোনো পায়জামা লুঙ্গি পরতেন না। তাহলে সুন্নাত হল, লুঙ্গি বাদ দিয়ে গোল জামা পরব। লুঙ্গিও তো বিদআত হয়ে যাবে! রাসূলুল্লাহ ﷺ গোল জামার নিচে পায়জামা বা লুঙ্গি পরেছেন, কোথ্থাও নেই। সাহাবিরা শুধু জামা পরতেন, পায়জামা লুঙ্গি পরতেন না, অনেক হাদীস আছে। শেষের দিকে কেউ কেউ পরতেন। এই জন্য ভাইয়েরা, আমাদের বুঝতে হবে, পোশাকের ব্যাপারে, চুল কাটার ব্যাপারে নবীজি ﷺ নিষেধ করেছেন, এমন পর্যায়ে না যাওয়া পর্যন্ত মুবাহ।

প্রশ্ন-৩১১: বাংলাদেশের শহর-গ্রামে মেয়েরা সাইকেল চালাচ্ছে। বাবা-মা এ ব্যাপারে মেয়েদেরকে উৎসাহ দিচ্ছে। মেয়েরা কি সাইকেল চালাতে পারবে? এক্ষেত্রে শরীআতের বিধান কী?

উত্তর: এটা হল আমাদের দেশীয় ইসলামের অনুভূতি। আমরা মাথার চুল খুললে কেউ মাইন্ড করি না। সাইকেল চালালে মাইন্ড করি। মাথার চুল খোলা, কান বেরিয়ে থাকা বড় হারাম নাকি সাইকেল চালানো বড় হারাম? আমাদের পুরুষদের জামা হল বড় কলারের। আর মেয়েদের জামার কলারই নেই। এতে আমরা কেউ মাইন্ড করি না। মাথার চুল খুলে রাখা ১০০% হারাম। মহা কবীরা গোনাহ। সাইকেল চালানো কোনো গোনাহর কাজ নয়। কিন্তু যেহেতু এটা আমাদের সমাজে প্রচলিত নেই, তাই এটা নাজায়িয!! আর অন্যগুলো যেহেতু আমরা করি, তাই ওগুলো জায়িয! সাইকেল চালানো, গাড়ি চালানো, উটে আরোহণ করা নাজায়িয হবে কেন? যদি পর্দার সাথে করে জায়িয আছে। মেয়েরা বোরকা ছাড়া চলাকে কিন্তু কেউ খারাপ বলছে না। আমি একবার রাগ করে বলেছিলাম, এইসব হাতাকাটা জামা পরার চেয়ে মেয়েদের প্যান্ট-শার্ট পরা ভালো। এটা নাজায়িয হলেও হারামটা কম হয়। এতে শরীর বেশি ঢাকা থাকে। তো যাই হোক, মেয়েদের জন্য সাইকেল চালানো নাজায়িয কিছু নয়। তারা পর্দার সাথে সাইকেল চালাতে পারে, মোটরসাইকেল চালাতে পারে।

প্রশ্ন-৩১২: ছেলেদের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার ক্ষেত্রে মাপকাঠি কোনটা? পনোরো বছর বয়স হওয়া নাকি স্বপ্নদোষ হওয়া?

উত্তর: স্বপ্নদোষ হওয়াটাই মাপকাঠি। হুলুম, ইহতিলাম। এটা দোষের কিছু নয়। মেয়েদের জন্য আল্লাহ সাবালিগ হওয়ার একটা ন্যাচারাল ব্যবস্থা রেখেছেন। ছেলেদের জন্যও আল্লাহ সাবালিগ হওয়ার ন্যাচারাল একটা ব্যবস্থা রেখেছেন। বরং যদি এই দোষ না ঘটে, তাহলে টেনশন করা উচিত। ছেলেদেরকে আপনারা দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। তারা তাদের সাবালিগ হওয়ার কথা মা-বাবার কাছে বলতে পারে না। তখন কী করে? দুষ্ট বন্ধুদেরকে গুরু বানায়। আপনি ছেলেমেয়েকে জিজ্ঞেস করবেন। তাদের সুবিধা অসুবিধাগুলো জানবেন। এটা তো কোনো দোষের কিছু নয়। আপনি তখন বলবেন, আলহামদুলিল্লাহ, এখন তুমি নবী ﷺ এর সত্যিকারের উম্মাত হলে।

প্রশ্ন-৩১৩: পনেরো বছরের নিচে যদি কারো স্বপ্নদোষ না হয়, কিন্তু নাভির নিচে লোম গজায় তাহলে কি প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে বিবেচিত হবে?

উত্তর: জি হবে। এটাও হবে। উলামাদের এই ব্যাপারেও বক্তব্য আছে।

হালাল/হারাম

প্রশ্ন-৩১৪: হাদীসে নাকি এসেছে, যে খুন করে এবং যে খুনি, উভয়ই নাকি জাহান্নামি। কিন্তু কেন?

উত্তর: এটা সব সময় নয়। যেমন আপনারা জানেন, গত কিছুদিন আগে চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গায় জোরে আমীন আর আস্তে আমীন নিয়ে মুসলিমরা মারামারি করে একজন শহীদ হয়ে গেছেন। এই শহীদ যে জাহান্নামে যাবে, এটা বলা যাবে। কারণ আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ

যদি দুজন মুসলিম একে অপরকে মারার জন্য অস্ত্রধারণ করে, এই ক্ষেত্রে যে মারবে আর যে মরবে দুজনই দোজখে যাবে। সাহাবিরা প্রশ্ন করলেন– যে খুন করবে সে দোযখে যাবে বুঝলাম, কিন্তু যে খুন হবে সে কেন যাবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কারণ সেও তো খুন করার ষোলআনা নিয়্যাত নিয়ে এসেছিল। পারে নি বলে খুন হয়েছে।[১]

প্রশ্ন-৩১৫: একজন বিধর্মী আমাকে কুরআন কিনে দিতে বলেছেন। তিনি পরে টাকা আমাকে পরিশোধ করবেন। প্রশ্ন হল, কোনো বিধর্মীকে কুরআন শরীফ কিনে দেয়াতে আমার কোনো গোনাহ বা সাওয়াব হবে কি না?

উত্তর: আপনি অনুবাদ কিনে দেবেন। বলবেন, আপনি তো আরবি বুঝবেন না। এটা দাওয়াতের কাজ। তিনি যদি পড়তে চান, আলহামদুলিল্লাহ।

প্রশ্ন-৩১৬: ফুটবল খেলা দেখা হারাম কি না?

উত্তর: হারাম না হলেও মাকরুহ তো হবেই। তবে ওই যে হাফপ্যান্ট পরে, ওটা দেখা হারাম। টিভির স্ক্রিনে মহিলাদের দেখা যায়, ওগুলো দেখা হারাম।

প্রশ্ন-৩১৭: বেতনভুক্ত ইমামের পেছনে নামায নাজায়িয– এমন কোনো সহীহ হাদীস আছে কি না?

উত্তর: এটা কোনো সহীহ হাদীস নয়। এটা শয়তানের হাদীস। যারা মুসলিম উম্মাহর নামায নষ্ট করতে চায়, অথবা যারা ইয়াহুদিদের থেকে বেতন নিয়ে নামায

---

[১] সহীহ বুখারি, হাদীস-৩১; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৮৮৮; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪২৬৮; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৪১২০; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৩৯৬৫।

পড়াতে চায় তারা এগুলো বলে। বেতনভূক্ত ডিসির পেছনে যদি চলা যায়, বেতনভূক্ত মেয়রের পেছনে যদি চলা যায়, ইমামের পেছনে চলতে দোষ কী! ইমাম আসমান থেকে খাবে নাকি! ডিসি-এসপি-পুলিশের মতো ইমামের বেতন দেয়ার দায়িত্ব ছিল রাষ্ট্রের। ইমামতি করে বেতন নিয়েছেন আবু বাকর ﷺ। তাহলে আবু বাকরের পেছনে নামায হয় নি? বেতন নিয়েছেন উমার ﷺ, ইমামতি করে; রাষ্ট্রের ইমামতি, মসজিদের ইমামতি। বেতন নিয়েছেন আলী ﷺ। ইসলামের মূল ইমামতি তো মসজিদের ইমামতি। মসজিদের ইমামই রাষ্ট্র চালিয়েছেন। এবং এই ইমামতির জন্য বেতন নিয়েছেন। বিষয়টা হল, বেতন দেবে রাষ্ট্র। কুরআন-হাদীসে কোথাও নেই যে বেতনভূক্ত ইমামের পেছনে নামায হবে না। এটা শয়তানের বানানো কথা। মূলনীতি হল, যে কাজ আমার উপর ফরয, সেটার জন্য আমি পয়সা নিতে পারি না। যেমন আপনি এসে বললেন যে, হুযুর, রোযা রেখে মিসওয়াক করলে কি রোযা ভাঙবে? আমি বললাম, না, ভাঙবে না। মাসআলা বললাম এর জন্য দশটাকা দেন। এই দশটাকা নেয়া আমার জন্য জায়িয হবে না। কারণ আমার উপর ফরয হল, মাসআলা বলা। কিন্তু আপনি বললেন, হুযুর, আমার বাড়িতে গিয়ে আমার ছেলেমেয়েকে কুরআন শেখাতে হবে। আমি বললাম যে, মাসে তিনশ টাকা দিতে হবে। কারণ আপনার বাড়িতে গিয়ে কুরআন শেখানো আমার কাজ নয়। ওটা আপনার উপর ফরয। আমি আপনাকে সাহায্য করছি, আমি টাকা নিতে পারি। আমার উপর ফরয পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া জামাআতে। আমার যেখানে সময় হবে, মসজিদে নামাযে দাঁড়িয়ে যাব। কিন্তু আপনার মসজিদে এসে আপনার মসজিদের শৃঙ্খলা রক্ষা করা এটা আমার দায়িত্ব নয়। এটা রাষ্ট্রের দায়িত্ব, সমাজের দায়িত্ব। সমাজের পক্ষ থেকে মসজিদ কমিটির দায়িত্ব। কাজেই ইমাম বেতন নিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আবার আরেকটা ব্যাপার আছে। অনেকে বলে, আরে কার পেছনে নামায পড়ব! অমুক ইমামের পেছনে নামায পড়লে কি নামায হবে! আপনি কি বলেন কখনো, আরে কার হাতে ট্যাক্স দেব! ট্যাক্স দিলে তো ওরা দুর্নীতি করবে। ট্যাক্সই আর দেব না। আপনার উপর আল্লাহ ওয়াজিব দায়িত্ব দিয়েছেন, আপনি জামাআতে নামায পড়বেন। ইমাম কে, এটা আপনার জানার বিষয় নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে গেছেন, ইমাম ভালো হোক মন্দ হোক, জামাআতে নামায পড়া তোমার দায়িত্ব। আর ইমাম নিয়ন্ত্রণ করবে মসজিদ কমিটি বা প্রশাসন। তারা যদি অযোগ্য ইমাম রাখে, তারা গোনাহগার হবে। কিন্তু আপনি ইমামের ওজুহাতে মসিজদে জামাআত ত্যাগ করতে পারবেন না। রাসূল ﷺ নিজে বলে গেছেন, মদখোর ইমাম হলেও তোমাকে জামাআতে নামায পড়তে হবে।

প্রশ্ন-৩১৮: আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, 'যারা আমার আয়াত স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে

তারা আগুন দ্বার পেট ভর্তি করে'। তাহলে ওয়ায করে কীভাবে টাকা নেয় বক্তারা?

উত্তর: এই আয়াতগুলো সবই ইয়াহুদিদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। এবং আমাদের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য, সেটা হল, আল্লাহর কোনো বিধানকে ঘুরিয়ে দুনিয়ার স্বার্থে আল্লাহর বিধান বিকৃত করা– এটা করা যাবে না। আল্লাহ বলেছেন হাত কাটো, আমি বললাম, না, একটা চুল কাটলেই হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেছেন যে নামায না পড়লে তার এই বিধান; আমি বললাম নামায না পড়লেও সে বিরাট কিছু। দুনিয়ার স্বার্থে আল্লাহর হুকুম পরিবর্তন করা হয়, সেটা হল:

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا[২]

যেটা ইয়াহুদিরা করত। এবং আমাদের মুসলিমদের ভেতরেও এটা আছে। ওয়ায করে টাকা নেয়ার কয়েকটা পর্যায় আছে। প্রথম কথা হল, ওয়ায করে টাকা নেয়া খুবই জরুরি। তার কারণ হল, ওয়ায মাহফিল দেয়া হয় গান শোনার জন্য। যার যত সুর আছে, যে যত মিথ্যা কথা বলতে পারে, তার তত দাম বেশি। এই সুর এবং মিথ্যা কথার ওয়ায যারা করেন, তারা জানেন যে, আল্লাহর কাছে কিছু পাবেন না। দুনিয়ায় যদি কিছু না নেন, তাহলে তো দুনিয়াও গেল, আখিরাতও গেল। কাজেই আপনারা ওয়ায মাহফিল দেন গান শোনার জন্য। তো টাকা তো নেবেই। দুই নাম্বার কথা, ওয়ায কয়েক প্রকার। একটা হল মূল দাওয়াত। ভাই নামায পড়েন। রোযা রাখেন। এগুলো আমাদের উপর ফরযে আইন বা ফরযে কিফায়া। আর তা'লীম দেয়া। শিক্ষা দেয়া। মাসআলা-মাসায়িল, দীনের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেয়া...; শিক্ষা দেয়ার জন্য শিক্ষক টাকা নিতে পারেন। কারণ শিক্ষা আপনার উপর ফরয, আপনাকে শেখানো আমার উপর ফরয নয়। আপনার বাড়িতে গিয়ে কুরআন শিখিয়ে আসব, অঙ্ক শিখিয়ে আসব, বাংলা শিখিয়ে আসব– আমি টাকা চাইতে পারি। ঠিক তেমনি আপনি একজন শিক্ষককে ডেকে নিয়ে গেলেন, ভাই আপনি আমাদের ওখানে গিয়ে চারঘণ্টা দীন শেখাবেন, আমরা আপনাকে এত টাকা বেতন দেব। এটা নাজায়িয নয়। তবে কেউ যদি শুধু টাকার নিয়তে এটা করে তাহলে তিনি সাওয়াব পাবেন না। আপনারা ভালো আলিমদেরকে, সমাজের পরিচিত শিক্ষিত, উচ্চ শিক্ষিত বিভিন্ন মাদরাসার মুহতামিম, শাইখুল হাদীস তাদেরকে যখন দাওয়াত দেবেন, সুর-সার ছাড়া ভালো কথা শুনবেন, টাকাও তারা চান না, আপনি গাড়ি ভাড়াটা দিয়ে দিলেই চলে। কিন্তু এখানে নষ্ট হয়েছেন আপনারা। আপনারা গান (অর্থাৎ সুর) শোনার জন্য ওয়ায মাহফিল করেন, গায়করা তো টাকা নেবেই। গায়কের কাজই তো টাকা নেয়া।

---

[২] সূরা: [২] বাকারা, আয়াত: ৪১; সূরা: [৫] মায়িদা, আয়াত: ৪৪।

প্রশ্ন-৩১৯: শরীরের অবাঞ্ছিত লোম চল্লিশদিন অতিবাহিত হলে হারাম হবে কি না? এই অবস্থায় নামায পড়লে কি নামায হবে?

উত্তর: না। হারাম নয়। তবে পরিষ্কার করে ফেলা ভালো। উচিত। নামায অবশ্যই হবে। এটা পরিষ্কার করা সুন্নাত। বড় হয়ে গেলে কিছুটা মাকরুহ হবে, তবে নামাযের কোনো ক্ষতি হবে না।

প্রশ্ন-৩২০: কোন কোন অবস্থায় সালাম দেয়া নিষেধ? আযান চলাকালে কাউকে সালাম দেয়া যাবে কি না?

উত্তর: এই প্রশ্নটা ভালো। ব্যবহারিক প্রশ্ন। আমরা সাধারণত ঝগড়ার প্রশ্ন বেশি করি। ব্যবহারিক প্রশ্ন কম করি। কেউ যদি বাথরুমে থাকে অথবা উলঙ্গ অবস্থায় থাকে, এই সময় সালাম দেয়া যায় না। বাকি আমরা মনে করি আযানের সময় সালাম দেয়া যায় না– এরকম কোনো হাদীস বা ফিকহ্ নেই। আযানের সময় আযানের জবাব দিতে হয়। এর ফাঁকে সালাম দিলে গোনাহ হবে এমন না। খাওয়ার সময় সালাম দেয়া যায় না, এমন কোনো কথা হাদীস বা ফিকহে নেই।

প্রশ্ন-৩২১: নামায পড়া অবস্থায়, প্রস্রাবখানায় থাকার সময় এবং খাওয়ার সময় সালাম দেয়া যায় কি না? যদি যায়, কীভাবে উত্তর দেবে?

উত্তর: নামাযে সালাম দিলে ইশারা করার কথা হাদীসে আছে। আপনারা তো মনে করেন, সব্বোনাশ, নামায ভেঙে গেল! একবার ইসতিসকার নামায হচ্ছে, আসমা ﷺ এসেছেন। বলছেন, কী ব্যাপার, কীসের নামায? রাসূল ﷺ ইশারা করলেন। গ্রহণ লেগেছে। তিনি বললেন, এটা কি আল্লাহর কোনো নিদর্শন? ইশারায় বললেন, হ্যাঁ। তো যাইহোক, নামায পড়া ব্যক্তিকে সালাম দেয়া মাকরুহ। তাকে কেন সালাম দেবেন? সে তো উত্তর দিতে পারবে না। আর বাথরুমে থাকা অবস্থায়ও সালাম দেয়া মাকরুহ। কারণ ওই সময় উত্তর দেয়া অনুচিত। তিনি ওখান থেকে বেরিয়ে এসে উত্তর দিতে পারেন। খাওয়ার সময় সালাম দেয়াতে কোনো দোষ নেই। খাওয়ার সময় হাজার কথা বলছেন আর সালামের উত্তর দেবেন না? এটা বানোয়াট মাসআলা। এটা হাদীসেও নেই, ফিকহেও নেই। খাওয়ার সময় সালাম দেবেন, নেবেন। শুধুমাত্র ব্যতিক্রম হল, খাবার যদি গলার ভেতর থাকে, ওই অবস্থায় উত্তর দিতে গেলে যদি খাবার গলায় আটকে যাওয়ার ভয় থাকে, তাহলে ওই সময় উত্তর না দিয়ে খাবার গিলে ফেলার পর উত্তর দেবেন।

প্রশ্ন-৩২২: হিন্দুধর্মের কেউ যদি তাদের বিবাহে দাওয়াত দেয়, যাওয়া যাবে কি না?

উত্তর: সামাজিক ব্যাপারে সকল ধর্মের মানুষের সমান অধিকার। প্রতিবেশির যে অধিকার, আত্মীয়ের যে অধিকার, সহকর্মীর যে অধিকার– এটা সবাই সমানভাবে পাবে। এটা হিন্দু হোক, বোদ্ধ হোক, মুসলিম হোক– সমস্যা নেই। বিবাহটা ধর্মীয় কাজ নয়। সামাজিক কাজ। কাজেই বিবাহে যাওয়া যায়। তবে খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে, যেন হারাম খাবার না হয়। ঠিক তেমনিভাবে তারা অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া– এগুলো ইসলাম নির্দেশিত কাজ। কুরআন নির্দেশিত কাজ। وَاللهُ أَعْلَمُ

প্রশ্ন-৩২৩: বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য মসজিদের ভেতর পোস্টার লাগানো যাবে কি না?

উত্তর: জি না। মসজিদে এমন বিজ্ঞাপন দেখলে আল্লাহর কাছে দুআ করবেন– 'আল্লাহ, এই ব্যবসায় যেন বরকত না থাকে'। এটা হাদীসের শিক্ষা– 'মসজিদের ভেতরে যদি কেউ বেচাকেনার আলাপ করে, তোমরা বদদুআ করবে। যদি মসজিদে কেউ হারানো বিজ্ঞপ্তি দেয়, তার জন্য বদদুআ করবে, যেন সেটা পাওয়া না যায়'।[৩] এই জন্য মসজিদে বিজ্ঞাপন দিলে বদদুআ করবেন।

প্রশ্ন-৩২৪: দুর্গাপূজা উপলক্ষে আয়োজিত মেলায় ফার্নিচার তোলা যাবে কি না?

উত্তর: জি না। এটা তাদের ধর্মীয় উৎসব। তারা উৎসব পালন করবেন। তাদের উৎসবের সুযোগ দিতে হবে। তাদের উৎসবে কেউ বাধা দিলে তাকে আটকাতে হবে। কিন্তু আপনি অন্য ধর্মের ধর্মীয় উৎসবে যাবেন না।

প্রশ্ন-৩২৫: আল্লাহর নামে যবাই করতে গিয়ে ভুলক্রমে আল্লাহর নাম না নিয়েই যবাই করা হলে হালাল হবে কি না?

উত্তর: যদি আল্লাহর নামে যবাই করার নিয়্যাত থাকে, জবাই করার সময় ভুল হয়ে যায়, তাহলে জবাই হয়ে যাবে।

প্রশ্ন-৩২৬: জনপ্রতিনিধির নামে গীবত করা যাবে কি না?

উত্তর: জি না। কারো নামেই গীবত করা যাবে না। এমন কথা, যা তার সামনে বললে মাইন্ড করবে, এমন কথা পেছনে বলা যাবে না। তবে তাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের সমালোচনা করা যাবে। অমুকের এই নীতিটা ভুল– এভাবে বলা যাবে।

---

[৩] সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-১৩২১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৫৬৮; সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৭৩; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং-৭৬৭; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস নং-২৩৩৯।

প্রশ্ন-৩২৭: নিজের অধীনস্ত কর্মচারি যদি দুর্নীতি করে, তার গীবত করা যাবে কি না?

উত্তর: কী মুশকিল! গীবত কেন করবেন! কর্মচারিকে শাসন করবেন।

প্রশ্ন-৩২৮: হাঁস-মুরগির মেরুদণ্ডের ভেতর যে রগ থাকে তা খাওয়া জায়িয কি না?

উত্তর: হালাল পশু জবাই করার পর প্রবাহিত রক্ত ছাড়া আর কিছু হারাম, এরকম স্পষ্ট দলীল আমার জানা নেই। হারামের ব্যাপারে কোনো কোনো কথা ফিকহে পড়ছি। ফকীহদের কোনো দলীল আছে কি না আমার জানা নেই। ফকীহদের সাথে কথা বলতে হবে।

প্রশ্ন-৩২৯: গরম পানি দিয়ে মুরগির পালক ছাড়ানো যাবে কি না?

উত্তর: আশা করা যায়, দু-চার মিনিটের জন্য ছাড়ালে মুরগি হারাম হবে না।

প্রশ্ন-৩৩০: শরীআতে প্রাণির ছবি ঘরে রাখা নিষেধ রয়েছে। গাছপালারও যেহেতু প্রাণ আছে, সেহেতু গাছপালা ঘরে রাখা যাবে কি না?

উত্তর: গাছপালার প্রাণ আর প্রাণির প্রাণ এক নয়। গাছপালার প্রাণ রুহের প্রাণ নয়।

প্রশ্ন-৩৩১: অর্থনীতি, পদার্থবিদ্যা, সায়েন্স, ব্যাংকিং বিষয়ে অধিকাংশ পাঠ্যবই ইসলামবিরোধী। এ ছাড়া এগুলো শেখার পর হারাম চাকরি নিতে হয়। এ বিষয়ে পড়াশোনা করা শরীআতসম্মত কি না?

উত্তর: না, এগুলো শরীআতের বাইরে নয়। অর্থনীতি, পলিটিক্যাল সায়েন্স– এগুলোর মধ্যে কিছু কথা ইসলাম বিরোধী আছে। এটা বাস্তব। ঈমান রক্ষা করতে হবে। আর হালাল চাকরি নেয়ার চেষ্টা করতে হবে। এইসব বিষয়ে পড়া সরাসরি নাজায়িয নয়।

প্রশ্ন-৩৩২: 'কষ্ট করলে কেষ্ট মেলে'। কেষ্ট দ্বারা হিন্দুদের দেবতা বোঝায়। আমরা মুসলিমরা এটা ব্যবহার করতে পারব কি না? মুসলিমরা তো কেষ্ট বলতে দেবতা বোঝে না!

উত্তর: হ্যাঁ, এটা হিন্দুদেরই প্রবর্তন। আসলে মুসলিমদের এগুলো ব্যবহার না করাই উচিত। 'কেষ্ট' শব্দটা ব্যবহার না করা উচিত।

প্রশ্ন-৩৩৩: বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দশটায় শুরু হয়, চারটায় শেষ হয়। কিন্তু দেখা

যায়, সরকারের আইন রক্ষার তাগিদে নিয়মিত দুইটায় ছুটি দিয়ে খাতায় চারটা লেখা হয়। এটা কি ঠিক হচ্ছে?

উত্তর: গোনাহ হবে। মিথ্যা সব সময় গোনাহ। আমরা কোনো মিথ্যাকে জায়িয বলব না।

প্রশ্ন-৩৩৪: ইসলামের দৃষ্টিতে দিবস পালন করা কোন পর্যায়ের শিরক?

উত্তর: দিবস বলতে কোন দিবস তা তো বলেন নি। দিবস পালন করলে শিরক হবে কেন? দিবস পালন করা বিদআত হতে পারে। গোনাহ হতে পারে। শিরক হওয়ার কথা নয়।

প্রশ্ন-৩৩৫: হারাম উপার্জনকারীর বাড়িতে খাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ কী?

উত্তর: হারাম খাওয়া নিষেধ। হারাম দ্বারা পেটে খাবার যাওয়া নিষেধ। হারাম উপার্জনকারীর খাবার তো হারাম। তাই তার বাড়িতে খাওয়া যাবে না।

প্রশ্ন-৩৩৬: সয়াবিন ফল কি খাওয়া জায়িয আছে?

উত্তর: জি, সয়াবিন নামে বাদামের মতো এক ধরনের ফল পাওয়া যায়। খাওয়া জায়িয আছে।

প্রশ্ন-৩৩৭: জমি বন্ধক রাখার বৈধ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর: জমি বন্ধক রাখলে খায়-খালাসি করবেন। অর্থাৎ প্রতি বছর জমি ব্যবহার বাবদ এত টাকা কাটা যাবে, এমন চুক্তি করে নেবেন।

সুদ/ঘুষ/ব্যাংকিং/ব্যবসা

প্রশ্ন-৩৩৮: সুদভিত্তিক ব্যাংকে চাকরি করি। বেতনের টাকা দিয়ে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করি। এটা বৈধ কি না?

উত্তর: সুদভিত্তিক ব্যাংকে চাকরি করা অবৈধ। সুদ লেখার কাজ অবৈধ। সুদের সাক্ষী হওয়া অবৈধ। বেতনের বিভিন্ন দিক রয়েছে। প্রশাসনিক কাজকর্ম বৈধ হতেও পারে। তবে এর ভেতরে হারামও জড়িয়ে রয়েছে।

প্রশ্ন-৩৩৯: আমি চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পর যে আর্থিক সুবিধা পাব, তখন প্রাপ্ত টাকা দিয়ে বৃদ্ধ বয়সে ব্যবসা করা সম্ভব নয়। পোস্ট অফিস বা ব্যাংকে রাখা যাবে কি না?

উত্তর: চাকরিতে শেষ বয়সে টাকা পাওয়া যায়। যে বয়সে তারা পান, এই বয়সে ব্যবসা করার মতো কোনো সুযোগ আর থাকে না। টাকা হাতে থাকলে বউ-বাচ্চা, ছেলে-মেয়ে, জামাইরা হয় কেড়ে নেবে, নয়ত খরচ হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে তারা কী করবেন? আমাদের সমাজে যত ব্যাংক রয়েছে, সবই সুদ। ক্লিয়ার সুদ। তারা সুদের ক্ষেত্রে কোনো দ্বিমত করে না। সুদ খাচ্ছেন, সুদ দিচ্ছেন। অনেক সময় কিছু মানুষ প্রতারণামূলকভাবে অথবা মূর্খতার কারণে বলেন, সুদ আর রিবা আলাদা। যেমন আপনারা কি একমত প্রধানমন্ত্রী আর প্রাইম মিনিস্টার আলাদা? আলাদা নয়। দুজনই এক। তো সুদ আর রিবা আলাদা, এক নয়– এর চেয়ে মূর্খতা আর কী হতে পারে! মানুষের মূর্খতা প্রকাশের জায়গা আছে। সেটা হল, ইসলাম সম্পর্কে যা খুশি বলবেন আন্দাযে, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু ডাক্তারির ব্যাপারে মূর্খতার কথা বলে না। ভুলভাল বললে ঠকে যেতে হয়। যারা আরবি জানে, যারা ইসলামের পরিভাষা জানে, যারা কোরআন-হাদীস জানে, তারা জানে যে আমরা যাকে সুদ বলি এটাই হল কুরআনে রিবা। যেটা হারাম। তো সকল ব্যাংকই সুদভিত্তিক। আমি মুসলিম, জেনেশুনে কীভাবে সুদ খাব! কিছু ব্যাংক ইসলামি শরীআহ মতো চলার দাবি করে। তাদের সিস্টেম হল, তারা টাকা দেয় না। মাল কিনে দেয়। অন্যান্য সকল ব্যাংক আপনাকে টাকা দিয়ে লাভ করার জন্য সুদ কষবে। কিন্তু ইসলামি ব্যাংক বলে, আমরা টাকা দেব না, মাল কিনে দেব। মালের উপর লাভ নেয়া শরীআতে জায়িয। বাকির কারণে দাম বাড়ানো শরীআতে জায়িয। এটা ব্যবসা। আপনারা হয়ত বলতে পারেন, সবই তো একই হল। এক মনে হলেও শরীআহ এক বলে না। যেমন একটা গরু বা ছাগল বা মুরগি বাসে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। লাফাচ্ছে। আপনি ছুরি নিয়ে দৌড় দিলেন, আল্লাহর নাম নিয়ে যবাই করবেন।

আপনি যবাই করলেও ওটা মারা যাবে। না করলেও মারা যাবে। কিন্তু কোনো রকম 'বিসমিল্লাহ' বলতে পারলে আপনি ওটা খাবেন। না বলতে পারলে আর খাবেন না। আবু জাহলের যুক্তি হল, সে বলত, মুহাম্মাদ ﷺ নাকি আল্লাহর নবী! অথচ সে বলে, আল্লাহ মেরে ফেললে খাওয়া যাবে না আর সে যবাই করলে খাওয়া যাবে। 'আল্লাহ মেরে ফেললে' মানে, এমনিতে যেটা মারা যায়। এ জন্য দেখতে একই রকম মনে হলেই সেটা দীন হতে হবে, এমন নয়। ইসলাম যেটা বলেছে, তুমি টাকা নাও পণ্য দাও, পণ্য নাও টাকা দাও-- এটা এতবেশি যৌক্তিক, ইউরোপে, আমেরিকাতে কয়েকটা অর্থনৈতিক ধ্বস গিয়েছে, বর্তমানে গ্রিস দেশটা একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছে। এটার বড় কারণ সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা। ইউরোপে, আমেরিকাতে, খ্রিস্টানরা নিয়মিত লিখছে, আমাদের ইসলামি অর্থনীতি গ্রহণের সময় হল কি না বলে দেন, আমরা কবে ইসলামি অর্থনীতি গ্রহণ করব? এ জন্য কোনো ইসলামি ব্যাংক, ইউরোপে, আমেরিকাতে, অর্থনৈতিক ধ্বসে পড়ে না। তবে ঘটনা হল, এই লেনদেনের ক্ষেত্রে অনেক ইসলামি ব্যাংকই শরীআহ লঙ্ঘন করে। আমরা বলব না যে, ইসলামি ব্যাংকগুলো সবাই সঠিকভাবে লেনদেন করছে। তবে তাদের সিস্টেম সঠিক। মানার ক্ষেত্রে অনেক ভুলত্রুটি আছে। তবে একজন মানুষ যদি বাধ্য হন, কোথাও তার টাকা রাখতে হবে, তার করণীয় হল, যে ব্যক্তি বলছে আমি শরীআহ মতো চলি, তার কাছে রাখতে হবে। যেমন আপনার দু'লাখ টাকা আছে। ব্যবসা করার ক্ষমতা নেই। একজন বলছে, আমি চালের ব্যবসা করি, আমাকে টাকাটা দাও, প্রতি মাসে যে লাভ হয় তার থেকে ১০% তোমাকে দিয়ে দেব। আরেকজন বলছে যে, আমি মদের ব্যবসা করি, আমাকে টাকাটা দাও, আমি প্রতি মাসে তোমাকে বিশহাজার টাকা দেব। আপনি কিন্তু যে চালের ব্যবসা করে তাকে দেবেন। কিন্তু ওই চাল বিক্রেতা যদি চালে ভেজাল দেয়, ওযনে কম দেয় বা অন্যকোনো দুর্নীতি করে, আপনি না জানলে, এর জন্য দায়ি হবেন না। এই সব কথার মূলকথা হল, এইসব ক্ষেত্রে যে ব্যাংক দাবি করে শরীআতভিত্তিক চলার, তাদের সাথে লেনদেন করতে পারেন। আমরা আশা করি, আপনার এই অবস্থা গ্রহণযোগ্য হবে।

প্রশ্ন-৩৪০: সুদভিত্তিক ব্যাংক শিক্ষাবৃত্তি দেয়। এটা গ্রহণ করা যাবে কি না?

উত্তর: তারা যে শিক্ষাবৃত্তি দেয় এটা শতভাগ সুদের টাকা দেয়। সুদ ছাড়া তো ব্যাংকের কোনো লাভ নেই। সেই লাভের টাকা থেকেই শিক্ষাবৃত্তি। একান্ত অসহায় মানুষ ছাড়া কারো জন্য এটা না নেয়া উচিত।

প্রশ্ন-৩৪১: আমরা সুদভিত্তিক ব্যাংক, এনজিও এবং বিভিন্ন ব্যক্তি থেকে লোন নিয়ে

ব্যবসা করি। পাশাপাশি আমরা নামায-রোযা, দান-সাদকাও করি। একজন আলিম বলেছেন, সুদভিত্তিক ব্যাংক, এনজিওর ঋণের টাকার ব্যবসা থেকে উপার্জিত টাকা পয়সা, পোশাক-আশাক হারাম। নামায হবে না, দান-সদকা কবুল হবে না। আমরা কি স্যার, খুবই ভুলের মধ্যে আছি?

উত্তর: সুদ আল্লাহ কঠিন হারাম করেছেন। আপনাদের বলি, রাগ কইরেন না, জিনা করার চেয়ে, মদ খাওয়ার চেয়ে অন্তত ত্রিশগুণ বেশি হারাম হল সুদ খাওয়া। কাজেই আল্লাহর ওয়াস্তে বিষয়টাকে বোঝার চেষ্টা করেন। জিনা করা মহা কবীরা গোনাহ। মদ খাওয়া মহা কবীরা গোনাহ। কিন্তু এর চেয়ে বড় গোনাহ সুদ খাওয়া। আল্লাহর রাসূল ﷺ স্পষ্ট বলেছেন। প্রথম কথা হল, ইবাদত কবুল হোক অথবা না হোক, আমরা এই হারাম কেন খাব, ভাইয়েরা! আমাদের লাভ কী! আল্লাহ যেভাবে চালাচ্ছেন এটাই কি আলহামদুলিল্লাহ না! আমি কোটি টাকা রেখে চলে গেলাম, এই সুদের টাকায় ছেলেমেয়ে চলবে, আর আমি জাহান্নামে পুড়ব। দরকার কী! হালাল টাকায় যদি চলে, সুদে কেন যাব! দুই নম্বার কথা হল, হারাম থেকে উপার্জিত আর্থিক ব্যয়-দান ইত্যাদি কবুল তো হবেই না, বরং এর দ্বারা ঈমানও চলে যেতে পারে। তবে দৈহিক যে ইবাদত, অর্থাৎ নামায-রোযা, এটার ফরয আদায় হবে, কিন্তু কোনো সাওয়াব-বরকত পাবেন না। সুদখোর নামায পড়েছে, তার নামাযের ফরয আদায় হয়ে যাবে, সুদখোর রোযা রেখেছে, তার রোযার ফরয আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু নামাযের সাওয়াব হবে না। কোনো বরকত পাবেন না। আর দান-সাদকাহ, হজ্জ– এগুলো কবুলই হবে না।

প্রশ্ন-৩৪২: সুদের টাকা আত্মীয়স্বজন, দুস্থদের মাঝে দান করা যাবে কি না?

উত্তর: দান করা যাবে না। সুদ একটা পাপ। আপনি এটা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কোনো অসহায় ব্যক্তিকে দিয়ে দেবেন যে, 'আল্লাহ, গোনাহটা মাফ করে দিও'।

প্রশ্ন-৩৪৩: আমার ভাইয়া সুদভিত্তিক ব্যাংকে চাকরি করেন। তিনি ছাড়া আমাদের পরিবারে উপার্জনের আর কেউ নেই। আমরা তার টাকা ব্যবহার করতে পারব কি না?

উত্তর: আপনারা ব্যবহার করবেন। সন্তানের জন্য পিতামাতাকে খাওয়ানো ফরয। পিতামাতা খাবেন। তাদের জন্য বৈধ। ভাইয়েরা খাবে। এরপরে বড় হলে ফেরত দিয়ে দেবে। কিন্তু খাবে। কোনো ফিতনা করার দরকার নেই। ভাইয়ের কাছে খাব না, মাঠে গিয়ে শুয়ে থাকব– এই পর্যায়ে আমরা না যাই।

প্রশ্ন-৩৪৪: আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি। চাকরি শেষে আমি

অল্পকিছু পেনশন পেয়েছি। টাকাটা সঞ্চয় হিসেবে ব্যাংকে রেখেছি। ব্যাংক কিছু লাভ দেয় তাই দিয়ে আমার সংসার চলে। এছাড়া আমার সামনে অন্য কোনো পথ খোলা নেই। এই মুহূর্তে আমার করণীয় কী?**

উত্তর: আপনি চেষ্টা করবেন, ইসলামি শরীআহ মতো চলে এমন ব্যাংকে টাকা জমা রাখবেন। অন্তত ডাইরেক্ট সুদ থেকে নিজেকে রক্ষা করবেন।

প্রশ্ন-৩৪৫: সুদ দেয়া ও নেয়া দুটোই গোনাহের কাজ। কিন্তু এটা জানা সত্ত্বেও ব্যাংক থেকে লোন নিয়েছি। এটা আমি এখন ফেরত দিতে চাচ্ছি। কিন্তু এতদিন যে সুদ নিয়েছি, এই পাপ থেকে কি বাঁচার উপায় আছে?

উত্তর: জি, আপনি তাওবা করবেন, সুদের টাকা ফেরত দেবেন এবং আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে ক্ষমা চাইবেন। যখন আপনি তাওবার অংশ হিসেবে সুদমুক্ত হয়ে গেলেন। সুদের টাকা সব ফেরত দিয়ে দিলেন– এটাই তাওবা।

প্রশ্ন-৩৪৬: চাকরি শেষে সরকার অবসর ভাতার চেক প্রদান করে। তার ভেতর থেকে আসল টাকা আর সুদ আলাদা করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে করণীয় কী?

উত্তর: ভাতা তো ভাতাই। সরকার যেটা ভাতা দেয়, এটা সুদ না। তবে এটা পাওয়ার পরে ব্যাংকে রেখে সুদ নেয়া হারাম।

প্রশ্ন-৩৪৭: আমি একটা এলএলএম কোম্পানির সাথে যুক্ত ছিলাম। সেখানে আমার মাধ্যমে অনেক মানুষ ভর্তি হয়। ফলে আমি অনেক টাকা কমিশন পাই। এখন কোম্পানিটা বন্ধ হয়ে গেছে। আমি সকলের হক নষ্ট করেছি। এখন কি সকলের টাকা আমাকে ফেরত দিতে হবে? আমি যে হক নষ্ট করেছি কীভাবে আদায় করব?

উত্তর: জাযাকুমুল্লাহু খায়রান। ভালো প্রশ্ন। আপনি আপনার সাধ্যের ভেতরে তাদের কাছ থেকে মাফ চাইবেন । আপনি তো পুরো টাকা নষ্ট করেন নি। আপনি টাকা কোম্পানিকে দিয়েছেন। আর কোম্পানি হল 'হায় হায়' কোম্পানি। আমরা এই ব্যাপারে অনেক বলেছি। তো সর্বাবস্থায় আপনি যাদেরকে ঢুকিয়েছিলেন, তাদের আবার কেউ কেউ কিছু পেয়েছে। যারা আপনার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, তাদের কাছ থেকে মাফ চাইবেন। তারা যদি মাফের শর্ত হিসেবে কিছু টাকা পয়সা দিতে বলে, সাধ্যের মধ্যে ফেরত দেবেন। না পারলে পা জড়িয়ে ধরবেন। কিন্তু মাফ নিতে হবে।

প্রশ্ন-৩৪৮: মসজিদের সভাপতি যদি সুদের সাথে জড়িত থাকে, আর এটা মুসল্লিরা জানে, তাহলে মুসল্লিরা গোনাহগার হবে কি না?

উত্তর: এটা সাধ্যের ভেতরের ব্যাপার। যে মুসল্লির ক্ষমতা আছে সভাপতি বদলানোর, কেবল তার গোনাহ হবে। কিন্তু যার ক্ষমতা নেই, সে কেন গোনাহগার হবে! আমার বাবা সুদ খায়, আমি ছোট মানুষ, আমি কেন গোনাহগার হব? আল্লাহ কি বান্দাকে ভালোবাসেন, নাকি যে কোনো কায়দায় বান্দাকে ডুবানোর চেষ্টা করেন? প্রত্যেকটা বিষয় সাধ্যের সাথে জড়িত। মসজিদের অযোগ্য ইমাম, অযোগ্য কমিটি বদলানোর ক্ষমতা যারা রাখেন, তবু তারা যদি না বদলান, নিঃসন্দেহে তারা গোনাহগার হবেন। কিন্তু সাধারণ মুসল্লির কোনো গোনাহ হবে না। উমাইয়া যুগের আমির মদ খেয়ে নামায পড়েছেন। সাহাবিরা তার পেছনে নামায পড়েছেন। প্রত্যেকের পাপ সাধ্যের ভেতরে নির্ভর করে।

প্রশ্ন-৩৪৯: একব্যক্তি আশা এনজিওর পিওনের চাকরি করে। সে যদি কখনো দাওয়াত দেয়, তার দাওয়াত কবুল করা যাবে কি না?

উত্তর: যারা পরিপূর্ণ সুদভিত্তিক কর্মে লিপ্ত, তাদের বাড়িতে দাওয়াতে যাবেন না। আপনি তাকে দীনের দাওয়াত দেবেন। সুদভিত্তিক এনজিও– যারা শুধু সুদেরই কাজ করে– এদের পুরো কাজটাই সুদ। বাকি অনেক কাজ আছে, যেমন দোকানদার সুদ নেয়, দোকানের কর্মচারী সুদে জড়িত না– এটাতে সমস্যা নেই।

প্রশ্ন-৩৫০: বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুষ দিয়ে ভর্তি হলে শরীআতের বিধান কী?

উত্তর: ঘুষ দেয়া হারাম। তবে কষ্ট করে লেখাপড়া করছে, এগুলোর জন্য কিছু হবে না। কিন্তু ভর্তির সময়কার ঘুষের জন্য গোনাহ হবে।

প্রশ্ন-৩৫১: ইসলামি বিমা কোম্পানিতে চাকরি করা জায়িয আছে কি না?

উত্তর: ইসলামি বিমা কোম্পানিগুলোর বিমা পদ্ধতি, টাকা গ্রহণ পদ্ধতি শরীআতসম্মত নয়। কারণ বিমা কোম্পানিগুলো মুদারাবা ব্যবস্থায় টাকা নেয়। যেমন ব্যাংকে আপনি টাকা রাখলেন। আপনি তিনকিস্তি, পাঁচকিস্তি দেয়ার পরে আর দেবেন না। এতে টাকা মাইর যাবে না। যেটুকু দিয়েছেন, পাবেন। বিমা কিন্তু তা নয়। বিমাতে আপনি তিনকিস্তি পাঁচকিস্তি টাকা দেয়ার পর আর না দিলে ওটা মাইর যায়। এই যে মেরে নেয়া, এটা শরীআতে জায়িয নয়।

প্রশ্ন-৩৫২: জমি বন্ধক রাখার কোনো বৈধ পথ আছে কি না?

উত্তর: জি। বৈধ পথ হল, আপনি টাকা দিয়ে জমি নেবেন এবং প্রতি বছর খাওয়ার বিনিময়ে টাকা কাটবেন। যেমন একলাখ টাকা দিয়ে জমি আপনার দখলে নিলেন। প্রতি বছর আপনি যে জমি খাবেন লিজ বা ভাড়া বাবদ ন্যূনতম একটা টাকা তাকে

দেবেন। যেমন যত বছর খাবে, প্রতি বছর এক হাজার টাকা কাটা যাবে। দশবছর পরে নব্বইহাজার টাকা দিয়ে দিল।

ওই টাকার বিনিময়ে যদি খান, আবার ওই টাকা একলাখই ফেরত দেন, তাহলে আপনার ওই খাওয়াটা সুদ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন-৩৫৩: ব্যবসার ক্ষেত্রে আগে মূল্য শোধ করে অর্ডার দিয়ে পরে পণ্য নেয়া জায়িয কি না?

উত্তর: অগ্রিম ব্যবসা, অর্থাৎ আগে দাম দিয়ে পরে মাল নেয়া এবং আগে পণ্য নিয়ে পরে দাম দেয়া, বাকি ব্যবসা– দুটোই জায়িয। একটু দাম কম হতে পারে। তবে অনেক শর্ত আছে। আলিমদের কাছ থেকে জেনে নেবেন।

প্রশ্ন-৩৫৪: হজ্জ এজেন্সিগুলো হজ্জের টাকা নিয়ে যে ব্যবসা করে তার হুকুম কী?

উত্তর: হজ্জের টাকা নিয়ে তো ব্যবসা করে না। তারা আপনাদের সেবার টাকা নেয়। আপনাকে হোটেল ভাড়া করে দেবে, পিছে পিছে ঘুরবে, আপনার রুম বুক করে দেবে, হজ্জের সময় নিয়ে যাবে– পয়সা দেবেন না? নাকি ফ্রি করতে হবে? কাজেই বৈধ ব্যবসা বৈধ। তারা সার্ভিস চার্জ নেবে। এটা বৈধ। যদি যুলুম করে, ওয়াদা ভঙ্গ করে সেটা হারাম।

প্রশ্ন-৩৫৫: আমি একজনকে সাইত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে গাড়ির টায়ার কিনে দিয়েছি। সে একমাস পরে চল্লিশ হাজার টাকা দেবে। এটা কি বৈধ?

উত্তর: বৈধ হওয়ার উপায় আছে। তার টাকা নেই, আপনি তাকে সাইত্রিশ হাজার টাকার টায়ার চল্লিশ হাজার টাকায় বেচলেন, সে পরে চল্লিশ হাজার টাকা শোধ করবে। এভাবে যদি আপনি কিনে বিক্রি করেন, তাহলে বৈধ।

প্রশ্ন-৩৫৬: কেউ যদি বলে, আমার মেয়েকে বিয়ে করলে তোমাকে চাকরি দিয়ে দেব। এটা কি যৌতুক হবে?

উত্তর: হ্যাঁ, এটাও যৌতুক। এ জন্য এ ধরনের বিবাহ না করা উচিত। তবে হ্যাঁ, বিয়ের পর শ্বশুর তার জামাইকে চাকরিতে নিজের মতো সহযোগিতা করেছে, সেটা ভিন্ন কথা।

উলূমুল কুরআন

প্রশ্ন-৩৫৭: আল্লাহ তো এক। তিনি কুরআনে কেন আমরা শব্দ ব্যবহার করেছেন?

উত্তর: এটা ভাষার নিয়ম। রাজা-বাদশাহরা যখন কোনো বিধান বর্ণনা করে, বহুবচন ব্যবহার করে। দেখবেন, প্রেসিডেন্ট যখন কোনো সার্কুলার দেয়, ডব লেখে। We, the President of People's Republic of Bangladesh. দুই নাম্বার বিষয় হল, আল্লাহ যখন নিজের কোনো কর্মের কথা বর্ণনা করেন, তিনি যেহেতু ফেরেশতাদের দিয়ে কাজ করান, এই জন্য কোথাও কোথাও জমার সীগা বহুবচন ব্যবহার করেছেন।

প্রশ্ন-৩৫৮: কোনো আলিম বলেন, কুরআনে 'আমি'র স্থলে 'আমরা' ব্যবহার করা এটা কুরআনের শৈল্পিকতা। এটা কতটুকু ঠিক?

উত্তর: কুরআনে যেখানে একবচনের কথা আছে, সেখানে অবশ্যই একবচন ব্যবহার করতে হবে। এটা শুধু শৈল্পিকতা না। কারণ একবচন বহুবচন ব্যবহারের ভেতরেও অনেক প্রজ্ঞা আছে। এটা শাইখ ইবন তাইমিয়া বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

প্রশ্ন-৩৫৯: ঘুমন্ত বাচ্চার বিছানায় কুরআন পড়া যাবে কি না?

উত্তর: অবশ্যই যাবে।

প্রশ্ন-৩৬০: বাংলা দেখে কুরআন পড়লে কি হবে?

উত্তর: বাংলা উচ্চারণ দেখে কুরআন পড়লে ঈমান হারানোর ভয় থাকে। তবে কেউ যদি মা'যুর থাকেন, আল্লাহ তার ব্যাপার বোঝেন। চেষ্টা করতে হবে শুদ্ধ করে পড়ার জন্য। নামাযের মধ্যে কুরআন পড়াটা ফরয। বাইরে পড়া নফল। কেউ পড়তে না পারলে তিনি অনুবাদ পড়বেন।

প্রশ্ন-৩৬১: কুরআন শিখিয়ে নির্ধারিতভাবে টাকা নেয়া শরীআতসম্মত কি না?

উত্তর: জি, কুরআন শিখিয়ে টাকা নেয়া যাবে। হাদীসে প্রমাণ আছে। বিষয়টা হল, ইমামদের, শিক্ষকদের বেতন দেবে রাষ্ট্র। যেমন বিচারকদের, পুলিশদের দিয়ে থাকে। এটা রাষ্ট্রীয় কাজ। যখন রাষ্ট্র বেতন দেয় তখন অন্য কারো কাছ থেকে হাদিয়া নেয়া জায়িয হয় না। কুরআন শেখানোর জন্য যখন মসজিদ কমিটি বেতন দেয়, অথবা সরকার বেতন দেয়, সেক্ষেত্রে ছাত্রের কাছ থেকে বেতন নেয়া

নাজায়িয। এটা ঘুষ। তবে কুরআন শেখানোর জন্য বেতন নেয়া জায়িয। যেমন এক সাহাবি বিয়ে করবে, তার কাছে কোনো টাকা পয়সা নেই। সে বলল, আমি কুরআনের কয়েকটা সূরা জানি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সূরাগুলো তুমি শিখিয়ে দাও, এটাই তোমার মোহর।[১]

প্রশ্ন-৩৬২: ল্যাপটপে ওযু ছাড়া কুরআন পড়া যাবে কি না?

উত্তর: পড়া যাবে। তবে আয়াতের উপর হাত দেবেন না। অন্য জায়গায় হাত দিয়ে সরাবেন।

প্রশ্ন-৩৬৩: বাংলা উচ্চারণ দেখে কুরআন পড়া যাবে কি না?

উত্তর: না। কুরআন পড়া যাবে না। উল্টো গোনাহ হবে। ঈমানও চলে যেতে পারে। বাংলা উচ্চারণ দেখে কক্ষনো কুরআন পড়বেন না। নাউযুবিল্লাহ। এটা একটা প্রতারণা। কুরআন আরবি উচ্চারণে শুদ্ধ পড়ার চেষ্টা করবেন। না পারলে বাংলা তরজমা পড়েন। তরজমা পড়ার সাওয়াব অন্তত পাবেন। কিন্তু বাংলা উচ্চারণে পড়া– এটা ভয়ঙ্কর। যেমন 'আমি তোমাকে' এই শব্দ দুটোর আপনি ইংরেজি বর্ণমালায় লেখেন– অসর ঃড়সধশব– তোমাকে তো হল না, টোমাকে। এটা বাংলিশ হয়ে গেল। আমি টোমাকে ওয়ালোওয়াসি। ইংরেজি 'ו' কিন্তু আমাদের 'ভ' না। একটা ভাষাকে অন্য ভাষার বর্ণ দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। বিশুদ্ধ হয় না। কুরআন এইভাবে বিকৃত করে পড়লে আপনার ঈমানও চলে যেতে পারে। খবরদার, এইভাবে পড়বেন না!

প্রশ্ন-৩৬৪: দুইজন মিলে কুরআন খতম করলে খতম হবে কি না?

উত্তর: মিশরে একটা সিস্টেম আছে। এত টাকা দিলে রোযা রেখে দেয়া হবে, এত টাকা দিলে তারাবীহ পড়ে দেয়া হবে, আর রোযা-তারাবীহর জন্য টাকা দিলে জুমুআ ফ্রি পড়ে দেয়া হবে ইত্যাদি। একজনের খতম আরেকজনের হয় কী করে! দুইজন মিলে খতম করলে প্রত্যেকের হাফ হাফ হবে। যে যতটুকু পড়বে তার ততটুকু সাওয়াব হবে।

প্রশ্ন-৩৬৫: আরবি কুরআন কালামুল্লাহ না কিতাবুল্লাহ? অকাট্য দলীল চাই।

উত্তর: আরবি কুরআন কালামুল্লাহ এবং কিতাবুল্লাহ। আমাদের দেশে খ্রিস্টানরা একটা বই দিয়ে বেড়ায়– কিতাবুল মোকাদ্দস– যেটাকে আগে বাইবেল বলত। তো

---

[১] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-৫১৪৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৪২৫।

একবার স্টিফেননগরে একজন খ্রিস্টান হয়েছে, আমরা তার কাছে গেছি, উনি বলছেন, আমি ঈসায়ি তরীকার মুসলমান। আমি বললাম, ভাই, খালেদা তরীকার আওয়ামী লীগ হওয়া যায় কি না? অথবা হাসিনা তরীকার বিএনপি কি হওয়া যায়? তাকে বললাম, এক সাথে দুটো পীর মানা যায় না, তুমি এক সাথে দুটো নবী মানলে কী করে? দুই নাম্বার হল, তোমার এই ঈসায়ি তরীকা কোথায় পেলে? বলল, এই কিতাবুল মোকাদ্দসে পেয়েছি। বললাম, এই কিতাবুল মোকাদ্দসের নাম যে কিতাবুল মোকাদ্দস– এটা কোন জায়গায় আছে? তোমাকে চ্যালেঞ্জ করলাম, এই বইয়ের ভেতরের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় যদি লেখা থাকে এই কিতাবের নাম 'কিতাবুল মোকাদ্দস', তাহলে আমি মেনে নেব। বলে যে, এই যে উপরে লেখা আছে। বললাম, আমি যদি রামায়ণ একটা কিনে এনে উপরের পৃষ্ঠা ছিঁড়ে সেখানে লিখে দিই কিতাবুল মোকাদ্দস, তাহলে কি রামায়ণ কিতাবুল মোকাদ্দস হয়ে যাবে? উপরে তো লিখেছে মানুষেরা। ভেতরের কথার ভেতর দেখাও। নেই। বিশ্বাস করেন, এই কিতাবের নাম যে বাইবেল, এটাও নেই। এই কিতাবের নাম যিশুখ্রিস্ট বারবার বলেছেন– ধর্মগ্রন্থ। স্ক্রিপচার (Scripture)। বাকি এই যে বলা হয়, কিতাবুল মোকাদ্দস, দ্য হোলি বাইবেল, দ্য বাইবেল, এগুলো সব বানোয়াট। পরের যুগে গ্রিক ভাষা থেকে বানাইছে।

আর আল্লাহর কিতাব এটা যে কালামুল্লাহ এবং কিতাবুল্লাহ এটা কুরআনে বারবার এসেছে:

أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ[২]

يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ[৩]

আবার [এটা] যে কালামুল্লাহ, কিতাবের ভেতরে এটাও আল্লাহ বলেছেন:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ

সূরা তাওবার প্রথম পৃষ্ঠার নিচে আল্লাহ বলছেন, যদি কোনো কাফির তোমার আশ্রয় চায়, যুদ্ধের ময়দানে, যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, তবু তাকে আশ্রয় দিতে হবে। তারপর আল্লাহর কালাম তাকে শোনাতে হবে। তারপর নিরাপদে তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসো।[৪]

---

[২] সূরা: [১৬] নাহল, আয়াত: ৬৪; সূরা: [২৯] আনকাবুত, আয়াত: ৫১; সূরা: [৩৯] যুমার, আয়াত: ৪১।

[৩] সূরা: [৩] আল ইমরান, আয়াত: ১৬৪; সূরা: [৬২] জুমুআ, আয়াত: ২।

[৪] সূরা: [৯] তাওবা, আয়াত: ৬।

উলূমুল হাদীস

প্রশ্ন-৩৬৬: সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থের হাদীসের বাইরে রাসূলুল্লাহ ﷺ কি সারা জীবনে আর কোনো হাদীস বলেন নি? সেই হাদীসগুলো কোন গ্রন্থে পাওয়া যাবে?

উত্তর: অবশ্যই বলেছেন। তাবিয়ীন, তাবি'-তাবিয়িদের যুগেই হাদীসের প্রায় একশটা গ্রন্থ লেখা হয়ে গেছে। মুসনাদ আহমাদের ভেতরে প্রায় চল্লিশ হাজার হাদীস আছে। অসংখ্য মাসানীদ আছে। সিহাহ সিত্তাহ হল প্রসিদ্ধ বই। মৌলিক হাদীসগুলো পাওয়া যায়। সিহাহ সিত্তাহর অধিকাংশ হাদীস সহীহ বা হাসান। যয়ীফ হাদীস কম। আর অন্যান্য গ্রন্থে সহীহ যয়ীফ সব আছে।

প্রশ্ন-৩৬৭: সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থে মোট হাদীসের সংখ্যা কত?

উত্তর: পুনরুক্তি বা রিপিটেশন বাদ দিলে মোট হাদীস চারহাজারের কিছু বেশি হয়।

প্রশ্ন-৩৬৮: এক হাদীস আরেক হাদীসের বিপরীত এমনটা আছে নাকি?

উত্তর: এক হাদীস আরেক হাদীসের বিপরীত নয়। তবে আমরা বোঝার ভুল করে থাকি। যেমন এক হাদীসে আছে রাসূল ﷺ রাফউল ইয়াদাইন করতেন। আবার আরেক হাদীসে আছে করতেন না। কোনো হাদীসে আছে ঈদে ছয় তাকবীর দিতে হবে। কোনো হাদীসে আছে বারো তাকবীরের কথা। সহীহ হাদীস। ইকামতে একবার বলা, আবার জোড়া ধরে বলা– দুই হাদীসই সহীহ। বাহ্যিকভাবে এটা আমাদের কাছে মনে হয় বিপরীত। আপনারা সব সময় দেখবেন এগুলো নফল-মুসতাহাব আমলের ক্ষেত্রে হয়েছে। ফরযে এমন পাবেন না। মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইবাদতের ক্ষেত্রে বৈচিত্র আনতেন। এতে মনোযোগ আসে। কখনো এক রকম করেছেন। কখনো আরেক রকম করেছেন। রাসূল ﷺ এর হাদীস সাংঘর্ষিক নয়। আমাদের বোঝার ভুল।

প্রশ্ন-৩৬৯: রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাত মেনে চলতে চাই। কোন কোন বই পড়লে সব সুন্নাত সম্পর্কে জানতে পারব?

উত্তর: হাদীস গ্রন্থ পড়বেন। **রিয়াদুস সালিহীন** পড়বেন। সহজ বই। **মিশকাত শরীফ** পড়তে পারেন। আলিমদের লেখা ভালো ভালো বই পড়বেন। আমার একটা বই আছে– **এহইয়াউস সুনান**। চেষ্টা করেছি অনেক সুন্নাত সম্পর্কে আলোচনা করার। একটা বই পড়লে কিন্তু হবে না। নবীজি ﷺ এর সুন্নাত অনেক দামি

জিনিস। দামি জিনিস একটা বই পড়ে পাবেন না। বই পড়বেন, আলিমদের সোহবতে থাকবেন। আলিমদের নসীহত শুনবেন। সন্দেহ হলে যাচাই করবেন।

প্রশ্ন-৩৭০: ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক সামীম মোহাম্মদ আফজাল বলেছেন, ইমাম বুখারি রাহ. দীর্ঘ ষোলোবছর রাসূল ﷺ এর রওযার পাশে বসে প্রতিটি হাদীস গ্রন্থিত করার পূর্বে মুরাকাবা করে নিতেন এবং মহানবী ﷺ এর সম্মতি নিয়ে তারপর হাদীসটি লিপিবদ্ধ করতেন। এটা কতটুকু সঠিক?

উত্তর: ষোলোআনাই মিথ্যাকথা। অবশ্য সামীম আফজাল সাহেব এসবের কিছুই জানেন না। কোনো হুযুর তাকে এই মিছে কথাটা সাপ্লাই করেছে। মুরাকাবা জিনিসটাই ইমাম বুখারি চিনতেন না। মুরাকাবার মানে হল, নিজের আমল নিজে পর্যবেক্ষণ করা। দ্বিতীয় কথা হল, ১৬ বছর ইমাম বুখারি মদীনায় ছিলেন না। কোনো কোনো কথা শোনা যায়, উনি দু-একটা হাদীসের ব্যাপারে কাবাঘর তাওয়াফ করে ইস্তিখারা করতেন। উনি সাতহাজার হাদীস লিখেছেন। প্রত্যেকটা হাদীসের জন্য মুরাকাবা করতে যদি পনেরো মিনিট লাগে, তাহলে সাতহাজার হাদীস মুরাকাবা করতে কত ঘণ্টা লেগেছে, চিন্তা করেন। মুরাকাবার সাথে হাদীসের সম্পর্ক নেই। এগুলো জ্যান্ত মিথ্যা কথা। একবার আবু বাকর ﷺ বললেন, দাদির অংশের (মীরাস) ব্যাপারে আমি তো কোনো হাদীস জানি না, তোমরা কেউ কি হাদীস জানো? মাসলামা ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন, আমি জানি। দাদি ছয় ভাগের একভাগ পাবে। আবু বাকর ﷺ বললেন, তুমি সঠিক বলেছ কি না, তোমার পক্ষে একজন সাক্ষী লাগবে। তুমি একা শুনলে হবে না। এখন মাসলামা তো আবু বাকরকে বলতে পারতেন, আপনি মোরাকাবা করে নবীজি ﷺ এর কাছ থেকে জেনে নেন, হাদীসটা সহীহ কি না। সাক্ষীর কী দরকার! আবু বাকর মুরাকাবা করেন নি। তিনি সাক্ষী তালাশ করলেন। তখন মুগীরা ইবন শুবা ﷺ বললেন, হ্যাঁ হুযুর, আমি হাদীসটা শুনেছি। আরেকটা ঘটনা। উমার ﷺ বসে বসে অফিসের কাজ করছেন। আবু মুসা আশআরি ﷺ এসে সালাম দিলেন। ভেতরে আসার অনুমতি চাইলেন। উমার কাজ করছেন। ভাবছেন, আবু মুসা তো আসবেই। কিন্তু তিনি তিনবার অনুমতি চাওয়ার পর ফিরে গেলেন। উমার ﷺ লিখছেন। হঠাৎ বললেন, আবু মুসার গলা শুনলাম। কই সে! চলে গেল কেন! ধরে আনো তাকে। তাকে ডেকে আনা হল। উমার ﷺ তাকে বললেন, তুমি সালাম দিলে, ভেতরে আসতে চাইলে, তো আসলে না কেন? আবু মুসা ﷺ বললেন, নবীজি ﷺ বলেছেন, তোমরা তিনবার অনুমতি চাইবে। অনুমতি দিলে ঢুকবে, না দিলে চলে যাবে। উমার ﷺ বললেন, এই হাদীস নবীজি ﷺ বলেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। উমার ﷺ বললেন, আমি তো

শুনি নি! তুমি সাক্ষী নিয়ে এসো। সাক্ষী না আনতে পারলে তোমার শাস্তি পাওনা। আবু মুসা আশআরি ﷺ কিন্তু বললেন না, হুযুর আপনি একটু মুরাকাবা করেন, রাসূল ﷺ এর থেকে শুনে নেন। বরং উনি কাঁদতে কাঁদতে আনসারিদের কাছে চলে গেছেন। তাদের কাছে গিয়ে বললেন, দেখেন, এই হাদীসটা আমি উমার ﷺ কে বলেছি, তিনি আমাকে শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা করছেন। আপনারা কেউ কি এই হাদীসটা শুনেছেন? তখন অনেকেই বললেন, আমরা শুনেছি। আবু সায়ীদ খুদরি ﷺ উমারের কাছে গিয়ে সাক্ষ্য দিলেন। উমার ﷺ মেনে নিলেন। এমন অগণিত ঘটনা আছে। হাদীস নিয়ে সন্দেহ হলে মুরাকাবা করা– এটা কঠিন বিদআত। বাজে কাজ। মোরাকাবা মানে নিজের গোনাহ স্মরণ করা। ইমাম গাযালির এহইয়াউ উলুমুদ্দীনে এর ব্যাখ্যা পাবেন।

প্রশ্ন-৩৭১: 'ইয়াহুদিরা তোমাদের কোনকিছুতে এতটা ঈর্ষান্বিত হয় না, যতটা ঈর্ষান্বিত হয় তোমাদের সালাতের আমীনের উপর'১– এটা কতটুকু ঠিক?

উত্তর: জি, আমীন শব্দ ইয়াহুদিরাও বলে। আমীন এটা হিব্রু ভাষায়ও আছে। আমাদের মতো এত সুন্দর সিস্টেম নেই। সূরা ফাতিহার ভেতর যে দুআগুলো আছে, এত সুন্দর দুআ তাদের নেই। তাদের কিতাবেও দুআ আছে। কিন্তু এত মজার দুআ নেই। এত সুন্দর সিস্টেম নেই। সারা বিশ্বের সকল মুসলিম নামাযের ভেতর দাঁড়িয়ে যখন আমীন বলে, তাদের ঈর্ষা হয়। এর মানে এই নয় যে, আমরা জোরে বলি, শুনে ঈর্ষা হয়। জোরে-আস্তে দুটোই এর ভেতর পড়ে।

প্রশ্ন-৩৭২: 'সালাত মুমিনের জন্য মিরাজ-স্বরূপ'– কথাটা কি সঠিক?

উত্তর: সালাত মুমিনের জন্য মিরাজের চেয়েও বড় কিছু– ঈমান-স্বরূপ। সালাত মুমিনের জন্য মিরাজ-স্বরূপ কথাটা ঠিক নয়।[২]

প্রশ্ন-৩৭৩: 'রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ছায়া ছিল না'– কথাটা ঠিক কি না? একখণ্ড মেঘ নাকি তাকে ছায়া দিত। এটা কতটুকু সঠিক?

উত্তর: মেঘ ছায়া দিত, এটা ঠিক নয়। সহীহ হাদীস এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সাহাবিরা কাপড় দিয়ে তাঁকে ছায়া দিতেন, অনেক হাদীসে এসেছে। কখনো কখনো দু-একটা ঘটনায় মেঘের কথা আছে। আর রাসূল ﷺ এর ছায়া ছিল না মর্মে হাদীসটা

---

[১] বুখারি, আল আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং-৯৮৮; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং-৮৫৬, ৮৫৭; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস নং-৫৭৪, ১৫৮৫; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-২৫০২৯।

[২] ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি, পৃ. ৪৮৯।

সনদগতভাবে জাল পর্যায়ের। আবার ছায়া ছিল– এরকমও একটা হাদীস আছে। আমার হাদীসের নামে জালিয়াতি বইটার মধ্যে পাবেন।[৩] আর আগেও বলেছি, এই বিষয়গুলো কুরআনে নেই, হাদীসে নেই। অতিভক্তি তৈরি করানোর জন্য এগুলো করা হয়। সহীহ রিওয়ায়াতে রাসূল ﷺ এর ছায়া থাকলেও আলহামদুলিল্লাহ, না থাকলেও আলহামদুলিল্লাহ।

প্রশ্ন-৩৭৪: রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মলমূত্র, রক্ত, থুতু সাহাবিরা খেয়েছেন মর্মে কোনো প্রমাণ আছে কি না?

উত্তর: এই মর্মে কোনো প্রমাণ নেই। তবে একজন সাহাবি কিছু রক্ত খেয়ে ফেলেছিলেন, এটার কথা আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বকা দিয়েছিলেন। তবে তিনি আসলে মুহাব্বতে খেয়ে ফেলেছিলেন। এই রকম একটা রিওয়ায়াত দেখেছিলাম। সনদে কতটুকু জোর আছে আমার মনে পড়ছে না।

প্রশ্ন-৩৭৫: রাসূল ﷺ এর মলমূত্র ত্যাগের সময় গাছেরা এসে চারিদিক থেকে আড়াল করত– কথাটা কতুটুক সত্য?

উত্তর: এটা সবসময় সত্য না। একটা দুটো ঘটনা খুবই যয়ীফ রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে। আর এগুলোর দরকার কী? এগুলো সব অতিভক্তির মাধ্যমে ঈমান চুরির ব্যবস্থা। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসতিনজার জন্য দূর মাঠে চলে যেতেন। আড়ালে চলে যেতেন। টিপির আড়ালে যেতেন। এগুলো সহীহ হাদীস। গাছপালা আড়াল করত, তার পেশাব-পায়খানা মাটিতে খেয়ে ফেলত– এগুলোর সহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন-৩৭৬: আলী রা. নাকি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাঁধে পা রেখে দাঁড়িয়ে কাবা ঘরের মূর্তি ভেঙেছিলেন। সঠিক কি না?

উত্তর: নাউযুবিল্লাহ। বানোয়াট কথা।

প্রশ্ন-৩৭৭: 'আখেরি নবীকে পয়দা না করলে আল্লাহ কোনো কিছুই সৃষ্টি করতেন না'– কথাটা ঠিক না ভুল?

উত্তর: কিছু বাজে কথাকে আমরা দীন বানিয়ে নিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ কে আল্লাহ দুনিয়ার রহমত হিসেবে পাঠিয়েছেন। রাহমাতুল্লিল আলামীন। মহাবিশ্বের রহমত।

---

[৩] সুয়ুতি, আল খাসায়িসুল কুবরা ১/১২২; ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি, পৃ. ৩৫৬-৩৬৩; মাওলানা মুতীউর রহমান, এসব হাদীস নয় ১/১৭০-১৭৩।

কুরআনে বলেছেন। আমরা এইটা বলি না। আল্লাহ কোথাও বলেন নি, আমি মুহাম্মাদের জন্য দুনিয়া সৃষ্টি করেছি। এটা কুরআনে নেই। কোনো হাদীসে নেই।

لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ

আপনি না হলে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতাম না– এই কথাটা যে জাল কথা, সব আলিম বলেছেন। কোনো হাদীসের কিতাবে পাওয়া যায় না।[৪] আর এতে নবীজি ﷺ এর কী এমন ফযীলত বাড়ে! বিশ্বের রহমত হিসেবে আল্লাহ নবীজি ﷺ কে সৃষ্টি করেছেন, এটা হল তাঁর ফযীলত। বিশ্বকে তাঁর জন্য সৃষ্টি করেছেন, এটা তো আল্লাহ বলেন নি।

প্রশ্ন-৩৭৮: অনেকে বলেন, রোযার সময় একটা ফরয পালন করলে সত্তরটা ফরযের সাওয়াব। একটাকা দান করলে সত্তরটাকা দান করার সাওয়াব– এ ব্যাপারে কোনো বিশুদ্ধ হাদীস আছে কি না?

উত্তর: একটা হাদীস আছে, যেটা আমরা জানি, রমাযানের প্রথম অংশ রহমত, দ্বিতীয় অংশ মাগফিরাত ইত্যাদি। এই হাদীসের সনদ দুর্বল, তবে জাল নয়। যিনি রাবী, তাকে মিথ্যাবাদী বলা হয় না। তবে তার স্মৃতিশক্তির কিছু দুর্বলতা ছিল। এজন্য হাদীসটা সনদগতভাবে কিছুটা দুর্বল। আলী ইবন জুদআনের বর্ণনায় একটা হাদীসে বলা হয়েছে, নফল করলে ফরযের সাওয়াব, আর একটা ফরয করলে সত্তরটা ফরযের সাওয়াব পাওয়া যায়। এটা দুর্বল। তবে অন্য একটা সহীহ হাদীসে আছে, রোযার সময় উমরাহ করলে হজ্জের সাওয়াব হয়।[৫] এখানে প্রমাণ হয় যে, নফল করলে ফরযের সাওয়াব পাওয়া যায়। এ ছাড়া আরো অনেক হাদীস আছে। তবে একটা ফরয করলে সত্তরটা ফরযের সাওয়াব পাওয়া যায়– এই মর্মে কোনো সহীহ হাদীস দেখি নি।

প্রশ্ন-৩৭৯: আশুরার দিন কি কিয়ামত হবে?

উত্তর: না, এমন কোনো হাদীস নেই। শুক্রবারে কিয়ামত হবে, এইটুকু আছে। **শুক্রবার আশুরার দিন– এটা জাল কথা। মিছে কথা।**[৬]

প্রশ্ন-৩৮০: বুখারি শরীফে কুলক্ষণ বা খারাপ লক্ষণ সম্পর্কে চারটি হাদীস বলা

---

[৪] সাগানি, আল মাউযুআত, পৃ. ৫২; তাহির পাটনি, তাযকিরাতুল মাউযুআত, পৃ. ৮৬; মুল্লা আলী, আল আসরারুল মারফুআহ, পৃ. ২৯৫; আলবানি, সিলসিলা যয়ীফাহ ১/৪৫০

[৫] সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস নং-১৮৮৭; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, হাদীস নং-৩৩৩৬; সহীহ বুখারি, হাদীস নং-১৮৬৩।

[৬] ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি, পৃ. ৫১১।

হয়েছে। যদি কোনো কিছুর মধ্যে কুলক্ষণ থেকে থাকে, তা হচ্ছে ঘরের মধ্যে, স্ত্রী লোকের মধ্যে, ঘোড়ার মধ্যে। এর ব্যাখ্যা দেবেন কি?

উত্তর: আয়িশা ﵂ এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বাড়িঘর, গাড়ি, বউ– (মানুষ) এগুলোকে সবচে' বেশি পছন্দ করে। এই জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কুলক্ষণ বলে কিছু নেই। যদি থাকত, তাহলে এগুলোর মধ্যে থাকত। এগুলোই মানুষকে বেশি নষ্ট করে। বাড়ির লোভ, বউয়ের লোভ, টাকার লোভ, গাড়ির লোভ মানুষকে নষ্ট করে। এইগুলোই বরং কুলক্ষণ হওয়া উচিত ছিল। এইগুলোকেই যখন তোমরা পছন্দ করছ, তখন দুনিয়াতে কুলক্ষণ বলে আর কিছু আছে বলে মনে করবে না।[৭]

[৭] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-৫৭৫৩; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-২৬০৩৪।

জামাআত/মাযহাব/ফিরকা

প্রশ্ন-৩৮১: আল্লাহ বলেছেন, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا 'তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধরো এবং বিচ্ছিন্ন হোয়ো না'।[১] তাহলে মুসলিমদের এত দল কেন?

উত্তর: যারা আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধরবে তারা দলাদলি করবে না। কিন্তু আমরা যেহেতু আল্লাহর রজ্জুকে ছেড়ে দিয়েছি, তাই দলাদলি করছি। তবে মুসলিমদের এত দলাদলি ইয়াহুদি-খ্রিস্টানদের দলাদলির কাছে কিছুই নয়। আমরা একটু গরীব বলে মারামারি করলে দেখা যায়। এক হিটলারে সত্তরলক্ষ ইয়াহুদি পুড়িয়ে মেরেছে। সেন্ট বার্থেলোমিউস ডে (St. Bartholomew's Day), ইন্টারনেটে সার্চ দেবেন, একদিনে সত্তরহাজার প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানকে ক্যাথলিক খ্রিস্টানরা হত্যা করেছে। রিলিজিয়াস ওয়ার, ইন্টারনেটে ক্লিক দেবেন, পঁচিশবছর ধরে ইউরোপে হাজার হাজার মানুষ মরে ক্যাথলিক আর প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানদের মারামারিতে। দলাদলি সবার ভেতরেই আছে। আওয়ামী লীগে আছে, বিএনপিতে আছে, জাতীয় পার্টিতে আছে– মানবীয় প্রকৃতিই হল দলাদলি করা। তবে আমরা যতবেশি কুরআন সুন্নাহর কাছে যাব, অন্তর থেকে দলাদলি বের হয়ে যাবে।

প্রশ্ন-৩৮২: হানাফি মাযহাবের লোকেরা সহীহ হাদীস অনুসরণ করে না। তারা শুধু ইজতিহাদ নিয়ে আছে। এগুলো কি ঠিক?

উত্তর: সবাই ইজতিহাদ নিয়ে আছে, আর আমি বিপদে আছি! যারা হাদীস মানার দাবি করেন, তারাও যে ইজতিহাদ নিয়ে থাকেন, এটা আমি নিজে ভুক্তভুগি। যেমন একবার আমি টিভিতে বললাম, সিররি নামাযে, যুহরে-আসরে সুরা ফাতিহা পড়বেন, এটাই উত্তম। আর জাহরি নামাযে, যে নামাযে ইমামের কিরাআত শোনা যায়, ওই নামাযে সূরা ফাতিহা পড়বেন না। এটা শুনে একজন আহলে হাদীস বিশাল চিঠি লিখেছে– 'আপনি মাযহাবি ই'তিবারে আল্লাহর দীনের বিরোধিতা করেছেন। কঠিন গোনাহ করেছেন। ইমামের পেছনে কিরাআত পড়া ফরয। যত হাদীসে আছে যে, ইমামের পেছনে কিরাআত লাগবে না, এখানে কিরাআত বলতে সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য কিছু বোঝানো হয়েছে'। লা-হাওলা ওয়া লা-কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। এই কথাটা কি কোনো হাদীসে আছে? নেই। আমরা আহলে হাদীস, হাদীসের নামে একটা ইজতিহাদি কথাকে দলীল বানালাম। কেউ এ কথা বলেন

---

[১] সূরা: [৩] আল ইমরান, আয়াত: ১০৩।

নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ জাহরি নামাযে ইমামের পেছনে কিরাআত পড়তে নিষেধ করেছেন (এখানে আহলে হাদীসরা ইজতিহাদ করে কিরাআত বলতে সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্যান্য কিরাআতের ব্যাখ্যা দেন)। সহীহ হাদীস। আর যে হাদীস দিয়ে দলীল দেয়া হয়, ওটাকে আলবানি রাহ. যয়ীফ বলেছেন।

...لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ...

[...সূরা ফাতিহা ছাড়া পড়বে না...][২]

এটাকে আলবানি যয়ীফ বলেছেন।[৩]

ইজতিহাদ দিয়ে সহীহ হাদীসকে যয়ীফ করা যয়ীফ হাদীসকে সহীহ করা, এটা শুধু হানাফিদের ব্যারাম না। 'আল্লাহর রহমতে' এটা সবারই ব্যারাম। এ ব্যারাম থেকে কেউ মুক্ত নয়। আমরা আশা করি, আল্লাহ আমাদেরকে মুক্ত করেন। আসলে আমাদেরকে নফস থেকে বের হতে হবে। হানাফিদেরও বের হতে হবে। আহলে হাদীসদেরও বেরোতে হবে। যারা আহলে হাদীস বলে দাবি করে সহীহ হাদীসকে উল্টে দিচ্ছেন, তারা ঠিক করছেন না। সহীহ হাদীসকে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا [وَإِذَا قَالَ: وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا: آمِينَ]

ইমামের অনুসরণ করলে ইমাম 'আল্লাহু আকবার' বললে তুমি 'আল্লাহু আকবার' বলবে। ইমাম কিরাআত শুরু করলে তুমি চুপ করে থাকবে।[৪] ক্লিয়ার কথা। এখন আপনি বলছেন, কিরাআত মানে হল ফাতিহার পরে। আপনি কোথায় পেয়েছেন কিরাআত মানে ফাতিহার পরে? সহীহ বুখারিসহ অন্যান্য কিতাবের হাদীস– রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আল্লাহু আকবার' (তাকবীরে তাহরীমা) বলার পরে কিরাআতের আগে চুপ করে থাকতেন। তার মানে ফাতিহার পরে নাকি? না, ফাতিহার আগে। সানা পড়তেন। এগুলো হল, ইজতিহাদের মাধ্যমে সহীহ হাদীস রদ করার নমুনা। এগুলো না করে আমরা উদার হই। যেসব ব্যাপারে সাহাবিদের মতভেদ আছে, সে সব ব্যাপারে ভিন্নমতকে মেনে নিই। হানাফিদেরও সহীহ হাদীসমুখি হতে হবে। আবার আহলে হাদীসদেরও ইজতিহাদের কথা স্বীকার করতে হবে। কারণ শুধু হাদীস দিয়ে মাসআলা দেয়া যায় না।

আমি হজ্জের সফরে মিনায় বসে আছি। আমার সাথে ইন্ডিয়ান একভাই আছেন।

---

[২] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-৮২৩; সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-৩১১।

[৩] আলবানি, যয়ীফ আবু দাউদ, হাদীস নং-১৪৬; সিলসিলা যয়ীফাহ ১২/১৭।

[৪] মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-৮৮৮৯, ৯৪৩৮; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং-৮৪৬; সুনান নাসায়ি, হাদীস নং-;৯২১ সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-৬০৪।

আহলে হাদীস। আমার খুব বন্ধু মানুষ। শ্বশুরবাড়ির দেশের লোক। খুব মশকারা করতাম। তো আমাদের জামিআতুল ইমামের হাদীসের উস্তাদ, তিনি এসে আমাদের বলছেন, তুমি কোন মাযহাবের? তুমি বাবা, কোন মাযহাবের? সবাইকে জিজ্ঞেস করছেন। কেউ মালিকি, কেউ শাফিয়ি, কেউ হাম্বালি, কেউ হানাফি বলছে। আমার ওই ইন্ডিয়ান ভাই বলছে, আমি মুহাম্মাদি মাযহাবের। উস্তাদ একটু রাগ করলেন। বললেন, ফিকহ মুহাম্মাদি হয় না। কারণ হাদীসের অধিকাংশ দালালাত যন্নি। যারা আলিম তারা বুঝবেন। দুই নাম্বার হল, অনেক হাদীসে একাধিক মত আছে। যেমন উস্তাদ একটা মজার কথা বললেন। ওযু করার পরে যদি কোনো পুরুষ মানুষ নিজের গোপন অঙ্গ স্পর্শ করে, তাহলে তার ওযু ভেঙে যাবে- একটা হাদীসে আছে।[৫] আবার ওযু ভাঙবে না- আরেকটা হাদীসে আছে।[৬] ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল বলেছেন, ওযু ভেঙে যাবে। ইবন তাইমিয়া বলেছেন, ওযু ভাঙবে না। এবার উস্তাদ প্রশ্ন করলেন, তাহলে বলো, মুহাম্মাদি কে, আর মুহাম্মাদির খেলাফ কে? মূলত ফিকহের ভেতর ইজতিহাদ থাকবেই। একাধিক হাদীস এসেছে, সমন্বয় করতে হবে। সমন্বয়ে ইখতিলাফ হবেই। আর এ জন্যই সাহাবায়ে কিরাম ফিকহের ব্যাপারে ইজতিহাদে প্রশস্ততা দিয়েছেন। কিন্তু আকীদার ব্যাপারে কঠোর থেকেছেন।

আবার হানাফিদেরও বুঝতে হবে, আমরা মাযহাবের নামে মাযহাবকে অপমান করি। একজন এসে বলল, এই দেখো বুখারির হাদীসে এসেছে রাফউল ইয়াদাইন করতে হবে। আমরা গালি দিই- 'এই, তুই নাসিখ মানসুখ বুঝিস নাকি! বুখারি শরীফ পড়ে তো গোমরাহ হয়ে যাবি'! আল্লাহু আকবার! নবীর কথা পড়ে গোমরাহ হয়ে যাবে! তাহলে আমার কথা পড়ে হেদায়াত হবে নাকি? আমার দরকার ছিল বলা যে, 'ভাই, বুখারি শরীফের এই হাদীসটা সহীহ, ঠিক তেমনি তিরমিযি শরীফের ওই হাদীসটাও সহীহ, যেখানে রাফউল ইয়াদাইন নেই। কাজেই, দুটোই সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। একজন এসে বলল যে, জাকির নায়েক বলেছে যে, সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। বুখারিতে আছে। আমরা বলি, 'জাকির নায়েক গোমরাহ হয়ে গেছে। তুইও গোমরাহ হয়ে গেছিস'। ইত্যাদি ইত্যাদি। এইগুলো না বলে যদি আমি বলতাম, ভাইরে, মুসলিম শরীফের হাদীসে ফাতিহা পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। তাহলে মিটে যেত। আমরা আমাদের অজ্ঞতা মূর্খতা ঢাকার জন্য উল্টোপাল্টা কথা বলি। আমাদের ইমাম আবু হানীফার মুতাওয়াতির নির্দেশ- তুমি যদি ইমাম হও, মুফতি হও, ফতোয়া দাও, তাহলে কুরআন-হাদীস থেকে কোন

---

[৫] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-১৮১; সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-৮২; সুনান নাসায়ি, হাদীস নং-৪৪৭।

[৬] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-১৮২; সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-৮৫।

দলীল দিয়ে তুমি ফতোয়া দিচ্ছ, সেই দলীল তোমাকে জানতে হবে। শুধু মাযহাব বললে হবে না।

প্রশ্ন-৩৮৩: আপনি শুধু কুরআন, হাদীস আর সুন্নাহর কথা বলেন। এখন থেকে তাহলে কি আমরা ইজমা, কিয়াস, ফিকহ মানব না?

উত্তর: আমি কি এতক্ষণ সেই কথা বলেছি? উল্টো ব্যাখ্যা করবেন জায়গায় বসে থেকেই? আমরা সবই মানব। কিন্তু কুরআন-সুন্নাহ দিয়ে যাচাই করে নেব যে, বিষয়টা ঠিক কি না। ইজমার নামে একজন এসে বলল যে, ইজমা হয়ে গেছে, কিয়াম না করলে কাফির, এই ইজমা মানবেন নাকি? ইজমা হয়ে গেছে, কবর পাকা করা জরুরি, মানবেন নাকি? ইজমা হয়ে গেছে, দাড়ি চাঁছা জরুরি, মানবেন নাকি? না। ইজমার নাম নিয়ে, কিয়াসের নাম নিয়ে বললেই হবে না। দেখতে হবে সেটা কুরআন-হাদীস সমর্থিত কি না। একজন লোক কিয়াস করল, আমরা নফল নামাযের ভেতর কুরআন পড়ি। দাঁড়িয়ে পড়ি। দাঁড়িয়ে পড়া উত্তম না বসে পড়া উত্তম? দাঁড়িয়ে ডাবল সাওয়াব, বসে অর্ধেক সাওয়াব। এর উপর কিয়াস করে একজন বলল, কুরআন যখন এমনি তিলাওয়াত করবেন, দাঁড়িয়ে করবেন। বসে করলে অর্ধেক সাওয়াব। এই কিয়াস মানবেন তো? এতবড় কিয়াস মানবেন না! আপনাকে নবী ﷺ এর সুন্নাত দিয়ে বিচার করতে হবে। সবই মানব। ফিকহ মানব। ফিকহ না মানলে মুসলিম থাকবেন কী করে! তবে কথা হল, ফিকহ মানে সকল ফকীহর সকল কথা না। ফিকহশাস্ত্র মানব। ফিকহের কথাগুলোকে কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে মানব। মনে করেন, ফিকহের কিতাবে আছে, গানবাজনা জায়িয। একজন একটা ফিকহের বই নিয়ে আসল। সেখানে এটা লেখা আছে। মানবেন নাকি?

প্রশ্ন-৩৮৪: কুরআন-সুন্নাহর উপর আমল করলে মাযহাবের প্রয়োজনীয়তা আছে কি?

উত্তর: কুরআন-সুন্নাহর উপর আমল করলে মাযহাবের প্রয়োজন নেই, ঠিক আছে। কিন্তু আপনি কুরআন-সুন্নাহটা পাইলেন কোথায়? কী করে পাইলেন? আপনি হয় কুরআন পুরো পড়েছেন, পুরো বুঝেছেন। সুন্নাত পুরো পড়েছেন, অর্থাৎ অন্তত ৫০/৬০ হাজার হাদীস পুরো পড়ে ফেলেছেন। তাহলে বুঝতে হবে আপনি কুরআন-সুন্নাহ পড়েছেন। তা না হলে আপনি কী করে কুরআন-সুন্নাহ বুঝলেন? আসলে সব ক্ষেত্রেই প্রান্তিকতা আছে। একজন বলল, আমি সহীহ হাদীস ছাড়া আমল করি না। ঠিক আছে। তাহলে তুমি সকালে ঘুম থেকে উঠে কী বলেছিলে তার সহীহ হাদীসটা বলো? তিনি জানেন না। তিনি দু-একটা মতভেদপূর্ণ মাসআলার সহীহ হাদীস

জানেন। যেমন আজকে জুমুআয় এটা বলেছি, হানাফীরা এবং আহলে হাদীসরা নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় হাত কোন জায়গায় থাকবে, বুকের উপর নাকি নাভির উপর, এটা নিয়ে খুব চিন্তিত। কিন্তু আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় কোনভাবে হাত থাকবে, এটা নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই। অথচ আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় হাত কেমন করে রাখতে হবে, এটা সহীহ হাদীস। যেহেতু এটা নিয়ে কোনো ইখতিলাফ নেই, তাই এটা নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই। আমি অনেক সময় দেখেছি, অনেকেই হয়ত রাফউল ইয়াদাইন করছেন, হাত বুকের উপর বাঁধছেন, কিন্তু আত্তাহিয়্যাতুর সময় হাতের আঙুলগুলো একেবারে মাটির সাথে দিয়ে বসে আছেন। কারণ তিনি ওই ইখতিলাফি, ঝগড়াটে মাসআলাগুলো ভালো করে শিখেছেন। বাকিগুলো শেখেন নি। যাই হোক, মাযহাব কোনো ইবাদত নয়। মাযহাব কুরআন-সুন্নাহ পালনের উপকরণ। তবে কুরআন-সুন্নাহ বোঝার জন্য আপনি যখনই কোনো না কোনো আলিমের সহযোগিতা নিয়েছেন, আপনি এটা বলেন আর না বলেন, এটা একটা মাযহাব হয়ে গেছে। এবং এই ব্যাপারে প্রত্যেকেই, এমন কি যারা হাদীস মানার দাবি করছেন, অনেক হাদীস বাদ দিচ্ছেন। অনেক হাদীস বর্জন করছেন। সহীহ হাদীসকে যয়ীফ বানিয়ে ফেলছেন। যয়ীফ হাদীসকে সহীহ বানাচ্ছেন। এটা হানাফীরাও করছেন, আহলে হাদীসরাও করছেন, শাফিয়িরাও করছেন, হাম্বালিরাও করছেন। কেউ মুক্ত নয়।

ঈদের ছয় তাকবীরের হাদীসগুলো টনটনে সহীহ। দেখা গেল আহলে হাদীস ভাইয়েরা বলছেন, একটাও সহীহ না। জোর করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জাল বানিয়ে দিলেন। আবার বুকে হাত বাঁধার একটা হাদীসও সহীহ নেই। বুকে বাঁধেন আর নাভির নিচে বাঁধেন, সমান সুন্নাত। জোরজার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হয়ত সহীহ বানিয়ে দিলেন। আবার রাফউল ইয়াদাইনের হাদীসগুলো সব সহীহ। আমরা হানাফিরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মানসুখ বানিয়ে দিলাম। এই জিনিসটা ঠিক নয়। কথা হল, আহলে হাদীস মানাও হাদীস মানা, মাযহাব মানাও হাদীস মানা। যদি মাযহাবের কোনো ইমামের মত হাদীসের কোনো মতের বিরোধী বলে আপনি নিশ্চিত বিশ্বাস করেন, আপনি হাদীস মানবেন। ইমামরা কেউ নিষেধ করেন নি।

প্রশ্ন-৩৮৫: বর্তমানে শিয়াপন্থীরা হক দল নাকি বে-হক দল?

উত্তর: শিয়াপন্থীরা সকল সাহাবিকে কাফির বলে। আবু বাকর, উমার, উসমান ﷺ কে লানত করে। কুরআনকে বিকৃত জানে। তারা কবর-মাযারকে পূজা করে। আমরা কী করে তাদেরকে হক বলি!

প্রশ্ন-৩৮৬: ডা. জাকির নায়েকের ফতোয়া মানা যাবে কি না?

উত্তর: কারো ফতোয়াই আন্দাযে মানবেন না। আলিমদের সাথে পরামর্শ করবেন, দলীল খুঁজবেন।

প্রশ্ন-৩৮৭: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মাত তেহাত্তরটা দলে ভাগ হবে। এরমধ্যে একটা দল জান্নাতে যাবে। সেই একটা দল কোনটা? তাবলীগ জামাআত, আটরশি, চরমোনাই, ফুরফুরা, মাইজভাণ্ডারি– কোনটা?

উত্তর: ব্যাপারটা এমন নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনোই আমাদেরকে শূন্যতার উপর রেখে যান নি। তিনি সবকিছুর সুন্দর মাপকাঠি দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন:

مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

আমি এবং আমার সাহাবিদের পথে যারা থাকবে তারাই ভালো।[৭] খুব ভালো করে বোঝেন, আমরা সবাই কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবিদের মানি। কেউ অল্প, কেউ বেশি। আপনি যাদেরই নাম বলবেন, সবার ভেতরেই কিছু না কিছু আছে। যেমন টুপি পরা। দাড়ি রাখা। এটা নিয়ে তো ইখতিলাফ নয়। যেখানে মতভেদ, সেখানে রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবিদের কর্মের অনুসরণ করা হয় কি না দেখতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ দীনের দাওয়াত দিতেন। কীভাবে দিতেন? আমরাও দিই। আমাদের দাওয়াতের ভাবটা নবীজি ﷺ এর মতো হচ্ছে কি না। নবীজি কোন কথা বলে দাওয়াত দিতেন? তিনি যিকির করতেন। কিন্তু কোনভাবে করতেন? তিনি সাহাবিদের মুরীদ করতেন। কোনভাবে করতেন? তিনি আবু জাহল, আবু লাহাব, আবু বাকর– সবাইকে মুরীদ করতেন নাকি শুধু মুসলিমদের মুরীদ করতেন? মুরীদ যাদের করেছিলেন, তাদের দিয়ে নামায-রোযা করায়েছিলেন নাকি বলে দিয়েছিলেন, 'তোমার কিছু করা লাগবে না, আমি জান্নাতে নিয়ে যাব'? তিনি কোন পদ্ধতিতে মুরীদ করেছিলেন? আপনার ঈমান, আকীদা, বিশ্বাস, চেতনা, কর্ম, দাওয়াত, তাবলীগ, জিহাদ, মিছিল– প্রত্যেকটা কাজ যার যত নবীজির মতো হবে, তারটা ততবেশি হকের উপর হবে। আবার অনেকের কিছু কম থাকতে পারে। কিন্তু মানদণ্ড খুব পরিষ্কার। নবীজি বলেছেন নবীজিকে মুহাব্বত করতে হবে, কাজেই আমার মিলাদ যে পড়ে সেই সুন্নি। এখানে কায়দাটা ঠিক আছে কি না সেটা দেখতে হবে। মিলাদ আমরা নবীজির কায়দায় পড়ব। যার সাথে নবীজি সাহাবিদের মেলবে তারাই ঠিক।

প্রশ্ন-৩৮৮: ইসলামই একমাত্র মুক্তির পথ নাকি আরো পথ আছে? কুরআন থেকে জানতে চাই।

---

[৭] সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-২৬৪১; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস নং-৪৪৪।

উত্তর: কুরআন থেকেই বলব। তবে তার আগে বলতে চাই, কুরআন থেকে না হয়ে হাদীস থেকে হলে সমস্যাটা কী? হাদীস মানে না তিন প্রকারের মানুষ। এক প্রকার হল, খৃস্টান মিশনারিরা- যারা বাংলাদেশে কুরআন দিয়ে মুসলিদের খ্রিস্টান বানাচ্ছে: 'এই দেখো, কুরআনের ভেতর ঈসা মসীহের কথা আছে। তুমি যদি না মান, জাহান্নামে চলে যাবে'। কুরআনে কী আছে তা তো বাঙালি বোঝে না। তারা বলে, আমরা কুরআন মানি, হাদীস মানি না। কেন হাদীস মানি না? হাদীস মানি না, তার কারণ দুটো হতে পারে। একটা হল, কুরআন আল্লাহর কথা, হাদীস নবীর কথা। তাই যদি হয়, তাহলে খ্রিস্টানদের ইঞ্জিল শরীফ একটাও মানা যাবে না। কারণ এর ভেতর আল্লাহর কথা একটাও নেই। ঈসা মসীহের কথা অল্প আছে। বাকি সব অন্যান্য মানুষদের গালগল্প। তো হাদীস যদি মানা না যায়, তাহলে এই যে ইঞ্জিল নামে যে বইগুলো বেচে বেড়ায়, এগুলো একটাও মানা যাবে না। এর ভেতর আল্লাহর কথা নেই। পুরাতন নিয়মে আল্লাহর কথা আছে। কিন্তু নতুন নিয়মের কোনো বইয়ে আল্লাহর কথা নেই। ঈসা মসীহর কিছু গল্প আছে। বাকি সব অন্য মানুষদের গালগল্প। দুই নাম্বার হল, তারা যদি বলে, কুরআন ঠিকভাবে রক্ষা করা হয়েছে, কিন্তু হাদীস ২০০/৩০০ বছর পরে লেখা হয়েছে কাজেই হাদীস মানব না। আপনাদের বলছি, এনকার্টা বলেন আর উইকিপিডিয়াতে যান, কয়েকটা আর্টিকেলের লিংক নেন- অথরশীপ অব দ্য বাইবেল (Authorship of the Bible), ম্যানুসক্রিপ্ট অব দ্য বাইবেল (Manuscript of the Bible), ডেটিং অব দ্য বাইবেল (Dating of the Bible) - এখানে গেলে দেখবেন, বাইবেল যারা লেখার কথা বলেছে, তাদের থেকে চারশ' বছরের ভেতরে একটা লিখিত পাণ্ডুলিপিও নেই। লেখাই হয় নি। তিনশ বছর পরেই লেখা হয়েছে। তিন নাম্বার, আমাদের ধর্মে ঈমান-ইসলাম সব কুরআনে আছে। হাদীসে শুধু ব্যাখ্যা আছে। আর খ্রিস্টান ধর্মে ঈমান-আকীদা সম্পর্কে কিছুই ইঞ্জিলে নেই। খ্রিস্টান ধর্মের প্রথম কথা কী? প্রথম কথা হল, আল্লাহ তিনজন। তিনজনে মিলে একজন। আমি একশ কোটি টাকার চ্যালেঞ্জ দিলাম- এই কথাটা ইঞ্জিল থেকে বের করে দেবেন। নেই। কোথাও নেই। অরিজিনাল সিন, মানুষ সবাই পাপী, এই অরিজিনাল সিন কথাটা ইঞ্জিলের কোথাও নেই। ত্রিত্ববাদ কথাটা ইঞ্জিলের কোথাও নেই। খ্রিস্টানদের ধর্মের যে কোনো একটা আকীদা-বিশ্বাস প্রমাণ করতে হলে ইঞ্জিলের একটা দুটো বাক্যর সাথে ওদের কথা, অর্থাৎ খ্রিস্টান ধর্মের একহাজার হাদীস দিয়ে বানাতে হয়। সেই তারা মুসলিমদের শেখায়, তোমরা কুরআন মানবে, হাদীস মানবে না। কুরআন মেনে হাদীস না মেনে যে চেতনা লাভ হয়, এর দ্বারা খ্রিস্টান হওয়াটা সহজ হয়। কারণ কুরআনে সব আছে, কিন্তু ব্যাখ্যাগুলো হাদীস থেকে নিতে হবে। কুরআনে নামায কায়িমের কথা আছে।

কিন্তু নামায কীভাবে কায়িম করবেন? হাদীস ছাড়া হবে না। এবং আল্লাহ এটা কুরআনে বলেছেন যে, তোমাকে হাদীস মানতে হবে।
তো প্রশ্ন যেটা ছিল, ইসলামই একমাত্র ধর্ম কি না? অবশ্যই। কুরআনে আল্লাহ এটা বারবার বলেছেন। বিশেষ করে একটা আয়াত তো আমরা সবাই জানি:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ

ইসলামই আল্লাহর কাছে একমাত্র ধর্ম।[৮] এর বাইরে অন্য জায়গায় এসেছে, সূরা আল ইমরানে:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে যাওয়ার চেষ্টা করবে, আল্লাহ তার এটা কবুল করবেন না। সে আখিরাতে ধ্বংস হবে।[৯] কাজেই, ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম-পথ মুক্তি দেবে– এই কথা যদি ধারণা করেন, তাহলে আপনি কুরআন অস্বীকার করলেন। কুরআন একেবারে ক্লিয়ারভাবে এটা বলেছে:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

ইসলাম ছাড়া অন্য দীন যে সন্ধান করবে, আল্লাহ সেটা কবুল করবেন না। সে আখিরাতে ধ্বংস হবে।

প্রশ্ন-৩৮৯: বর্তমান ফিতনার যুগে একজন সাধারণ মানুষের দীনের উপর অটল থাকার জন্য কোনো সোহবতের দরকার আছে কি না?

উত্তর: জি। আমার **রাহে বেলায়াত** বইয়ে সোহবতের গুরুত্ব খুব বেশি করে বলা আছে। সোহবত, মুহাব্বত– এগুলো খুবই দরকার।

প্রশ্ন-৩৯০: বর্তমানে আবু হানীফা রাহ. সম্পর্কে অনেক অশালীন কথা শোনা যায়। এটা কতটুকু সত্য?

উত্তর: এই ব্যাপারে খুব পরিষ্কার দলীল-আদিল্লাহসহ **আল ফিকহুল আকবার** নামে যে বইটা আমি লিখেছি– বিস্তারিত পাবেন। ইমাম আবু হানীফা রাহ. তাবিয়ি ছিলেন। তাঁর পক্ষে বিপক্ষে যত কথা আছে সবই লিখেছি। আবু হানীফা রাহ.র প্রতি আমার কোনো ইমোশন নেই। তিনি খারাপ হলে খারাপ বলব, এ নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। তবে তাবিয়ি যুগের মানুষদের ভালোবাসা ঈমানের অংশ। তাঁর

---

[৮] সূরা: [৩] আল ইমরান, আয়াত: ১৯।
[৯] সূরা: [৩] আল ইমরান, আয়াত: ৮৫।

বিষয়ে যে কথাগুলো বলা হয়েছে, আমি যুক্তির সাথে, তথ্য দিয়ে আলোচনা করেছি। বিস্তারিত এই বইয়ে পাবেন। তবে এক কথায় বলা যায়, আবু হানীফা রাহ. সম্পর্কে অশালীন কথা বললে কঠিন গোনাহ হবে। কারণ তিনি তাবিয়ি যুগের এতবড় একজন ফকীহ ছিলেন, সেই যুগের বড় বড় ফকীহরা, মুহাদ্দিসরা তাঁর কাছে লেখাপড়া করেছেন। আর তাবিয়ি যুগের কোনো বুযর্গকে গালি দেয়া যায় না। আমাদের ভুল হতে পারে, হানাফিদের ভুল হতে পারে। এ জন্য ইমামকে গালি দেয়া যায় না।

প্রশ্ন-৩৯১: আপনার 'আল ফিকহুল আকবার' বইতে ইমাম আবু হানীফার নামের শেষে 'রাদিআল্লাহু আনহু' লিখেছেন কেন?

উত্তর: আমি লিখি নি ভাই। আপনি মন দিয়ে পড়লে দেখবেন, ওটা একটা কোটেশন। একটু ভালো করে পড়লে দেখবেন, আরবি একটা কোটেশনের এটা অনুবাদ মাত্র। ওই কোটেশনের ভেতর 'রাদিআল্লাহু আনহু' আছে। ওটা আমি ইচ্ছা করেই রেখেছি। কারণ আমাদের দেশে কিছু ভুল আছে। আমাদের দেশে পীর সাহেবের নামের সাথে 'আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম' লাগায়। অনেকে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' লেখে। তাতে খারাপ কিছু হয় না। সেই পীর সাহেবের কাছেও লোকজন যায়। নবী দাবি করছে, এই রকম পীর আমাদের দেশে আছে। ভণ্ড। 'রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু' এটা সাহাবি ছাড়াও বলা যায়। যেমন আমাদের দেশের একটা মশহুর কিতাব হল **হিদায়া**। ফিকহের কিতাব। লেখক নিজের নামের সাথে 'রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু' লাগাইছেন। 'রাদিআল্লাহু আনহু' মানে হল 'আল্লাহ তার উপর রাজি হয়ে যান'। এটা তো খারাপ দুআ নয়। তো যাই হোক, আবু হানীফা তাবিয়ি ছিলেন, সাধারণ নিয়মে আমরা তাঁকে 'রাহিমাহুল্লাহ' বলি। কিন্তু আরবি কিতাবে অনেক জায়গায় তাবিয়িদের নামের সাথে 'রাদিআল্লাহু আনহু' আছে। আমি ওখানে যে আরবি টেক্সটটা দিয়েছি, আরবি টেক্সটটের ভেতরে আবু হানীফার নামের পাশে 'রাদিআল্লাহু আনহু' লেখা আছে। আমি ওটার অনুবাদ করেছি। দেখবেন ওখানে ইনভারটেড (" ") কমা আছে। কাজেই, ওটা আমার কথা নয়। ওই আরবি টেক্সটের কথা।

তালীম/তাবলীগ/জিহাদ

প্রশ্ন-৩৯২: আমি দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় পড়ালেখা করেছি। আমার পক্ষে কি আলিম হওয়া সম্ভব?

উত্তর: আলিম না হলেও আলিমের মুহাব্বতকারী হন। আলিমের সোহবতে থাকেন। দীনের ইলম আসবে। আলিমদের লেখা বই পড়েন। কুরআন পড়েন। কুরআনের তরজমা পড়েন। তবে নিজেকে মুফতি মনে করবেন না।

প্রশ্ন-৩৯৩: আহলে হাদীসের লোকেরা ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়ে, রাফউল ইয়াদাইন করে এবং এসব আমলের স্বপক্ষে অনেক হাদীস লিখে প্রকাশ করে। আমরা যা করি তার স্বপক্ষের হাদীসগুলো লিখে প্রকাশ করা যায় কি না? যদি যায় তাহলে আপনি লিখবেন কি না?

উত্তর: হানাফি মাযহাবের বড় বড় কর্ণধার আছেন, তাদেরকে লিখতে বলেন। আমি পোক্ত নিয়্যাত করে আছি, আল্লাহর কাছে দুআ করছি, আল্লাহর রাসূল ﷺ এবং সাহাবিদের পরে কারো পক্ষে-বিপক্ষে লেখার ইচ্ছা নেই। তবে আহলে হাদীসে ভাইয়েরা যে আমলগুলো করেন, সেগুলো সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। হানাফিরা যে আমলগুলো করেন, এগুলোরও অধিকাংশ সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কোনো কোনোটা হয়ত দুর্বল। যাই হোক, যারা মাযহাবের কর্ণধার আছেন, তাদেরকে লিখতে বলেন। সুন্নাতকে উজ্জীবিত করার জন্য যতটুকু লেখা দরকার মনে করব, আমি ততটুকু লিখব।

প্রশ্ন-৩৯৪: আমরা দাওয়াত দেব ঈমান-আকীদার, নাকি সালাত-সিয়াম ও অন্যান্য বিষয়ের উপর?

উত্তর: দাওয়াতের বিয়ষয়বস্তু আপনি যাকে দাওয়াত দিচ্ছে তার উপর নির্ভরশীল। যখন আপনি কাফিরদেরকে দাওয়াত দেবেন, অবশ্যই তাকে প্রথমে ঈমানের কথা বলবেন। মুসলিমদেরকে যখন দাওয়াত দেবেন, অবশ্যই ঈমানের কিছু বিষয় বলবেন, যেগুলোর অবহেলা তার মধ্যে আছে। আল্লাহর মুহাব্বত, আল্লাহর নবীর মুহাব্বত। যেহেতু আমাদের সমাজে শিরক আছে, তাওহীদের কথা বলবেন। পাশাপাশি নামায-রোযা এগুলোর কথাও বলতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ যেগুলোর গুরুত্ব বেশি দিয়েছেন– শিরকমুক্ত তাওহীদ, ইত্তিবায়ে রাসূল, বিদআতমুক্ত সুন্নাত, আরকানুল ইসলাম, বান্দার হক, ওযনে কম না দেয়া, পিতামাতার হক আদায়

করা– আল্লাহর যেগুলো মূল ওসিয়ত, আমাদেরও ওইগুলো মূল দাওয়াত হবে। এছাড়া আমার একটা বই আছে, ছোট্ট বই, **আল্লাহর পথে দাওয়াত**, এটা যদি আপনারা কষ্ট করে পড়েন, দাওয়াতের প্রায়োরিটি কী হবে, আমি চেষ্টা করেছি আমার বুঝ অনুযায়ী।

প্রশ্ন-৩৯৫: আপনি গত সপ্তাহে বলেছিলেন, রাসূল ﷺ এর কাছে এক সাহাবি দীন শিখতে আসলে তাকে বিশদিন পর বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। আবার দেখা যায় অসংখ্য সাহাবির কবর পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে। তাহলে দুটো বিষয় দুই রকম হয়ে গেল না? বিষয়টা স্পষ্ট করলে খুশি হব।

উত্তর: সাহাবিরা দুই ধরনের। কিছু সাহাবি রাসূল ﷺ এর কাছে দীন শিখতে আসতেন। আমি যেটা বলেছি, সেটা হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবিরা শিখতে এসেছেন, বিশ দিনে তারা বাড়ি চলে গেছেন, এক মাসও থাকেন নি। কারণ বিশ-ত্রিশ-চল্লিশ এটা ধর্তব্য নয়। 'শিখলে। চলে যাও। আবার এসো'। আবার অনেক সাহাবি হিজরত করেছেন। মুসলিমদের দেশ বিজয় হলে সেই দেশে গিয়ে বাড়িঘর করেছেন। নিজের দেশে আর ফিরে আসেন নি। হিজরত মানে কিন্তু বেড়াতে যাওয়া নয়। এমনকি তাবলীগের যে চিল্লা– এটাও হিজরত নয়। এটা সফর। হিজরত মানে নিজের বাড়িঘর ছেড়ে দিয়ে চিরস্থায়ীভাবে অন্য দেশে চলে যাওয়া। সাহাবিরা দীনের প্রয়োজনে এইভাবে চলে গেছেন। দীন প্রচারের জন্য গেছেন। কেউ কাযি হয়ে গিয়েছেন। কেউ বিচারক হয়ে গিয়েছেন। কেউ গভর্নর হয়ে গিয়েছেন। সেখানেই বাড়িঘর করে থেকেছেন। এটাও মুসলিমদের করা দরকার। যেমন মনে করেন, উত্তরবঙ্গে, দিনাজপুর-রংপুরে খ্রিস্টানরা প্রকাশ্যে মুসলিমদেরকে খ্রিস্টান বানাচ্ছে। জোর করে বানাচ্ছে। দাওয়াত দিয়ে বানাচ্ছে। খ্রিস্টান স্কুলে বাচ্চাদেরকে দুপুরবেলা খাবার দেয়। যিশুখ্রিস্টের নামে প্রার্থনা করায়। কোনো পরোয়া নেই। ধুমধামের সাথে চার্চ বানানো হচ্ছে। একটা গ্রামে ৯৯% মুসলিম, সেখানে খ্রিস্টানদের স্কুল আছে। মুসলিমদের সন্তানেরা সেখানে পড়ে। দুপুরবেলা বাচ্চাদের খাবার দেয়া হয় আর বলা হয়, 'তোমরা যিশুখ্রিস্টের নামে প্রার্থনা করো'। একটা কাফেলা সেখানে গিয়েছিল, ওইসব বাচ্চার বাবাদের খুঁজে পাওয়া যায় নি। তাদের মায়েদের কাছে বলা হয়েছে, আপনারা সন্তানকে খ্রিস্টান কেন বানাচ্ছেন? মায়েরা বলে, তা তো জানি না! এ জন্য ভালো ভালো আলিমদের উচিত ওইসব এলাকায় হিজরত করা। আগে এটা ছিল। নোয়াখালির আলিমরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বাড়ি করত। আমাদের বাংলাদেশের আলিমদের উচিত নিজের এলাকা থেকে হিজরত করে রংপুর-দিনাজপুরে বাড়ি করা। ওখানে দীনের কাজে ব্যস্ত হওয়া।

প্রশ্ন-৩৯৬: তাবলীগ জামাআতকে কি বিদআত বলা যাবে?

উত্তর: আমাদের দুই ধারা। হয় পুরো, নয় ফুরো (ফুরিয়ে যাওয়া)। তাবলীগ জামাআত একটা ভালো চেষ্টা। তারা দীনের দাওয়াতে ভালো কাজ করেন। কিছু ভুলভ্রান্তি আছে। আমরা দলাদলিতে বিশ্বাস করি না। নেক কাজে সহযোগিতায় বিশ্বাস করি, যেটা আল্লাহ বলেছেন। তাদের ভালো কাজগুলো ভালো। সেগুলোর প্রশংসা করব। আবার তাদের মধ্যে যে ভুলগুলো আছে, সেগুলোকে আমরা ভুলই বলব। এটাই আমাদের উচিত।

প্রশ্ন-৩৯৭: তাবলীগ দলটি আপনার কাছে কেমন মনে হয়? যারা তাবলীগ করে তারা মসজিদে রাত্রি যাপন করে, ঘুমায়; ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে নাকি মসজিদ নাপাক হয়ে যায়। তাহলে দলটি সুন্নাতের খেলাফ করে কি না?

উত্তর: প্রবলেম হল, আমরা সব সময় বিরোধিতার চিন্তা করি। মাহফিল জমে একদল আরেক দলের বিরুদ্ধে বললে। সবাই ভালো, সব মুসলিমকে ভালোবাসতে হবে– এগুলো ঠাণ্ডা ওয়ায। ঠাণ্ডা জিনিস মানুষের পছন্দ নয়। বিশেষ করে শীতকালে। গরম ওয়ায ভালো। সবাই খারাপ, আহলে হাদীস খারাপ, হানাফি খারাপ, তাবলীগ খারাপ; সব খারাপ, আমরা ভালো– দেখবেন মাঠ গরম হয়ে যাবে। একদম জিন্দাবাদ। কিন্তু দুর্ভাগ্য হল, আমি আইসক্রিম মার্কা ঠাণ্ডা। যে কারণে আপনাদেরকে গরম করতে পারি না।
তাবলীগ জামাআত এবং বাংলাদেশে যারা দীনের কাজ করেন, কেউই পয়গাম্বর নয়। কেউই পারফেক্ট নয়। প্রত্যেকেই কাজ করেন। কারো না কারো কিছু না কিছু ভুল আছে। এদের ভেতর কিছু মানুষ কাজ করেন, যাদের ভালো বেশি, ভুল কম। আর কিছু মানুষ কাজ করেন, যারা ইসলামের নামে মানুষদেরকে কাফির-মুশরিক বানাচ্ছেন। পীর-পূজা, ব্যক্তি-পূজা, কবর-পূজা, মাজার-পূজা– এগুলো শেখাচ্ছেন। পীর সাহেবের কাছে পাওয়ার আছে, ক্ষমতা আছে; পীর সাহেব রিযিকের মালিক, দৌলতের মালিক, আমার পীর ইমাম মাহদি, আমার হুযুর ছাড়া আর কেউ জান্নাতে যাবে না– এই ধরনের অনেক ইসলামি দল আছে। এদের সংস্পর্শে যাওয়া এইডসের চেয়েও খারাপ। কাজেই, এগুলো থেকে সাবধান থাকবেন। এদের ক্রাইটেরিয়া হল একমাত্র নিজেরা ভালো, আর কেউ ভালো নয়। আলিমদের মন্দ বলা, গীবত করা, নিজেদের প্রধানের বিরাট নাম করা, তিনি আল্লাহর ওলি, কুতুব, মাহদি– এই জিনিসগুলো যারা করে, তাদের সংশ্রবে কখনো যাবেন না। যদি ঈমান বেচতে চান, ভিন্ন কথা। কেউ যদি প্রতারিত হতে চায়, ভিন্ন কথা। আর যদি আল্লাহর জান্নাত চান– আল্লাহর কিতাব আছে, নবীর হাদীস আছে– আলিম-উলামা,

যারা কুরআন-হাদীসের কথা বলেন, তাদের কাছে বসবেন। সন্দেহ হলে অন্য আলিমদেরকে প্রশ্ন করবেন। তবে ওই পর্যায়ের লোকদের কাছে যাবেন না। দ্বিতীয় পর্যায়ের মানুষেরা দীনের কাজ করেন, ভুলভ্রান্তি হয়। তাবলীগ জামাআত এরকমই একটা দল। আমি কিছু কিছু ব্যাপারে তাবলীগ জামাআতকে খুবই মুহাব্বত করি। অনেকেই বলে তাবলীগ জামাআতের এই ভুল আছে, সেই ভুল আছে। আমি বলি, আপনি কোথা থেকে দেখছেন? বাংলাদেশে বসে চোখ মেলে দেখছেন, নাকি সৌদি আরব, কুয়েত, আমেরিকায় বসে চোখ বুজে দেখছেন? বিষয়টা হল, আমরা যে দোষগুলোর কথা তাদের বলি, এগুলো দোষ। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, যেখানে মানুষ শিরক, কুফুর আর ইলহাদে ডুবে আছে– নামায নেই, রোযা নেই, বেপর্দায় ডুবে যাচ্ছে– সেখানে যতক্ষণ কেউ শিরক-কুফরের দাওয়াত দিচ্ছেন না, বিদআতের দাওয়াত দিচ্ছেন না, কিছু ভালো কাজ করছেন, এগুলোকে আমরা অ্যাপ্রিশিয়েট করব, মূল্যায়ন করব, দুআ করব। আমাদের সমাজে আমরা, হুযুরেরা, আপনাদেরকে দাওয়াত দিই; অর্থাৎ আপনাদের যাদের ভেতর দীনের চাহিদা আছে, ওয়ায মাহফিল পর্যন্ত আসেন। কিন্তু বাংলাদেশের প্রায় ৮০% মানুষ ওয়ায মাহফিলেও আসে না। তাদের কাছে দীনের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য তাবলীগ জামাআত বা এরকম দুয়েকটা দল ছাড়া আর কেউ নেই। তো তারা ভালো কাজ করছেন। পাশাপাশি ভুলভ্রান্তি আছে। আমার **এহইয়াউস সুনান** বইয়ে তাবলীগ জামাআতের সুন্নাতের ব্যতিক্রম, সুন্নাতবিরোধী যে কাজগুলোর কথা আমি বলেছি, এগুলোর জন্য মুরব্বিরা দায়ি হবেন, যদি তারা সংশোধন না করেন। সাধারণ মানুষ ইখলাসের সাথেই সেখানে যায়।

তবে যে বিষয়টা আপনি লিখেছেন, মসজিদে শোয়া... মসজিদে একজন মানুষ না জেনে পেশাব করে ফেলেছে, ধুয়ে ফেললেই মসজিদ পাক হয়ে গেল। নবী ﷺ এর মসজিদের ভেতর একজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করে ফেলেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বাধা দিতে দেন নি। পেশাব শেষ হয়ে গেলে সাহাবিদের বলেছেন পানি ঢেলে দিতে। এ জন্য, মসজিদে যারা থাকবেন, অবশ্যই মসজিদের আদব রক্ষা করে থাকার চেষ্টা করবেন। তবে মসজিদে থাকা এমন কোনো অপরাধ নয়, যে অপরাধের কারণে তাবলীগ দলকে খারাপ বলা যেতে পারে। সাহাবিরা মসজিদে শুয়ে থাকতেন। যুবক সাহাবিরা, বাড়িঘর ছিল না– আলী رضي الله عنه, আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর رضي الله عنه, আব্দুল্লাহ ইবন উমার رضي الله عنه– বিভিন্ন হাদীস পাবেন, তাঁরা মসজিদে ঘুমিয়ে থাকতেন।[১] এই যে আমরা ই'তিকাফ করি, মসজিদে ঘুমাই। মসজিদে

---

[১] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-৪৪০, ৪৪১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৪৭৯; সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-৩২১; সুনান নাসায়ি, হাদীস নং-৭২২; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-৬৩৩০।

থাকলে মসজিদের আদব রাখতে হবে। যেন মসজিদ দুর্গন্ধ না হয়। মুসল্লিদের ডিস্টার্ব না হয়। কিন্তু এই ধরনের অকারণ দোষ দিয়ে তাবলীগকে দোষারোপ করার মানে হল, আপনি সব পথ বন্ধ করে দিচ্ছেন। নামায শেখার পথ নেই। রোযা শেখার পথ নেই।

আবার যারা তাবলীগে যান, তাদের প্রতিও আমার অনুরোধ হল, আমরা এখন সবাই জনগণতান্ত্রিক হয়ে গেছি। কোয়ালিটি দেখি না, কোয়ান্টিটি দেখি। আওয়ামী লীগ বেশি ভোট চায়। জামাআতে ইসলাম বেশি ভোট চায়। বিএনপি বেশি ভোট চায়। এখন তাবলীগও বেশি লোক চায়। ফুরফুরাও বেশি লোক চায়। লোক বাড়াতে হবে। কাজ বাড়ানোর খোঁজ নেই। এটা কিন্তু ঠিক নয়। একটা মানুষকে আমি ফযীলতের লোভ দেখিয়ে দলে আনছি– আলহামদুলিল্লাহ। পাঁচ বছর সে আমার সাথে সোহবতে আছে, কিন্তু এখনো সে হারাম ছাড়তে পারল না। সে এখনো বান্দার হকগুলো দিলো না। এই যে একটু আগে আমাদের শাইখ ওয়ায করলেন, আল্লাহ কুরআনে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীসে সবচে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন বান্দার হকের ব্যাপারে। পর্দার কথা, অর্থনৈতিক অধিকারের কথা, সুদ-ঘুষের কথা– এগুলো সে বন্ধ করল না, আমি তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি; আমার অনেক লোক– এটা ঠিক নয়। দাওয়াত নবীওয়ালা হতে হবে। নবীজি ﷺ এর কাছে পাঁচবছর থেকেছে, তারপরেও ওযনে কম দিয়েছে, বউয়ের হক দেয় নি, মিথ্যা কথা বলেছে, মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছে, পিতামাতার হক আদায় করে নি, স্বামীর হক আদায় করে নি– এরকম আপনারা পাবেন না। কাজেই মানের দিকে বা কোয়ালিটির দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

দ্বিতীয়ত আমরা যেটা ভুল করি, তাবলীগের মানহাজ হল ফযীলত। এটা ভালো কথা। কারণ, মানুষদেরকে লোভ দেখিয়ে, ফযীলতের আগ্রহ দেখিয়ে আল্লাহর দীনের পথে আনতে হবে। কিন্তু দুটো জিনিস সমস্যা হয়ে যায়। একটা হল, ফযীলতের ক্ষেত্রে জাল-যয়ীফ হাদীসের ব্যবহার এবং তারগীবের জন্য হেকায়াতের ব্যবহার। আমি অনেকবারই বলেছি, কুরআন-হাদীস, সাহাবায়ে কিরামের ভেতর থাকা দরকার। দ্বিতীয় হল, ফযীলত না হয় জানল, আহকাম শিখবে কী করে? ফরয, ওয়াজিব, হালাল, হারাম, শিরক, কুফর– এগুলো কী করে শিখবে? এগুলো তাবলীগের ভাইয়েরা আলোচনা করতে চান না। কারণ এতে বিতর্ক আসে। এবং বলে যে এর জন্য আলিমদের কাছে যেয়ো। কিন্তু আলিমদের কাছে যেতে পারে না। আলিম কই পাবে! তাবলীগের যারা মুরব্বি, এই জায়গাটায় বড় ভুল হয়ে যাচ্ছে। আলিমদের লেখা পড়তে উৎসাহ দেয়া দরকার। তারা বলেন, মাসআলা-মাসায়িল আলিমদের কাছে শিখে নেবেন, কিন্তু কেউ যায় না। এর ফলে তাবলীগ জামাআত যে জন্য তৈরি হয়েছিল, মানুষ দীন ভালো করে শিখবে..., দশবছর তাবলীগ করার পরেও কুরআন ভুল পড়ে, মাসআলা-মাসায়িল মোটেও জানে না,

এমন লোকের অভাব নেই। এর জন্য দরকার হল তাবলীগের পরে আলিমদের সোহবতে যেতে হবে অথবা ভালো আলিমদের লেখা বই পড়তে হবে। সব আলিম নয়, তাকি উসমানি সাহেবের বইগুলো পড়ুক। শফি সাহেবের **মাআরেফুল কুরআন** পড়ুক। আশরাফ আলী থানভি সাহেবের বইগুলো পড়ুক। বলে দেবেন যে, অমুক অমুক বইগুলো আপনারা পড়েন। আলিমদের সোহবতে যাওয়া আর আলিমদের বই পড়া একই কাজ।

এই ইলম যদি তাদেরকে না শেখাতে পারেন, তাহলে শুধু ফযীলত শিখে ভালো হচ্ছে, ভালোর পাশাপাশি ভয়ঙ্কর খারাপ হতে পারে। সেটা হল, একজন লোক আগে ওযনে কম দিত, মিছে কথা বলত, ঘুষ খেত– এগুলোকে গোনাহ মনে করত। এখন তাবলীগ জামাআতের সাথে দশবছর থেকে লক্ষ-কোটি ফযীলতের একীন (বিশ্বাস) এসেছে। এখন ওগুলো নিয়ে আর চিন্তা করে না। ভাবে যে লক্ষ-কোটি ফযীলতের স্রোতে সুদ-ঘুষ ভেসে যাবে। এতে বিষয়টা আরো খারাপ হয়ে গেল।

প্রশ্ন-৩৯৮: অনেকে পরিবার-পরিজন ছেড়ে ঈদের দিন, এমনকি এক বছরের জন্য, অনেকে তাবলীগে যায়– হাদীসের আলোকে এই বিষয়ে কিছু বলুন।

উত্তর: তাবলীগে যাওয়া ভালো কাজ। পরিবার-পরিজন সমন্বয় করে তাদের ফরয দায়িত্ব পালন করে কেউ যদি যেতে পারেন, যাওয়া যাবেন। কিন্তু এই ধরনের যাওয়াকে দীন-শরীআতে কোথাও উৎসাহ দেয়া হয় নি। আপনাদেরকে আগেও বলেছি, রাসূল ﷺ এর কাছে এক সাহাবি এসেছেন, বিশদিন পর বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। বললেন না যে, চল্লিশ দিন পূর্ণ করে যাও, বা একমাস কিংবা দুইমাস পূর্ণ করে যাও– এমন কিছু বলেন নি। তাবলীগে যাওয়ার ভেতর অনেক বরকত-ফায়দা আছে। বাড়ি বসে যতই চেষ্টা করেন, দীন শেখার জন্য অবসর বের করা যায় না। আলিমদের সোহবত পাওয়া যায় না। কিছুদিন যদি ফারিগ হন অনেক বেশি উপকার হয়। তবে এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি না করি। নফল কাজকে ফরয বানিয়ে না ফেলি। যে কয়দিন পারি থাকব। পরে আবার যাব। নফল ইবাদতের ক্ষেত্রে এটার নাম হল দীন। আল্লাহর রাসূল ﷺ এবং সাহাবায়ে কিরাম কেউ-ই দীনি দাওয়াতের জন্য দিন-সময়, চল্লিশদিন, পঞ্চাশদিন নির্ধারণ করেন নি। এগুলোর ভেতর খাস সাওয়াব আছে মনে করলে বিদআত হবে। নিজের সাধ্যের ভেতর পরিবারের সবকিছু ঠিকঠাক করে যেতে হবে। প্রয়োজন হলে আসতে হবে। চল্লিশ দিনের নিয়্যাত করে বের হয়েছি, মাঝখানে বাড়ি আসলে আমার চিল্লা নষ্ট হয়ে গেল– এগুলো খুবই আপত্তিকর কথা। সুন্নাতবিরোধী চিন্তা। ভালো কাজ সুন্নাতের আলোকে করতে হবে। এক বছরের জন্যও যেতে পারেন, যদি পরিবারের সকল

সমস্যা সমাধান করে যেতে পারেন। তবে স্ত্রীর হক আছে, সন্তানের হক আছে। এগুলো খেয়াল করতে হবে।

প্রশ্ন-৩৯৯: দাওয়াতের ক্ষেত্রে খ্রিস্টধর্ম যে বাতিল, এটা নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে কোন বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে?

উত্তর: বিভিন্ন রকমের আলোচনা আছে। ইঞ্জিলের মধ্যে যে নানান ভ্রান্তি আছে, এটা তাকে দেখানো যাবে। খ্রিস্টান ধর্ম বলতে যে বিষয়টা সে পালন করে, এটা যে ইঞ্জিলে নেই– এটা তাকে দেখানো যাবে। খ্রিস্টধর্ম যে বিশ্বধর্ম নয়, সাধু পলের বানানো ধর্ম– এটা তাকে দেখানো যাবে। এই জন্য আমাদের সব তথ্য জানতে হবে। তাকে বলতে হবে, ভাই, জীবন একটাই। তোমার ঈসা মসীহ ইঞ্জিলের ভেতর যেগুলো বলেছে, সেগুলো তুমি জমা করে মানো, দেখবে ইসলামি শরীআত মানা হয়ে যাবে। কারো কথা মানবে না। তোমার ইঞ্জিল জাল, অরিজিনাল কপি নেই, তারপরও তুমি ওই জাল ইঞ্জিলেই ঈসা মসীহর কথাগুলো এক জায়গায় করো, জমা করে মানো, দেখবে, তোমাকে মুসলিম হতে হবে। তোমাকে তাওহীদপন্থী হতে হবে।

প্রশ্ন-৪০০: বাংলাদেশের মুসলিমদের খ্রিস্টান হওয়ার কারণ কী বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর: একটাই কারণ। বাংলাদেশের আলিমরা আল্লাহর দীনের দাওয়াত দেয় না। খালি ঝগড়া করে। এইটাই কারণ। আর কোনো কারণ নেই। বাংলাদেশে এই শীতেও মনে করেন কয়েক শ ওয়ায মাহফিল হয়েছে। দু-একটা ব্যতিক্রম ছাড়া একটা ওয়ায মাহফিলেও গঠনমূলক কোনো ওয়ায হয় নি। অথচ খ্রিস্টান মিশনারিরা ডোর টু ডোর (ঘরে ঘরে) গিয়ে দাওয়াত দিচ্ছে। অনেকে বলে, ওরা টাকা দেয়। এটা ঠিক নয়। টাকা নিয়ে কেউ খ্রিস্টান হয় না। কেউ না। তারা খ্রিস্টান বানানোর পরে টাকা দেয়। এখন আগেআগে টাকা দেয় না। বিভিন্নভাবে মন জয় করার চেষ্টা করে। ধর্ম দিয়েই করে। তারা কুরআন নিয়ে যায়। হাদীস নিয়ে যায়। সেবা দেয়। আমাদের আলিমরা, দীনের দায়িরা, মুসলিমরা ঝগড়া করি। আমরা যদি দাওয়াত দিতাম, মুসলিমদের ডোরে ডোরে যেতাম, তাদেরকে মসজিদে আনতাম, আলিমদের সাথে সম্পর্ক করতাম, তাহলে কেউই ইসলাম ত্যাগ করত না। যারা ত্যাগ করছে, তারা বুঝছেই না এটা ভুল। তারা বলছে, 'আমরা ঈসায়ি তরীকার মুসলমান। কেউ আটরশি তরীকা, কেউ ফুরফুরা তরীকা, আমরা ঈসায়ি তরীকা। আল্লাহর ওলির তরীকায় যাওয়া যায়, নবীর তরীকায় যাওয়া যাবে না'? তারা বিভ্রান্তিকরভাবে বোঝায়, আস্তে আস্তে কাছে নেয়। এক সময় মানুষ

সত্যি খ্রিস্টান হয়ে যায়।

প্রশ্ন-৪০১: কোনো খ্রিস্টান যদি তাদের চার্চে যাওয়ার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানায়, গেলে কোনো গোনাহ্ হবে কি না?

উত্তর: অনেক গোনাহ হবে। অনেক কোটি গুণ গোনাহ হবে। হিন্দুদের মন্দিরে যাওয়ার চেয়েও চার্চে যাওয়া বেশি কঠিন গোনাহ। কারণ খ্রিস্টানরা হল মুসলিমদেরকে ঈমানহারা করার জন্যই এসেছে। তাদের একটাই কাজ। সেটা হল মুসলিমদেরকে যে কোনোভাবে ঈমানহারা করানো। দ্বিতীয়ত, কোনো মুসলিম যদি খ্রিস্টান-মুরতাদ হন– একটা হল অরিজিনাল জন্মগত খ্রিস্টান, তার ধর্ম তার, আমাদের ধর্ম আমাদের– আর মুসলিম খ্রিস্টান হয়েছেন, তিনি আরো ঘৃণিত। এবং তিনি মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর ঈমান আনার পর এখন তাকে গালি দিচ্ছেন। কুরআনে পেশাব করছেন। তিনি আরো বেশি পাপ করছেন। এ জন্য তার সাথে কোনো রকম সামাজিক সম্পর্ক রাখা বৈধ নয়। তিনি ভাই হোন, আত্মীয় হোন– তার প্রতি আমাদের দুটো দায়িত্ব– একটা হল, তাকে জড়িয়ে ধরে, পা জড়িয়ে ধরে দাওয়াত দেয়া, আলিমদের কাছে নিয়ে যাওয়া, বোঝানোর চেষ্টা করা, আর যতদিন তিনি ফিরে না আসেন, তার সাথে সকল প্রকার সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক সম্পর্ক বয়কট করা। এটা আমার ঈমানের দায়িত্ব। চার্চে যাওয়া কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়। যেখানে শিরক হচ্ছে। খ্রিস্টান ধর্ম অনুযায়ী, খ্রিস্টান ধর্মের বাইবেলে আছে, মূর্তি রাখলে সে দোযখে যাবে, অনন্তকাল দোযখে থাকবে। অথচ যে কোনো চার্চে মূর্তি থাকে। যিশুখ্রিস্টের মূর্তি, মরিয়মের মূর্তি। এরা ভয়ঙ্কর পাপের ভেতর ডুবে থাকে, আবার নিজেদেরকে জান্নাতি বলে মনে করে।

প্রশ্ন-৪০২: জাকির নায়েক যে ইসলাম প্রচার করছেন সেটা কুরআন-হাদীসের আলোকে কতটুকু গ্রহণযোগ্য? বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ তার প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করে। আপনি জাকির নায়েকের সাথে একমত নাকি একমত নন?

উত্তর: আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ এর পরে কারো সাথেই একমত না। তবে ডা. জাকির নায়েককে ভালোবাসি। তার দাওয়াত দ্বারা উম্মাত উপকৃত হচ্ছে। যারা সমালোচনা করেন তারা কোনো কাজ করেন না উম্মাতের জন্য। তারা শুধু সমালোচনা করেন।

প্রশ্ন-৪০৩: ডাক্তার জাকির নায়েকের ব্যাপারে আলোচনা করবেন। তার সম্পর্কে আমরা এখন অনেক কিছুই শুনতে পাচ্ছি।

উত্তর: দুনিয়ায় আর কাজ নেই, এখন মুসলিমদের এটাই হল ব্যারাম। মুসলিম

খ্রিস্টান হচ্ছে, নো প্রবলেম। ফাসিক হচ্ছে, নো প্রবলেম। জিনা-ব্যভিচার, সুদ-ঘুষে ডুবে আছে, নো প্রবলেম। নামায পড়ে, রোযা রাখে, আবার ইসলামের সমালোচনা করে, এমন লোক আছে, না নেই? নামায পড়ে, আবার বোরকার সমালোচনা করে, এমন লোক আছে, না নেই? বে-ঈমান হয়ে যায়। এটাকে বলা হয় মডার্ন ইসলাম। অর্থাৎ ইসলাম ভালো; তবে কিছু মানব, সব মানার দরকার নেই। ওই যুগের জন্য ছিল। এই যুগে সব লাগে না। এই চিন্তাটাই কুফরি। এই রকম মুসলিম আপনার আমার আশে পাশে লক্ষ-কোটি। মসজিদ কমিটির ভেতরে আছে। মসজিদের ভেতরে আছে। নামায পড়ে, হজ্জ করে– তাদের ভেতরে আছে। এটা নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু জাকির নায়েকের নিয়ে মাথা ব্যথা। অথচ জাকির নায়েক কিছুই করছে না। সে দীনের কিছু কথা বলছে। আপনার ভালো লাগলে ভালো বলেন। না হলে শুনেন না। জাকির নায়েকের সমালোচনা করেও কোনো ফায়দা হচ্ছে না। তার পক্ষে বলেও কিছু হচ্ছে না। আমরা অকারণে জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে যে কথাটুকু বলছি, যত বই লিখছি, এগুলো যদি অন্যান্য দীন-বিরোধী কাজে লিখতাম, উপকার হত।

প্রশ্ন-৪০৪: নাস্তিকদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এর জন্য আমরা কী পদক্ষেপ নিতে পারি? তারা শুধু বিজ্ঞানের কথা বলে।

উত্তর: নাস্তিকতা একটা ব্যারাম। বড় বড় বিজ্ঞানি কেউ নাস্তিক নন। বিজ্ঞানই তো আস্তিকতা প্রমাণ করে। বিজ্ঞানই প্রমাণ করে এই বিশ্ব কোনোদিন একা হতে পারে না। নাস্তিকরা আমাদের আস্তিকদের পাগল বলে। কিন্তু বড় পাগল নাস্তিক। খুব ভালো করে বোঝেন, নাস্তিকতা মূলত ব্যাধি। এর প্রসারের জন্য আমরা দায়ি। যত ঝগড়া রাফউল ইয়াদাইন নিয়ে। মাযহাব নিয়ে। ছেলেপেলে নাস্তিক হচ্ছে, এটা নিয়ে কিন্তু কেউ প্রশ্ন করে না। কোনো ঝগড়া নেই। নাস্তিক হয় ভালো। কিন্তু যেন হানাফি বা আহলে হাদীস না হয়– এরকম চিন্তা আমাদের। যেটা বলছিলাম, মনে করেন, একজন খুব দামি গাড়ি নিয়ে আসল। এত সুন্দর গাড়ি জীবনে দেখেন নি। মালিক গাড়ির কাছে গেলে দরজা অটোমেটিক খুলে যায়। আর মালিক ছাড়া অন্য কেউ গেলে পিটপিট করে আলো জ্বলে। শব্দ হয়। বিরাট সুন্দর গাড়ি। মালিককে জিজ্ঞেস করা হল, ভাই, গাড়িটা কোন কোম্পানি বানাইছে? সে বলল, আরেহ, কোনো মালিক বানায় নি। যমুনা সেতুর উপর দিয়ে দুটো ট্রাক যাচ্ছিল। হঠাৎ দুই ট্রাক মুখোমুখি অ্যাক্সিডেন্ট করে গড়াতে গড়াতে পানির ভেতর পড়েছে, সেখান থেকে এই গাড়িটা বের হয়েছে। আপনি তাকে পাগল বলবেন না? বিজ্ঞান প্রমাণ করে, ওই গাড়ির চেয়েও বিশ্বটা অনেক বেশি বৈজ্ঞানিকভাবে সৃষ্টি। এই বিশ্ব কোনোদিনই একা হতে পারে না। এই বিশ্ব নিজেকে নিজে সৃষ্টি করতে পারে না।

কারণ এটা ক্রমান্বয়ে ক্ষয়শীল। কাজেই সবকিছু প্রমাণ করে, এর একজন স্রষ্টা আছে। শুধু আমরা তাকে দেখছি না। জীবন, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, বিজ্ঞান– সবকিছুই প্রমাণ করে এটা এমনি হতে পারে না। এর একজন বৈজ্ঞানিক স্রষ্টা আছে। যে যত বিজ্ঞান পড়ে, যে যত ডাক্তারি পড়ে, সে তত আস্তিক হয়। দেখবেন, যারা আর্টসে পড়ে, সায়েন্সে পড়ে এরা বিজ্ঞানের কথা বলে। ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির কেউ নাস্তিক হয় না। মেডিকেল কলেজ থেকে কেউ সহজে নাস্তিক হয় না। নাস্তিকতার কথা কারা বলে? একটু খোঁজ নিয়ে দেখেন, পলিটিক্যাল সায়েন্স, নইলে বাংলা, নইলে দর্শন, যেখানে কোনো লেখাপড়া নেই, জ্ঞানও নেই, বিজ্ঞানও নেই– ওরা বলে। আপনার এই দেহটাকে যদি দেখেন, এত বৈজ্ঞানিকভাবে তৈরি, যেটা কল্পনা করা যায় না। আমাদের এটা জানতে হবে। ঈমানকে প্রসারিত করতে হবে। ঈমান ফিতরাতি। প্রাকৃতিকভাবেই মানুষ ঈমান আনে। যুবক বয়সে অস্থিরতা থাকে। দীন পালন করলে আকাম করা যায় না। এই জন্য নাস্তিকতার কথা বলে।

প্রশ্ন-৪০৫: আপনি বলে থাকেন, জিহাদ করতে গেলে রাষ্ট্রের অনুমতি লাগে। আমাদের প্রিয় নবী ﷺ বদরসহ যে জিহাদগুলোয় নেতৃত্ব দিয়েছেন, তিনি কি তখন ক্ষমতায় ছিলেন নাকি ক্ষমতাধরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন?

উত্তর: অবশ্যই ক্ষমতায় ছিলেন। তিনি মদীনায় গিয়ে রাষ্ট্রপ্রধান হলেন। তারপরে জিহাদ করলেন। রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার আগে তিনি কখনো জিহাদ করেন নি। সহীহ বুখারির হাদীসে তিনি বলেছেন:

إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ

'রাষ্ট্রপ্রধান হল ঢাল। তাকে সামনে রেখে যুদ্ধ করতে হয়'।[২] রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার আগে তিনি জিহাদ করেন নি। এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করে।

প্রশ্ন-৪০৬: যুগেযুগে যেসব নবীর উপর জিহাদ ফরয ছিল, তাঁর অনুসারীরা জিহাদ না করার জন্য বিভিন্ন রকম তালবাহানা করত। ফলে আল্লাহ তাদের শাস্তি দেন। আমরা যারা একই রকম তালবাহানা করছি, আল্লাহ কি তাদের মতো একই রকম শাস্তি দেবেন না?

উত্তর: তালবাহানা করলে তো শাস্তি দেবেনই। যদি জিহাদ নিশ্চিত ফরয হওয়ার পরেও কেউ তালবাহানা করে, তাহলে আল্লাহ তো শাস্তি দিতেই পারেন। আর যদি ফরয হওয়ার আগেই খারিজিদের মতো জিহাদ করে মুসলিম মারতে থাক, তাহলে

---

[২] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-২৯৫৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৮৪১; সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-২৭৫৭; সুনান নাসায়ি, হাদীস নং-৪১৯৬; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-১০৭৭৭।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মুতাওয়াতির হাদীস আছে। হাদীসটার মূল কথা হল, শেষ জামানায় যুবকেরা খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলবে আর সবচে' অন্যায় কাজ করবে। মুসলিমদের মারবে, কাফিরদের বাদ দেবে। মানুষের ভেতর ফিতনা করবে।

يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ

পাখির গায়ে তীর মারলে যেভাবে গা ভেদ করে তীর বেরিয়ে যায়, ওরাও সেভাবে দীনের ভেতর ঢুকে দীন থেকে বেরিয়ে চলে যাবে।[৩] এখন তুমি কোন দলে যাবে সেটা হিসাব করো।

প্রশ্ন-৪০৭: যুগেযুগে যে সমস্ত নবীর উপর জিহাদ ফরয ছিল তার অনুসারীরা জিহাদ না করার কারণে তাদের উপর আল্লাহর গযব নেমে এসেছে। অথচ আমরা জিহাদ করছি না। মুসলিমদের রাষ্ট্রপ্রধান হবে পুরুষ, অথচ আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান মহিলা। মুসলিমদের রাষ্ট্রপ্রধান হবে কুরআন-হাদীসের জ্ঞানে জ্ঞানী। যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নেই। মুসলিমদের রাষ্ট্রপ্রধানের বৈশিষ্ট্য হবে ইসলামের কল্যাণে কাজ করা।

উত্তর: জিহাদ ফরয হওয়ার পরেও কেউ যদি জিহাদ না করে তার গোনাহ হবে। আমাদের দীন, শোনো, আল্লাহ কুরআনে বলেছেন:

 يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...

যাদের উপর জিহাদ ফরয হয়েছে, কোনো ওযর নেই, তারা বসে যদি থাকে, তারা যারা জিহাদ করেছে তাদের তুলনায় সমান না। তবে দুইজকেই আল্লাহ মাফ করবেন, রহমত দেবেন। তবে যারা জিহাদ করবে তারা বেশি সাওয়াব পাবে।[৪] এটা হল নরমাল জিহাদ। যখন জিহাদ ফরযে কিফায়া থাকে। আর যখন ফরযে আইন হয়, তখন জিহাদ না করলে গোনাহ হয়। নবীর সামনে কেউ যদি নবীর কথা অস্বীকার করে তাহলে সে মুনাফিক হয়ে যায় আর উম্মাতের ভেতরে মতভেদ থাকতেই পারে। আর জিহাদ ফরয না হলে জিহাদের নামে যারা মানুষ খুন করবে, তাদের জন্য ভয়ঙ্কর শাস্তি রয়েছে। আর আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান মহিলা– এটা এক নাম্বার মিথ্যা কথা। আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান কে? (শ্রোতাদের উত্তর: আব্দুল হামিদ) আব্দুল হামিদ মহিলা, তাই না? রাষ্ট্রপ্রধান আর সরকার প্রধানের পার্থক্য বোঝ না। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপ্রধান না রে বাবা। উনি সরকার প্রধান। আর কুরআন-হাদীসের জ্ঞান না থাকলে সে রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবে না, এটা কে বলেছে তোমাকে? ফাসিক, ফাজির মামুন, ইয়াযীদ, আকবারের মতো মানুষেরাও মুসলিমদের রাষ্ট্রপ্রধান

---

[৩] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-৩৩৪৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১০৬৪; সুনান নাসায়ি, হাদীস নং-৪১০১।

[৪] সূরা: [৪] নিসা, আয়াত: ৯৫

হয়েছে। সেই রাষ্ট্রপ্রধানের নেতৃত্ব ছাড়া, জিহাদ দূরের কথা, কোনো জুমুআর নামায পড়তেও আলিমরা জায়িয বলেন নি। রাষ্ট্রপ্রধানের কুরআন-হাদীসের আলিম হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যদি না হয়, সেক্ষেত্রে স্পষ্ট কুফরি প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত তোমাকে রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে। তুমি বলেছ, মুসলিমদের রাষ্ট্রপ্রধানের কাজ হবে ইসলামের কল্যাণে কাজ করা। তাহলে ইয়াযীদ কী করত? আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ান কী করত? হিশাম কী করত? সাহাবিরা তাদের আনুগত্য করেছেন। তাহলে সাহাবিরা কাফির হয়ে গেছেন? এগুলো থাকা উত্তম। এগুলো মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের বৈশিষ্ট্য। এগুলো করতে হবে। না করলে চাপ দিতে হবে। বাধ্য করতে হবে। কিন্তু সুস্পষ্ট কাফির না হওয়া পর্যন্ত আনুগত্য বর্জন করা যাবে না।

প্রশ্ন-৪০৮: অনেকেই আছে, ইসলাম বিদ্বেষী। নবীজি ﷺ কে সহ্য করতে পারে না। ইসলামকে কটাক্ষ করে। রাষ্ট্র যদি তাদের শাস্তি না দিয়ে নিরাপত্তা দেয়, সেক্ষেত্রে মুসলিমদের করণীয় কী?

উত্তর: বড়ই মুশকিল। রাষ্ট্র যদি অপরাধীদের শাস্তি না দেয়, আমরা আইন নিজের হাতে তুলে নিতে পারি না। রাষ্ট্র অপরাধ করছে, রাষ্ট্র তার শাস্তি পাবে। ব্লগে অধিকাংশ অমুসলিম বাকস্বাধীনতার নামে ইসলামের বিরুদ্ধে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নামে খুব নোংরা কথা লিখছে। যা সাম্প্রদায়িকতা। এত অশালীন কথা লেখে, যদি আপনার বাপের নামে, আপনার রাজনৈতিক নেতার নামে লিখত, আপনি সহ্য করতে পারতেন না। রাষ্ট্রীয় আইন, সংবিধানের আইন, ক্রিমিনাল ল, আন্তর্জাতিক ল দিয়ে ওদের শাস্তি দেয়া উচিত। যদি রাষ্ট্র এটা না করে, রাষ্ট্র অপরাধী হবে। পাপী হবে। এবং তাদের উপর গযব আসবে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই মুমিন নিজের হাতে আইন তুলে নিতে পারে না। এতে কোনো লাভ হবে না। আল্লাহর বিরুদ্ধে, রাসূল ﷺ এর বিরুদ্ধে বলার লোক কমবে না। একটা ভালো মুসলিম কমবে। এ ছাড়া কোনো লাভ হবে না। তাই রাষ্ট্র যেন এই আইন বাস্তবায়ন করে, আমরা এটা দাবি করব। এমন ঈমানঅলা মানুষ তৈরি করতে হবে, যে ঈমান আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে। এই ঈমান যখন বাংলাদেশের শতকরা বিশজন লোকের ভেতর চলে আসবে, তখন রাষ্ট্র শাস্তি দিতে বাধ্য হবে। আর যদি মনে করো, না, আমি মরেই যাই, তাহলে ঈমানদার কমে যাবে আর এই বেঈমানগুলোই থেকে যাবে।

প্রশ্ন-৪০৯: সূরা তাওবার মধ্যে এক আয়াতে [নং-১১১]:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ

আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনের জান-মাল কিনে নিয়েছেন। তারা লড়াই করে। নিজেরা মরে, অন্যকে মারে। এখানে মরা এবং মারার দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর: এটা খুব সহজ কথা। কিতাল যখন আমরা করব, কখনো মরব কখনো মারব। তবে কিতালের জন্য শর্ত আছে। আপনি এখন আওয়ামী লীগের অফিসে গিয়ে মারামারি করে মরে গেলেন– কিতাল হল নাকি? এমন হলে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন কাতিল এবং মাকতুল (খুনি এবং নিহত) দুজনই দোযখে যাবে। কিতাল যখন বৈধ হবে, অর্থাৎ ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান অর্ডার দেবে, অস্ত্রধারী অমুসলিমদের বিরুদ্ধে আপনি কিতাল করবেন। এক্ষেত্রে মরলে আপনি শহীদ। মারলে আপনি গাযি। কিন্তু যদি এই পর্যায়ে না আসে..., যেমন নামায খুব বড় ইবাদত, কিন্তু আপনি এমন সময় নামায পড়লেন যখন নামায পড়া হারাম, তাহলে আপনার গোনাহ হবে। কিতালটাও তাই।

প্রশ্ন-৪১০: জিহাদের ব্যাপারে আপনি এক রকম বলেন। আবার অন্যরা আরেক রকম বলে। যে জিহাদ আপনার কাছে মহা হারাম, সেই একই জিনিস আরেক দলের কাছে জান্নাতের পথ। সাধারণ মানুষ হয়ে আমি কোনটা ঠিক মনে করব?

উত্তর: যে কোনো এক দলে চলে যান– এটাই তো সাধারণ মানুষের কাজ। 'জিহাদ মহা হারাম' আমি কবে বললাম! জিহাদ আল্লাহর ফরয ইবাদত। যেমন নামায আল্লাহর ফরয ইবাদত। ধরেন একজন ঠিক বেলা ডোবার সময় নামায পড়ছে এবং কুরআন দিয়ে দলীল দিচ্ছে:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ

বেলা গড়া থেকে রাত পর্যন্ত নামায পড়তে হবে।[৫] কাজেই সে বেলা ডোবার সময় নামায পড়ছে। তো আমি তাকে বলব, বেলা ডোবার সময় নামায পোড়ো না, নবীজি ﷺ নিষেধ করেছেন। জিহাদের কিছু শর্ত আছে। আমরা যতটুকু বুঝি। সবকিছুতেই তো মতভেদ আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ

রাষ্ট্রপ্রধান ঢাল, তাকে নিয়ে লড়াই করতে হবে।[৬] কাজেই জিহাদ রাষ্ট্রপ্রধান ছাড়া,

---

[৫] সূরা: [১৭] ইসরা, আয়াত: ৭৮।
[৬] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-২৯৫৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৮৪১; সুনান আবু দাউদ, হাদীস

রাষ্ট্র ছাড়া হয় না। এটা আমার কথা নয়। আমরা সৌদি আরবের আলিমেদের কাছে পড়েছি। চার মাযহাবের ইমামদের মত। আকীদার বইগুলোতে পাবেন। জিহাদ, কিতাল, গনীমত, বিচার– এগুলো রাষ্ট্রের দায়িত্ব। জিহাদ তো দূরের বিষয় ঈদ এবং জুমুআর নামায রাষ্ট্রের অনুমতি ছাড়া হয় না। তাই যদি না হবে, আমি আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর এক দলের বিরুদ্ধে জিহাদে লেগে যাব, কারণ সে কুফরি মতবাদ প্রচার করছে। আরেক দল মনে করবে, আমি কুফরি মতবাদ প্রচার করছি, সে আমার বিরুদ্ধে জিহাদ করবে। এইভাবে মুসলিমরা নিজেদের ভেতর যুদ্ধ করে শেষ হয়ে যাবে। তাই জিহাদের জন্য রাষ্ট্র লাগবে। দ্বিতীয় বিষয় হল, স্বশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। এটাও আল্লাহ কুরআনে বলেছেন। আমার জানা মতে এই ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। খারিজি, যারা আলী ﵁ কে শহীদ করেছেন, এরা ছাড়া কোনো সাহাবি রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমোদনের বাইরে জিহাদ করেছেন– এমনটা পাবেন না। আমরা জিহাদ করে তাড়াতাড়ি ফলাফল নিতে চাই। তাড়াতাড়ি করলেই ভালো ফল পাওয়া যায় না। অনেক জিহাদ হল তো। রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের বাইরে জিহাদ করলে হয়ত শাহাদত নসীব হয়, কিন্তু জিহাদের ফলাফল পাওয়া যায় না। যারা এর আগে জিহাদ করেছেন, রাষ্ট্র ছিল না, তারা রাষ্ট্র বানিয়ে নিয়েছেন। সাইয়িদ আহমাদ বেরেলবি রাহ., তিনি রাষ্ট্রের ঘোষণা দিয়েছেন, ইমাম হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন, তারপর জিহাদ করেছেন। মোল্লা ওমর, রাষ্ট্রের ঘোষণা দিয়েছেন, ইমামের দায়িত্ব নিয়েছেন, জিহাদের ঘোষণা দিয়েছেন। সিরিয়াতেও একই অবস্থা। এরপরও ফলাফল আল্লাহর হাতে। আমরা মনে করি, একটু মারামারি করলেই জিতে যাব। বিষয়টা অমন না। কুষ্টিয়া আলিয়া মাদরাসার এক ছাত্র একটা আরবি প্রশ্ন দিয়ে গেছে, আপনি জিহাদের জন্য শর্ত করেছেন, এসব ঠিক না, এই কথা দুনিয়ার কেউ বলে নি, আপনি গলত বলেছেন। যে বিষয়গুলো ও বলেছে সব আমার বইতেই আছে। যারা বলেন জিহাদের জন্য রাষ্ট্র লাগে না, রাষ্ট্রপ্রধান লাগে না, তারা একটা দলীল দেন। সেটা হল, হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় চুক্তি হল কোনো মুসলিম যদি মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় চলে আসে তাকে মক্কায় ফিরিয়ে দেয়া হবে। কিছু মুসলিম মাযলুম ছিলেন। আবু বাসির, আবু জান্দাল ইত্যাদি। তারা পালিয়ে মদীনায় গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে মক্কায় ফিরিয়ে দেন। কাফিরদের হাতে তুলে দেন। তো যে কাফিররা তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছিল, তাদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে তাদেরকে কতল করে আবার মদীনায় ফিরে আসেন সাহাবিরা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার রাষ্ট্রের ভেতর থেকে তোমরা যুদ্ধ করতে

নং-২৭৫৭; সুনান নাসায়ি, হাদীস নং-৪১৯৬; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-১০৭৭৭; মুসনাদ আবু ইয়া'লা, হাদীস নং-৬৩২৫; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস নং-১৮৮১৬।

পার না। তখন তারা মদীনা রাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে সিরিয়া যাওয়ার পথে পাহাড়ের ভেতরে একটা গ্রুপ তৈরি করলেন। যখনই ওই পথে কাফিরদের বাণিজ্যিক কাফেলা যেত, উনারা আক্রমণ করতেন। শেষমেশ কাফিররাই বলতে লাগল যে, হুযুর, আপনি ওদেরকে মদীনায় নিয়ে নেন। ওদের জ্বালায় আমরা ব্যবসা করতে পারছি না।[৭] তো এটা দ্বারা তারা দলীল দেন যে, আবু বাসির, আবু জান্দাল নবীজি ﷺ এর অনুমতি ছাড়া জিহাদ করেছেন। কাজেই যুদ্ধের জন্য রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি লাগে না। এখানে বোঝার ভুল আছে। তারা রাষ্ট্রের ভেতরে থেকে কিন্তু জিহাদ করেন নি। বরং এই ঘটনা দিয়ে আহমাদ ইবন হাম্বল, আবুল হাসান আশআরি দলীল দিয়েছেন, এই ঘটনা দ্বারা বোঝা যায়, রাষ্ট্রের নাগরিকরা রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ছাড়া জিহাদ করতে পারবে না। যদি একান্ত করতেই চায়, তাহলে রাষ্ট্রের বাইরে চলে যেতে হবে। এমন আরেকটা ঘটনা আছে। একজন অন্ধ মানুষ, তার স্ত্রী রাসূল ﷺ কে খুব গালি দিত। একদিন অমন গালাগালি করছে। স্বামী একটা ছুরি লুকিয়ে রেখেছিল। যখন তার বউ গালাগালি করছিল, বউয়ের পেটের ভেতর ছুরি ঢুকিয়ে দেন। খুন করে ফেলেন। সকালে খুনের কথা জানাজানি হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ সবাইকে ডাকলেন। বললেন, কে খুন করেছ বলো, নইলে তদন্তের মাধ্যমে বের করে শাস্তি দেয়া হবে। বিচার হবে। অন্ধ লোকটা বলল, হুযুর আমিই খুন করেছি। কেন খুন করেছ? সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার বউটা আমার খুব প্রিয় ছিল। আমার দুটো বাচ্চাও আছে ছোট। কিন্তু আমার নিজের জন্য তাকে খুন করি নি। সে আপনাকে গালি দিত। আমি যত নিষেধ করেছি, সে শোনে নি। আমি সহ্য করতে না পেরে তাকে খুন করে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:

أَ□ اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ

তোমরা সবাই সাক্ষী থাকো, এই লোকটা তার খুনের শাস্তি পাবে না।[৮] এই হাদীস দ্বারা তারা দলীল দেয়– এর দ্বারা বোঝা গেল স্বশস্ত্র না হলেও তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা যাবে। আসলে কিতাল আর কতল দুটো ভিন্ন জিনিস। কিতাল হল যুদ্ধ আর কতল হল হত্যা। এই হাদীস প্রমাণ করে, যদি কেউ হত্যা করে তাকে শাস্তি পেতে হবে। তবে দুটো সময়ে সে শাস্তি পাবে না। কিন্তু বিচার হবে। হাতকড়া পরানো হবে, জেলে নেয়া হবে। যদি প্রমাণিত হয়, সে আত্মরক্ষার জন্য হত্যা করেছে, অথবা রাসূল ﷺ কে কেউ গালি দিচ্ছিল, নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু শোনে নি, সেই

---

[৭] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-২৭৩১; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-১৮৯২৮; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস নং-৪৮৭২।

[৮] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৩৬১; সুনান নাসায়ি, হাদীস নং-৪০৭০; সুনান দারাকুতনি, হাদীস নং-৩১৯৪; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস নং-৮০৪৪।

অবস্থায় সে তাকে হত্যা করে ফেলেছে, তাহলে ইসলামি শরীআর বিচারে ওই ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড পাবে না। কিন্তু বিচার হবে। এটা কতল, কিতাল না। এটা প্রমাণ হতে হবে, সে আত্মরক্ষার জন্য মেরেছে অথবা রাসূল ﷺ এর জন্য মেরেছে। **আল ফিকহুল আকবার** বইয়ের জিহাদ অধ্যায়ে এই সম্পর্কে [আলোচনা] আছে। আমার আকীদার বইয়ে আছে। অন্যান্য পুরনো আলিমদের বইয়ে আছে। জিহাদের জন্য রাষ্ট্র, রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমোদন, রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব এবং যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে জিহাদ হবে- এই ব্যাপারে কারো কোনো ইলমি ইখতিলাফ আছে বলে আমার জানা নেই। গতকাল এক জায়গায় ইফতারের দাওয়াতে গেছিলাম। একজন বলছেন, ইসলামি সমাজ যতদিন না হবে ততদিন রোযা দিয়ে তাকওয়া অর্জন হবে না। এই ধরনের অনেক আবেগী কথা বললেন তিনি। আমিও একমত। আমরা সবাই ইসলামি সমাজ চাই। কিন্তু চাওয়ার পদ্ধতিটা কেমন হবে! ইসলামি রাষ্ট্র কীভাবে হবে? সমাজে মুত্তাকির সংখ্যা শতকরা একজন। তাহলে কি নন-মুত্তাকি লোকদের ফাঁকি দিয়ে কোনো রকম ক্ষমতায় গিয়ে বা বন্দুকের নলের জোরে ক্ষমতায় গিয়ে ইসলামি রাষ্ট্র কায়িম করব? এতে লাভ কতটুকু হবে? সমাজে মুত্তাকি মানুষ তো শতকরা একজনই থেকে গেল। তাহলে তাকওয়া কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে? দাওয়াতের কোনো বিকল্প নেই ভাই। আমরা যতই আবেগী হই, কষ্ট লাগে, ব্যথা লাগে, আল্লাহ জানেন আমরা কত ব্যথা পাই। আমরা আল্লাহর কাছে কত কাঁদি, তিনি ভালো জানেন। এটা মানুষের কাছে বলার জিনিস নয়। কিন্তু আমাদের করণীয় কী? সমাজ পরিবর্তন আমাদের হাতে নেই। সমাজ একটা নৌকা। নৌকায় আমি দুদিন আছি, চলে যাব। আরেকজন আসবে। সমাজ ভালো হবে। আবার খারাপ হবে। কখনো একটু ভালো হবে কখনো একটু খারাপ হবে। তোমরা ইমাম মাহদির জন্য জিহাদ করবা! সাত বছর! তারপর আবার খারাপ হয়ে যাবে। আপনারা ইতিহাস পড়েন। মানুষের প্রকৃতি খারাপ। তাদেরকে ভালোর দিকে টানলে তারা আবার খারাপের দিকে চলে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীসে এটাই বলেছেন। ভালো হবে আবার খারাপ হবে। রাতারাতি সবাইকে মেরে তুমি কিছু একটা করে ফেলবে- এতে ভালো মানুষেরা মারা যাবে। সমাজে পঁচানব্বই ভাগ মানুষ ইসলাম মানেন না। নামায পড়লেও সুদ ছাড়েন না। আমি এই পঁচানব্বই ভাগ মানুষ মেরে ইসলাম কায়িম করে ফেলব, এটা তো হয় না। তাদেরকে দাওয়াত দিতে হবে, বোঝাতে হবে। আমরা চেষ্টা করতে থাকি।

প্রশ্ন-৪১১: আল্লাহ পাক কুরআনে বলেছেন যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষণ এবং প্রস্তুতি নিতে হবে। অথচ আপনি সব সময় এর বিপরীত বলেন। কারণ কী? আপনি তো কুরআন বিরোধী।

উত্তর: আমি কখনো এর বিপরীত বলি না। যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হবে, প্রশিক্ষণ নিতে হবে, তবে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে। সেই আয়াতটা হল:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

সাধ্যের ভেতরে প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রথমে আসলো হারাকাতুল জিহাদ। আসলো আমার কাছে, স্যার! আমাদের এখানে যেতে হবে। আমি বললাম, তোমাদের এসব কে বলেছে? অস্ত্রের ট্রেনিং নেয়া আল্লাহ আমার জন্য ফরয করে দেন নি। আর রাষ্ট্র আমাকে নিষেধ করছে, অস্ত্রধারণ করতে পারবে না। যেখানে আল্লাহর বিধান নেই, অর্থাৎ আল্লাহ ফরয করে দেন নি, আর সেটা যদি রাষ্ট্র নিষেধ করে, তাহলে রাষ্ট্রের কথা মানতে হবে। দ্বিতীয় কথা,এটা দিয়ে কী করবা তোমরা? বলে–

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ

শত্রুরা ভয় পাবে।[১] তোমার থ্রি নট থ্রি রাইফেল দেখে এটম বোমার মালিক আমেরিকা ভয় পেয়ে যাবে? এটা ভয় পাওয়ানো হবে নাকি? সব থেকে বড় কথা হল, এই আয়াতে যে সম্বোধন করা হয়েছে, এটা রাষ্ট্রের প্রতি করা হয়েছে। অর্থাৎ এই ট্রেনিংয়ের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে জনগণ করবে। রাষ্ট্র যদি অবহেলা করে দায়ি থাকবে রাষ্ট্র। আমি রাষ্ট্রের ত্রুটির সমালোচনা করতে পারি, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারি, কিন্তু রাষ্ট্রের আইন লঙ্ঘন করে অস্ত্র বহন করতে পারি না। কারণ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ কখনো আমাকে অস্ত্র বহন করতে বলেন নি। তোমরা দাড়ি রাখতে যদি রাষ্ট্র নিষেধ করে, আমি রাষ্ট্রের কথা মানব না। দাড়ি রাখব। কারণ আল্লাহর রাসূল ﷺ স্পষ্ট দাড়ি রাখতে বলেছেন। নামায পড়তে রাষ্ট্র নিষেধ করলে আমি নামায পড়ব। কারণ এটা ফরয। কিন্তু যদি অপশন থাকে, যেমন যুহরের নামায ১২ থেকে ৩ টা পর্যন্ত পড়া যায়। রাষ্ট্র যদি বলে, তুমি যুহরের নামায ১ টায় পড়ো। তাহলে মানতে হবে। কারণ, ১২ টায় যুহর পড়তে হবে, এটা আল্লাহ আমাকে নির্ধারণ করে দেন নি।

প্রশ্ন-৪১২: উষ্ট্রের যুদ্ধে যে সাহাবিরা জীবন দিলেন, তারা শহীদ হিসেবে বিবেচিত হবেন? যারা হত্যা করল, তারাও কি শহীদ হবেন?

উত্তর: জি, উষ্ট্রের যুদ্ধে, এই ধরনের ক্ষেত্রে ইজতিহাদি ভুল ছিল। উভয় পক্ষ মনে করেছে যে, আমরা হক। এক্ষেত্রে আলী ﷺ নিজেও বলেছেন, সাহাবিরাও বলেছেন, তারা প্রত্যেকেই শাহাদাতের মর্যাদা পাবেন। তারা ইসলাম বাস্তবায়নের জন্যই করেছেন।

---

[১] সূরা: [৮] আনফাল, আয়াত: ৬০।

প্রশ্ন-৪১৩: গাজার উপর আক্রমণ হচ্ছে। আমরা মুসলিমরা তাদের জন্য কী করতে পারি?

উত্তর: আমরা তাদের জন্য দুআ করব। তাদের ব্যথায় ব্যথিত হব। আল্লাহর কাছে দুআ করব। এটার বাইরে বেশি কিছু করার কোনো ক্ষমতা আমাদের নেই। কারণ যাদের উপর যুলুম হচ্ছে, তাদের আশেপাশে যারা আছে, তাদের উপর এই নুসরাতটা ফরযে আইন। আর এই যুলুম শুধু গাজা নয়, আপনার দেশে হচ্ছে, ভারতে হচ্ছে, ফিলিপাইনে হচ্ছে। মুসলিমদের রক্ত সবচে' মূল্যহীন। মানবাধিকার খুব ভালো জিনিস। বিড়ালাধিকার, পাখিয়াধিকার, কুকুরাধিকার– এগুলোও আছে। একটা বিড়াল মারলে ফাঁসি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মুসলিম মারলে কোনো সমস্যা নেই। আফ্রিকায় হাজার হাজার মুসলিম মেরে কচুকাটা করে ফেলা হচ্ছে । কেউ দেখছে না। একটাই অপরাধ, তারা মুসলিম। হয় খ্রিস্টান হও, নইলে বের হও। মেরে ফেলা হচ্ছে। আমাদেরকে দুআ করতে হবে, আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করতে হবে। এবং আমাদের দেশের অবস্থা যেন অমন না হয়, দীনি দাওয়াত দিতে হবে। নিজের সন্তানদেরকে সেইভাবে মানুষ করতে হবে। আল্লাহ তাওফীক দিন।

প্রশ্ন-৪১৪: যে ব্যক্তি দাড়ি কাটে তাকে কি ফাসিক বলা যাবে? এমন মানুষকে নামাযের ইমাম বানানো যাবে কি না? তাকে ইসলামি দলের নেতা বানানো যাবে কি না?

উত্তর: দাড়ি চাঁছা সুস্পষ্ট কবীরা গোনাহ। কাজেই ফাসিক বলা যাবে। দাড়ি চেঁছে ফেলা নবীজি ﷺ নিষেধ করেছেন। কাজেই এটা কবীরা গোনাহ। সাহাবিরা, তাবিয়িরা দাড়ি রাখা ফরয বলেছেন। আমরা যারা সুন্নাত বলি, তারা সুন্নাত নির্দেশিত ফরয হিসেবে বলি। ইচ্ছা করে এমন লোককে ইমাম বানালে যারা ইমাম বানাবেন, তারা গোনাহগার হবেন। তবে জোর করে ইমাম হলে বা সেখানে তার চেয়ে উত্তম কেউ ইমাম হওয়ার মতো না থাকলে তার পেছনেই নামায পড়তে হবে। আর যাকে নামাযের নেতা বানানো যায় না, সে ইসলামি দলের নেতা হয় কী করে? আমরা আপনাদের বলেছি, মসজিদে যে কাজ করা যায় না, রাজনীতিতে সেই কাজ করবেন না। মিছিলে সেই কাজ করবেন না। যাকে মসজিদের ইমামতি দেয়া যায় না, তাকে আপনি ইসলামি কাজের নেতা বানাবেন না।

প্রশ্ন-৪১৫: বর্তমান সমাজে নানান অপকর্ম চলছে। যাত্রার নামে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করছে। আমি যদি উচ্চপস্থ কর্মকর্তা হতাম, তাহলে এই যাত্রা বন্ধ করে দিতাম।

উত্তর: ইনশাআল্লাহ যাত্রা বন্ধ হবে। আমরা পরিবেশ তৈরি করব। বাকি নেক নিয়্যাত থাকা ভালো। সহীহ হাদীসে এসেছে, দুনিয়া হল চারজনের। একজনের আল্লাহ টাকা বা ক্ষমতা দিয়েছে এবং বুদ্ধি দিয়েছে। সে তার সম্পদ-শক্তি আল্লাহর খুশির পথে ব্যয় করে। টাকা দিয়ে মসজিদ বানায়। মাদরাসা বানায়। হাসপাতাল বানায়। রাস্তা বানায়। মানুষের উপকার করে। কোন খাতে ব্যয় করলে আল্লাহ খুশি হন সেই বুদ্ধি তার আছে। টাকা এবং ইলম দুটো জিনিস আল্লাহ তাকে দিয়েছেন। আরেকজনের আল্লাহ ইলম বা বুদ্ধি দিয়েছেন। কোন কোন খাতে সম্পদ ব্যয় করলে আল্লাহ খুশি হন সব সে জানে। কিন্তু সম্পদ নেই। সে দুআ করে– 'আল্লাহ, তুমি যদি ওর মতো আমাকে টাকা দিতে তাহলে আমি মসজিদ-মাদরাসা-হাসপাতাল বানাতাম। গরীবকে সাহায্য করতাম'। এক্ষেত্রে দুজনই সমান সাওয়াব পাবে। একজন কাজ করে সাওয়াব পাবে, আরেকজন না করে পাবে নিয়্যাতের জোরে। আরেকজনকে আল্লাহ টাকা বা শক্তি দিয়েছেন কিন্তু জ্ঞান দেন নি। সে টাকা বা শক্তি দিয়ে অন্যায় করে। অবৈধ পথে টাকা ব্যবহার করে। আরেকজনকে আল্লাহ টাকা দেন নি, তবে খারাপ কাজের নিয়্যাত দিয়েছেন। সে মনে মনে বলে, আমার যদি অমন ক্ষমতা থাকত তাহলে আমিও যাত্রার আয়োজন করতাম। আমি একটা সিনেমা হল বানাতাম। فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ । এক্ষেত্রে গোনাহ দুজনেরই সমান। একজন গোনাহ করে গোনাহ করছে, আরেকজন নিয়্যাতের জোরে গোনাহ করছে।[১০] কাজেই ভালো নিয়্যাত থাকা ভালো।

---

[১০] মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৮০২৪; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৪২২৮।

মুআমালাত

প্রশ্ন-৪১৬: যারা মানুষের সাথে কঠোর আচরণ করে, তাদের ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে কী আছে?

উত্তর: কঠোর আচরণ কোথাও কোথাও করার নির্দেশ আছে। কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপারে বিনম্র আচরণ করতে হবে। বিনম্রর সাথে কঠোর। একজন অন্যায় করল, চুরি করল, ডাকাতি করল, আপনি সব মাফ করে দিলেন। এই নরম কিন্তু ইসলামে জায়িয নেই। ইনসাফের আদালতে রায় হবে কঠোর, কথা আর আচরণ হবে বিনম্র। আর স্বাভাবিকভাবে মানুষের সাথে কর্কশ আচরণ করা গোনাহের কাজ।

প্রশ্ন-৪১৭: আমি গ্রামের বাইরে লেখাপড়া পড়ি। সম্প্রতি বাড়িতে আসলে আমার চাচাতো ভাইদের সাথে সামান্য বিষয়ে গোলমাল হয়। তারা আমাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে। এক্ষেত্রে আমার আচরণ কেমন হওয়া উচিত?

উত্তর: দুনিয়ার কারণে তিনদিনের বেশি কারো সাথে কথা বন্ধ রাখা যাবে না। কারো সাথে শত্রুতা পোষা যাবে না। মনে কষ্ট থাকলেও সামাজিক কথা চালু রাখতে হবে। সালাম দিতে হবে। আর কিছু না হোক, সালাম চালু রাখতে হবে। বিশেষ করে যারা রক্তের সাথে সম্পৃক্ত, চেষ্টা করতে হবে, আমি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করব। তারা যদি ভালো ব্যবহার না করে, তারা গোনাহগার হবে।

প্রশ্ন-৪১৮: অনেকেই কথার ভেতর বলে যে, 'ভালো থাকবেন', 'ভালো থাকুন' ইত্যাদি। এভাবে বলা শরীআতসম্মত কি না?

উত্তর: এভাবে বলাটা তো আসলে নাজায়িয কিছু নয়। তবে আমাদের উচিত দুআ করা। 'আল্লাহ আপনাকে ভালো রাখুন। ফী আমানিল্লাহ'। أَسْتَوْدِعُكَ اللهَ الَّذِي لَا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ[1] আমাদের নিজেদের ভালো কামনার কী এমন মূল্য আছে!

প্রশ্ন-৪১৯: হাত উঠিয়ে সালাম দেয়া ঠিক কি না?

উত্তর: হাত উঠিয়ে সালাম দেয়া ঠিক নয়। সালাম মুখে দিতে হবে। তবে দূরের জন্য ইশারায় বুঝিয়ে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু হাত দিয়ে সালাম দেয়া, হাদীসে এসেছে, এটা ইয়াহুদি-খ্রিস্টানদের রীতি।

প্রশ্ন-৪২০: কারো সামনে প্রশংসা করা যাবে কি না?

উত্তর: প্রশংসা দুই ধরনের। যেমন কারোর নির্দিষ্ট কোনো কাজের প্রশংসা করা, এটা সুন্নাত। আবু বাকর ﷺ কে নবীজি ﷺ 'সিদ্দীক' বলেছেন, উমার ﷺ কে

---

[১] তাহাবি, শারহু মুশকিলিল আসার, হাদীস নং-৫৯৪১; নাসায়ি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস নং-১০২৬৯

'ফারুক' বলেছেন। কোনো কোনো লোককে বলেছেন, 'তোমার মধ্যে এই গুণটা ভালো'। এভাবে প্রশংসা করা সুন্নাত। আর ঢালাওভাবে প্রশংসা করা– 'আপনি খুব ভালো মানুষ, আপনার মতো ভালো আর হয় না'– এটা নাজায়িয।

প্রশ্ন-৪২১: ইসলামের আলোকে শ্রমের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর: একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনি জানতে চেয়েছেন। কারণ সাধারণত সুন্নাহর আলোকে ইবাদত বলতে আমরা যেটা বুঝি, নামায রোযার ফযীলত সম্পর্কেই কেবল জানতে চাই। কিন্তু কর্ম করা, রিকশা চালানো, রাজমিস্ত্রীর কাজও যে ইবাদত, এরমধ্যেও যে ফযীলত আছে, এটা আজকে আপনি প্রশ্ন করে আমাদের দর্শকমণ্ডলীর মাঝে তুলে ধরেছেন। কুরআন কারীমে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন:

يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

হে রাসূলগণ, তোমরা পবিত্র খাদ্য ভক্ষণ করো এবং নেককর্ম করো। তোমরা কী করছে তা আমি অবগত আছি।[২] তাহলে দেখা গেল, নেককর্মের আগে পবিত্র খাদ্য ভক্ষণ করতে বলা হচ্ছে। এ ব্যাপারে কুরআনে অনেক নির্দেশ রয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

হে মানব জাতি, জমিনে যা কিছু পবিত্র খাদ্য রয়েছে, তা তোমরা ভক্ষণ করো আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না।[৩] পবিত্রতা দুই ধরনের। যেমন, গরু পবিত্র। হালাল। শূকর হারাম। আরেকটা হল উপার্জনের হালাল-হারাম। গরু হালাল, কিন্তু কেড়ে নেয়া গরু হারাম। চুরি করা গরু হারাম। যৌতুকের গরু হারাম। এই যে নেককর্মের আগে পবিত্র খাদ্য খাওয়া, এব্যাপারে হাদীসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে, নির্দেশনা রয়েছে। যা থেকে বোঝা যায়, হালাল উপার্জন করা মুমিনের জীবনের অন্যতম ফরয ইবাদত। এই শব্দেই কিছু হাদীস এসেছে প্রত্যেকটার সনদে কিছু দুর্বলতা যদিও আছে। যেমন:

طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

প্রত্যেক মুসলিমের উপর হালাল খাদ্য উপার্জন করা, হালাল সম্পদ উপার্জন করা ওয়াজিব বা ফরয। এই হাদীসের সনদে কিছু কথা থাকলেও আল্লামা হাইসামি তার **মাজমাউয যাওয়ায়িদ** এবং আল্লামা মুনযিরি তার **তারগীব ওয়া তারহীবে**, দুজনেই এটাকে হাসান বলেছেন।[৪] এছাড়া এই অর্থে আরো অনেক হাদীস রয়েছে। এবং হালাল উপার্জনের উপর সকল ইবাদতের কবুলিয়াত নির্ভর করে। এ জন্যই ইসলামি শরীআতে উপার্জন করাটাকে বড় ইবাদত বলে গণ্য করা হয়েছে। এব্যাপারে হাদীস শরীফে অনেক নির্দেশনা রয়েছে।

---

[২] সূরা: [২৩] মুমিনুন, আয়াত; ৫১।
[৩] সূরা: [২] বাকারা, আয়াত: ১৬৮।
[৪] তাবারানি, আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস নং-৮৬১০; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাদীস নং-১৮০৯৯; মুনযিরি, আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, হাদীস নং-২৬৫৮।

রোগব্যাধি/চিকিৎসা/তাবীয

প্রশ্ন-৪২২: সিজার করা জায়িয কি না?

উত্তর: চিকিৎসা করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ উৎসাহ দিয়েছেন। প্রয়োজন হলে চিকিৎসা শুধু জায়িয না, ফরয। একজন মানুষ মরে যাচ্ছে, আপনি সিজার করবেন না, তাকে মেরে ফেলবেন নাকি!

প্রশ্ন-৪২৩: সূরা ফাতিহা বা মধুর মাধ্যমে রোগের শিফা আছে কি না? কুরআন বা হাদীসে এই বিষয়ে কিছু আছে?

উত্তর: কুরআনে আছে, মধুর ভেতরে শিফা আছে।[১] এটা কুরআনের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ, সব অ্যান্টিবায়োটিক যেখানে ফেল করে, মধু সেখানে কাজ করে। মধু হল শ্রেষ্ঠ অ্যান্টিবায়োটিক। শরীরের ভেতরে অ্যান্টিবায়োটিক গেলে একটা রেজিসটেন্ট তৈরি হয়, কিন্তু মধু এখন পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ অ্যান্টিবায়োটিক। বিশেষ কিছু ফুলের মধু। এছাড়াও মধুর ভেতরে শরীরের বিভিন্ন ক্ষয় প্রতিরোধ রোগ প্রতিরোধ আছে। এটা বিজ্ঞানই প্রমাণ করে। আর সূরা ফাতিহার ব্যাপারে কুরআনে কিছু নেই। হাদীস আছে। হাদীসটা সহীহ নয়। সূরা ফাতিহাকে শিফা বলা হয়েছে, এটা খুব দুর্বল হাদীস। তবে কুরআনের আয়াত পড়ে ফুঁ দেয়া– এটা সুন্নাত। বুখারির একটা হাদীস আছে। একজনের সাপে কেটেছিল। এক সাহাবি সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁ দিয়েছিলেন, সাপের বিষ নেমে গিয়েছিল।[২] কালিম সিদ্দীকির 'মন্দির থেকে মসজিদ' নামে একটা বই আছে। এটা পড়বেন। খুবই অবাক করা বই। তিনি একমাত্র ভারতীয় আলিম, যিনি অমুসলিমদের কাছে দীনের দাওয়াত দেন। তার বইতে একটা ঘটনা আছে। আমি নিজে পড়ি নি। অন্য একজন পড়ে আমাকে শুনিয়েছেন। ভারতের একজন উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনিয়ার। হিন্দু। তার ওয়াইফও উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। গাড়ি এক্সিডেন্ট করে তিনি প্যারালাইসড হয়ে যান। ভারতে, আমেরিকায় অপারেশন করেছেন। সবকিছু ফেল। সর্বশেষ ইন্ডিয়ায় এসে আরেকটা অপারেশন করতে গিয়ে উনার খিঁচুনি হয়েছে। মানে কিছুক্ষণ পরপর হাত-পা নিজের অজান্তেই নড়ে ওঠে। এই খিঁচুনি বন্ধ করার জন্য হাসপাতালে এসেছেন। আর কোনো চিকিৎসা আছে কি না। ওই হাসপাতালে কালিম সিদ্দীকি এসেছেন

---

[১] সূরা: [১৬] নাহল, আয়াত: ৬৯।

[২] সহীহ বুখারি, হাদীস-৫৭৩৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২২০১; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১১৩৯৯; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-২১৫৬।

উনার এক রোগি নিয়ে। উনাকে ডাক্তাররা বলেছিল, আপনার আর চিকিৎসা নেই। ফকির-টকিরের কাছে থেকে দুআ নিয়ে দেখতে পারেন। তো কালিম সিদ্দীকি দায়ি মানুষ। সত্যিকারের দায়ি। উনি সব সময় অমুসলিমদের কাছে ইসলামকে পেশ করার চেষ্টা করেন। কালিম সিদ্দীকি সেই ইঞ্জিনিয়ার রোগিকে বললেন, আপনি আল্লাহর দুটো নাম, ইয়া হাদি, ইয়া রাহীম– এই দুটো সব সময় পড়বেন। আল্লাহ হয়ত ভালো করে দেবেন। তিনি ওই সময় থেকে পড়া শুরু করেছেন। হাসপাতালে আর চিকিৎসা হবে না। বাসায় ফিরে যাচ্ছেন। ইয়া হাদি, ইয়া রহীম পড়তে পড়তে যাচ্ছেন। যেতেযেতে গাড়ি আবার এক্সিডেন্ট করেছে। ড্রাইভার মারাত্মক আহত। উনারাও একটু ধাক্কা পেয়েছেন। তবে বিস্ময়কর হল, উনার খিঁচুনি বন্ধ হয়ে গেছে। উনি বুঝতে পারলেন– ইয়া হাদি, ইয়া রহীম কাজে লেগেছে। উনি পড়তেই আছেন। পড়তেই আছেন। উনার শরীরও কিছুটা ভালো হয়েছেন। পরে উনি মুসলিম হয়েছেন। তো আল্লাহর নামগুলো অবশ্যই মানুষকে সুস্থ করতে পারে।

প্রশ্ন-৪২৪: ছোট বাচ্চাদের কুরআন-হাদীস লিখিত তাবীয দেয়া যাবে কি না? যদি যায়, তাহলে দলীল বলবেন।

উত্তর: আমার **রাহে বেলায়াতের** নতুন এডিশনে 'রোগব্যাধি-ঝাড়ফুঁক' এই অধ্যায়ে গেলে দলীলগুলো বিস্তারিত পাবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবীয নিতে নিষেধ করেছেন। সাহাবিরা তাবীযকে শিরক বলতেন। তবে কোনো কোনো তাবিয়ি কুরআনের আয়াতের তাবীযকে জায়িয বলেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস رضي الله عنه থেকে বর্ণনা আছে, সনদগত একটু দুর্বলতা আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটা দুআ শিখিয়েছেন:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ

এটা **রাহে বেলায়াতে** পাবেন। আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস رضي الله عنه এর ছেলেমেয়েরা একটু বড় হলে এই দুআ মুখস্ত করাতেন। সকাল-সন্ধ্যা পড়বে। কোনো শয়তানের নযর লাগবে না। তবে যারা কথা বলা শেখে নি, তাদেরকে কাগজে লিখে গলায় দিতেন।[৩] এটা একদিকে যেমন কাগজে লিখে গলায় ঝোলানোর দলীল হিসেবে পেশ করা হয়, সাথেসাথে এটা আবার দলীল হল, যারা কথা বলতে পারে, কথা বলা শিখে গেছে তাদের আর দেয়া যাবে না। তাদেরকে দুআ শিখিয়ে দিতে হবে। মুখ দিয়ে বলাতে হবে।

---

[৩] সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-৩৫২৮; সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-৩৮৯৩।

প্রশ্ন-৪২৫: তদবীর বা ঝাড়ফুঁক বা তাবীয দিয়ে মোটা টাকা আয় করা কতটুকু বৈধ?

উত্তর: হাদীসে তাবীযকে শিরক বলা হয়েছে। তাবীয দেবেন না। নেবেন না। পানি পড়া, ঝাড়ফুঁক ইত্যাদি দিয়ে পয়সা নেয়া বৈধ। তবে এটাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবিরা পেশা হিসাবে নেন নি।

প্রশ্ন-৪২৬: একজন নামাযি ব্যক্তি জিনের সাহায্য নিয়ে ওষুধ সংগ্রহ করে। এবং কপাল দেখে, হাত দেখে সমস্যা বলে দিলে তাকে বিশ্বাস করা যাবে কি না?

উত্তর: অবশ্যই বিশ্বাস করা যাবে। তাকে একজন কাফির হিসাবে বিশ্বাস করা যাবে। যে ব্যক্তি হাত দেখে, কপাল দেখে, ওই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে কাফির। কারণ গণক, ঠাকুর, কবিরাজ, কাহেন– এরা তো নিজেরা কাফির বটেই। তার কাছে যে যাবে, সেও কাফির হয়ে যাবে। কাজেই নামায পড়ার কারণে সে কুফরি থেকে মুক্ত নয়। একজন নামায পড়ে আবার মূর্তিপূজা করে। তাতে তো লাভ হল না। এই জন্য হাতপড়া, কপালপড়া, কপালদেখা, ভাগ্যবলা, গায়িব বলা– এগুলো কুফরি কাজ। আর এটা যে করে, সে নামাজি হোক, দরবেশ হোক, হুযুর হোক, পীর সাহেব হোক– তার কাছে যাওয়া নাজায়িয। গেলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَ□دَّقَهُ فِيمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

যে ব্যক্তি এমন কোনো গণক, ঠাকুর, কবিরাজ, জ্যোতিষি, হস্তরেখাবিদ, কপালপড়া, বালিপড়া, সুতোপড়া– এই সমস্ত লোকদের কাছে গিয়ে তার কথা বিশ্বাস করে, সে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি কাফির হয়ে যায়।[৪]

প্রশ্ন-৪২৭: তাবীযের মধ্যে রাখা আল্লাহর কালাম নিয়ে বাথরুমে যাওয়া না গেলে একজন হাফিয কীভাবে বাথরুমে যায়, তার বুকে তো আল্লাহর কালাম আছে?

উত্তর: আমাদের পেটের ভেতর পায়খানা আছে। এখন পায়খানা খানিকটা পোটলায় বেঁধে নিয়ে কারো কাছে যাবেন। কেউ কিছু বললে বলবেন, তোমার পেটেও তো গু আছে! আমি হাতে করে আনছি তাতে দোষ কী? বলেন, এটা কোনো যুক্তি হল? প্রথম কথা হল, আসলে তাবীয ব্যবহার করাটাই তো ঠিক নয়। আপনি দুআ,

---

[৪] মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস নং-১৫; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-৯৫৩৬; সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-৩৯০৪; সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-১৩৫; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং-৬৩৯।

ঝাড়ফুঁক ব্যবহার করবেন। নিজে সকাল-সন্ধ্যা দুআ পড়বেন, আল্লাহ সব বিপদ কাটিয়ে দেবেন। দ্বিতীয় কথা হল, তাবীযে আপনি কুরআনের লিখিত আয়াত নিয়ে বাথরুমে যান, কিন্তু আমরা যখন কুরআন মুখস্ত করি, ওটা কোথাও লেখা থাকে না। ওটা ব্রেনের কোষে চলে যায়। ওটার আর লিখিত রূপ থাকে না। প্রতিটি মুমিনের কলবেই তো কুরআন আছে। তারপরেও তো আমরা বাথরুমে যাই। কুরআন ধরতে গেলে ওযু লাগে, কুরআন পড়তে গেলে ওযু লাগে না।

প্রশ্ন-৪২৮: আমরা জানি যে, কবিরাজগণ জিনের মাধ্যমে চিকিৎসা করে থাকে। তারা কি সত্যিই জিনকে বশ করতে পারে? কবিরাজি চিকিৎসা বৈধ কি না?

উত্তর: সত্যি সত্যি বশ করতে পারে না। তবে যারা শয়তান জিন, তাদের একটা দায়িত্ব আছে। সেটা হল মানুষকে কাফির বানানো। এ জন্য জিনদের পূজা করা ছাড়া কোনো জিন বশ হয় না। যে আমলগুলো করে জিন বশ করা হয় তার মধ্যে শিরক আছে। জিনের বন্দনা করা হয়, তার নামে একটা ছাগল অথবা কবুতর জবাই করে, একটু রক্ত প্রবাহিত করে দেয়– এইসব শিরকের মাধ্যমেই জিন বশ হয়। এ জন্য জিন দিয়ে যারা চিকিৎসা করেন তাদের কাছে যাওয়া বৈধ নয়। তবে সাধারণভাবে যারা দুআর মাধ্যমে চিকিৎসা দেয়, তাদের আমল যদি ভালো হয়, এমন মানুষের কাছ থেকে ঝাড়ফুঁক নেয়া বৈধ।

প্রশ্ন-৪২৯: একজনের ব্যাপারে শুনেছি, নখ-চুল কেটে তাকে নষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এভাবে কি সত্যিই নষ্ট করা যায়?

উত্তর: জাদুর মাধ্যমে নষ্ট করা যায়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা শোনেন, ৯৯.৯৯ ভাগই মিছে কথা। একটু কিছু হলেই আমরা বলি, নষ্ট করে দিয়েছে। জিনে ধরেছে। জাদু করেছে। এগুলো কিছুই না। মাসনুন দুআগুলো পড়বেন– সকাল-সন্ধ্যার দুআ, ঘুমানোর সময়ের দুআ, ইশাআল্লাহ, সহজে কেউ নষ্ট করতে পারবে না।

বিদআত

প্রশ্ন-৪৩০: আমার মা মারা গেছেন। আমি খানা করতে চাচ্ছি। খানা করলে কি বেশি সাওয়াব হবে?

উত্তর: খানা করেন কোনো সমস্যা নেই। আমরা দুআ করব, আপনার মা মরেছে, তাড়াতাড়ি যেন আরো একজন মরে, তাহলে আমরা আবার খানা খেতে পারব। কিন্তু এতে কোনো সাওয়াব হবে না। কেউ মারা গেলে খানা করা– এটা আমাদের বানোয়াট ইসলাম। হুযুরদের সুবিধা হয়। পেট ভরে। আপনাদের কোনো উপকার হয় না। মা মারা গেছেন, সাদাকায়ে জারিয়া করেন। কোনো মসজিদ, মাদরাসা, ইসলামি প্রতিষ্ঠানে জমি দান করেন। যদি টাকা কম হয়, জমি দান করতে না পারেন, তাহলে টাকা দিয়ে স্থায়ী কিছু করে দেন। একটা টিউবওয়েল করে দেন। তাহলে ওই টিউবওয়েল যতদিন থাকবে, আপনার আম্মা সাওয়াব পেতে থাকবে। কিন্তু খানা করবেন না। খানা একে তো বিদআত, এটা নবীজির সুন্নাত নয়। দুই নাম্বার হল, খানা করবেন এর মানে কী! সামাজিকতা করবেন। লোক দেখানো। তিন নাম্বার হল, খানা করবেন, দুনিয়ার বেনামাযি, ঘুষখোর, সুদখোরকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়াবেন। সাওয়াব তো হবেই না, গোনাহ হবে। কাজেই এর ভেতর যাবেন না। খানা যদি করতেই চান, গোপনে কোনো মাদরাসায়, এতীমখানায় কিছু খাবার রান্না করে, অথবা ছাগল কিনে দেন। এটা সাদাকাহ হিসেবে গণ্য হবে। আনুষ্ঠানিক খানা– এটা বানোয়াট জিনিস।

প্রশ্ন-৪৩১: মানুষ মরে গেলে মুসল্লি ডেকে লাখ কালিমা পড়িয়ে দুআ করা কি সুন্নাত?

উত্তর: এটা আমাদের, হুযুরদের সুন্নাত। এটা খুবই ভালো কাজ। খাওয়া-দাওয়া হয়। আমরা ছোটবেলায় যখন পড়তে যেতাম, ছোলার দানা গুণে কালিমা পড়তে হত, আমাদের উস্তাদ বলতেন– ওরে মুঠো মুঠো দে। একটা একটা করে গোণার সময় আছে নাকি! তো মাশাআল্লাহ এর দ্বারা ফাঁকিজুখি, টাকা-পয়সা, খাওয়া-দাওয়া হয়। সবই ভালো। তবে ইসলামের দৃষ্টিতে এটা খারাপ কাজ। আল্লাহর নির্দেশনা হল, কেউ মারা গেলে তার জন্য দুআ এবং দান করতে হবে। আপনি যখন পারেন আপনার আব্বার জন্য দুআ করবেন। 'আল্লাহ, আমার আব্বাকে মাফ করে দাও'। আপনি মুখ দিয়ে এটা বলবেন, এই দুআটা কবুল হলে আপনার আব্বার আমলনামায় একটা নেকি জমা হবে। আপনাকে কে বলেছে, হুযুর ডেকে

দুআ নিতে হবে? এটা আমরা পুরহিতরা বানায়েছি। আমরা যাব, খাব-দাব, কিছু টাকা-পয়সা আনব।

হুযুরও লাগবে। তবে হুযুর লাগবে শেখার জন্য। কীভাবে দুআ করবেন, এটা শিখবেন হুযুরের কাছ থেকে। কিন্তু দুআটা আপনি নিজে করবেন। আর হুযুরকে খাওয়াতে পারেন। হুযুরকে খাওয়ানো ইবাদত। আলিমদের, মুসল্লিদের, এতীমদের খাওয়াবেন। জান খুলে খাওয়াবেন। তারা খাবে, আপনি দেখবেন। আর দুআ করবেন, 'আল্লাহ, আলিমদের, এতীমদের খাওয়ালাম, এর সাওয়াবটা আমার আব্বাকে দাও'। এটা হতে পারে। কিন্তু আমরা হুযুরদের ডাকি ছোলার দানা গোণানোর জন্য। তারা কামলা খাটে, এরপর তাদের খাওয়ান। কাজটাও নাজায়িয হল, খাওয়ানোটাও বেফায়দা হল। এগুলো খুবই বাজে কাজ। এগুলো আমরা সমাজে টিকিয়ে রেখেছি। আমাদের পুরহিততান্ত্রিক ব্যবস্থার কারণে। আল্লাহ মাফ করেন। বাবা-মা মারা গেলে দান করবেন। দুআ করবেন। স্থায়ী দান করবেন। আলিমদের মুহাব্বত করবেন, খাওয়াবেন, এতীমদের খাওয়াবেন। দুআর শর্তে না। সাওয়াবের শর্তে খাওয়াবেন। 'হে আল্লাহ, এর সাওয়াব আমার আব্বাকে দিও'। আমাকে এমনি কেউ হাদিয়া দেয় না। দুআ চায়, তারপর হাদিয়া দেয়। মানে আমাকে দুআর বিজনেস করতে হবে। দুআর দাম দিয়ে যান!!

প্রশ্ন-৪৩২: বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে শুভ অশুভ লক্ষণ বলে কিছু নেই। আবার বলা হয়েছে অশুভ লক্ষণ তিনটি: নারী, ঘোড়া, বাড়ি। এর ব্যাখ্যা কী?

উত্তর: এটা তো আয়িশা ﷺ বুঝিয়ে দিয়েছেন। যদি অশুভ থাকত তাহলে এই তিন জিনিসে থাকত। যেহেতু ইসলামে অশুভ নেই, কাজেই কোথাও নেই।

প্রশ্ন-৪৩৩: তারাবীহর নামাযের মুনাজাতের তাৎপর্য কী?

উত্তর: এর তাৎপর্য আমার জানা নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো এই দুআ করেন নি। সাহাবিরা করেন নি। এক হাজার বছর পর্যন্ত কোনো মুসলিম এই দুআ-মুনাজাত চিনতেনই না। এটা হাদীস-কুরআন- কোথাও নেই। তারাবীহর দুআতে নেই। অন্য দুআতেও নেই। এটা বানানো দুআ। অর্থ খারাপ না। কারো শখ হলে করবে। তবে আমি কখনো করি না।

প্রশ্ন-৪৩৪: সালাম-মুসাফাহা করার পর বুকে হাত রাখার কোনো বিধান আছে কি না?

উত্তর: না, এটা বাজে কাজ। বিদআত বলা চলে। সালাম-মুসাফাহা করার পর হাত আবার বুকে লাগানো- এটা সুন্নাত নয়। এটা দীন বানিয়ে ফেললে, রীতি বানিয়ে ফেললে বিদআত হতে পারে।

বিবিধ

প্রশ্ন-৪৩৫: কুরআনে বলা হয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্ত্রীগণ মুমিনদের মাতা। তাহলে তার কন্যা ফাতিমাকে মা ফাতিমা বলা কি ইসলাম সম্মত?

উত্তর: আমরা এমনিতে বাংলায় বলি। কিন্তু তাঁকে 'মা ফাতিমা' বলতে হবে, এটা ইসলামের কোনো নিয়ম নয়।

প্রশ্ন-৪৩৬: নবী-রাসূল এবং ফেরেশতাদের নাম নিলে 'আলাইহিস সালাম' বলা হয় কেন?

উত্তর: **আলাইহিস সালাম** মানে সালাম দেয়া। কোনো নবী-রাসূলের নাম নিলে আলাইহিস সালাম বলতে হয়। **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম**ও বলা যায়। নবী-রাসূলদের মতোই জিবরাঈল, মিকাঈল, অন্যান্য ফেরেশতাগণও আল্লাহর রাসূল। এঁরা ফেরেশতাদের রাসূল, আর আদম, ইবরাহীম– এঁরা মানুষদের রাসূল। এ জন্য তাঁদের নামের সাথে **আলাইহিস সালাম** বলতে হয়।

প্রশ্ন-৪৩৭: আল্লাহ পাক ইবরাহীম عليه السلام কে আরশে কারীম থেকে 'তাহতাস সারা' পর্যন্ত সমস্ত আসমান জমিন দেখিয়েছিলেন। একটি উঁচু পাথরের উপর দাঁড় করিয়ে দেখিয়েছিলেন। আমি এখন জানতে চাচ্ছি 'তাহতাস সারা' কী? এবং পাথরটা কি মাকামে ইবরাহীম?

উত্তর: আপনি আল্লাহর কথা আর বান্দার কথা মিলিয়ে ফেলেছেন। আল্লাহ কোরআনে বলেছেন:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

আমি ইবরাহীমকে আসমান যমিনের রাজত্ব দেখালাম।[১] আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, আল্লাহ ইবরাহীমকে আসমান যমিনের রাজত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু এই রাজত্ব মানে আরশে কারীম থেকে 'তাহতাস সারা', সারা মানে মাটি; জমিনের নিচ পর্যন্ত। এটা আল্লাহ বলেন নি। আল্লাহ বলেছেন, আসমান জমিনের রাজত্ব দেখিয়েছি। আবার সেটাকে পাথরের উপর দাঁড় করিয়ে দেখিয়েছেন, এটাও আল্লাহ বলেন নি। এটা বিভিন্ন তাফসীরকারক বলেছেন। এ ব্যাপারে কোনো হাদীসের বর্ণনা নেই। আর ওটা মাকামে ইবরাহীম নয়। মাকামে ইবরাহীমের সম্পর্ক হজ্জের সাথে। আর

---

[১] সূরা: [৬] আনআম, আয়াত: ৭৫।

আল্লাহ ইবরাহীমকে 'মালাকুতাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ' দেখিয়েছেন, যখন উনি ইরাকে ছিলেন।

প্রশ্ন-৪৩৮: আরব, মিশর ইত্যাদি দেশে মেয়েদের খাতনা দেয়া হয়। এ বিষয়ে ইসলাম কী বলে?

উত্তর: এটা জায়িয। হাদীস শরীফে এসেছে– ছেলেদের খাতনা সুন্নাত, মেয়েদের খাতনা বৈধ।[২]

প্রশ্ন-৪৩৯: অনেকেই বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নাম ছোট। এখনকার যেসব হুযুরের নাম বড় তারা ধর্ম-ব্যবসায়ী। ধোঁকাবাজ। এসব হুযুর-বিদ্বেষী মানুষ সম্পর্কে কিছু বলেন।

উত্তর: ইসলাম এসেছে আলিমদের মাধ্যমে। আলিমদের সবকিছু ভালো হতে হবে, এমন নয়। ভুলভ্রান্তি থাকতেই পারে। দোষত্রুটি থাকতে পারে। তবে ঢালাওভাবে আলিমেদের বিরোধিতা করা– এটা ইসলামের দুশমনরা চায়। নাম বড়-ছোট হতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নাম, কুনিয়াত আছে। সাহাবিদেরও ছিল। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কুনিয়াত ছিল আবুল কাসিম। নাম মুহাম্মাদ। বরং তাঁর আরো অনেক নাম ছিল। তিনি নিজেই হাদীসে বিভিন্ন নাম বলেছেন। এ জন্য নাম বড় হলেই সে ধর্ম-ব্যবসায়ী হয়ে যাবে, এমন নয়। এটা মূর্খতার কথা। মানুষের নাম নয়, কাম দিয়ে যাচাই করবেন। নাম ছোট্ট, কিন্তু সে ধর্ম-ব্যবসায়ী হতে পারে। প্রতারক হতে পারে। ভণ্ড হতে পারে। এ জন্য দুঃখ লাগে, যেখানে সমালোচনা করার দরকার, সেখানে সমালোচনা না করে, যেটা কোনো বিষয়ই না, সেটা নিয়ে আমরা সমালোচনা করি। কাজেই কোনো আলিম ভুল করতে পারেন...। আমরা যদি দেখি, তিনি ধর্মকে ব্যবসার কাজে ব্যবহার করছেন, এটা অন্যায়। একশবার অন্যায়। তবে সবাই এমন নন। আমরা আজকে যে দীন চিনেছি, এটা এই সমস্ত আলিমদের মাধ্যমে।

প্রশ্ন-৪৪০: একব্যক্তি টাকা ধার নিয়ে ফেরত দেয় নি। আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধর্মীয় কোনো বিধান আছে কি না?

উত্তর: ক্ষমা করে দিলে আর কোনো বিধান নেই। কারণ পাওনাটা তো আপনি ক্ষমা করেই দিয়েছেন।

---

[২] মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-২০৭১৯; মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস নং-২৬৪৬৮; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস নং-১৭৫৬৮।

প্রশ্ন-৪৪১: ইসলামে মানুষদেরকে ক্ষমা করতে বলা হয়েছে। আবার আল্লাহ বলেছেন, তোমরা শাস্তি প্রদানে অনুকম্পা দেখিও না। দুটো দুই রকম হয়ে গেল না?

উত্তর: বিচারে যখন অপরাধ প্রমাণিত হবে, তখন আর অনুকম্পা দেখানো যাবে না। আপনার পার্সোনাল অপরাধ ক্ষমা করবেন। এ জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কেস বিচারালায়ে তুলতে নিষেধ করতেন। তোমরা ক্ষমা করে দাও। মাফ করে দাও। বিচারে যেও না। কিন্তু বিচারে গিয়ে ক্রাইম প্রমাণিত হলে শাস্তি দিতে হবে। শাস্তির ক্ষেত্রে অনুকম্পা হয় না।[৩]

প্রশ্ন-৪৪২: আমি গোনাহ থেকে বাঁচতে চাই। আমাকে কিছু পরামর্শ দিন।

উত্তর: গোনাহ থেকে বাঁচতে হলে গোনাহের পরিবেশ ত্যাগ করতে হবে। যে পরিবেশের কারণে বারবার গোনাহ হয়ে যায় ওই পরিবেশ ত্যাগ করতে হবে। আর ভালো মানুষদের সোহবতে যাওয়া জরুরি।

প্রশ্ন-৪৪৩: আমরা জানি যে, জন্মের সময় প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে আল্লাহ দুইজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেন। কিন্তু আপনি বলেছেন জিন ও কারীন থাকে। তাহলে কি ওই ফেরেশতাদ্বয়ের নাম জিন ও কারিন?

উত্তর: নেকআমল বদআমল লেখার জন্য আলাদা ফেরেশতা আছে। যাকে কিরামান কাতিবীন বলা হয়। আমি বলেছি অন্য কথা। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রতিটি মানুষ সৃষ্টির পরে আল্লাহ তার সঙ্গে একজন জিন কারীন দেন, একজন ফেরেশতা কারীন দেন। এরা নেকআমল, বদআমল লেখেন না। এরা তাকে ভালো এবং মন্দ কাজে উৎসাহ দেয়।[৪]

প্রশ্ন-৪৪৪: আইকার অধিবাসী বলতে কোন দেশের অধিবাসীদের বোঝানো হয়েছে?

উত্তর: আসহাবুল আইকা বলতে হুদ আলাইহিস সালামের কওমকে বোঝানো হয়।

প্রশ্ন-৪৪৫: রাইহান শব্দের অর্থ কী? আব্দুল্লাহ রাইহান নাম রাখা যাবে কি না?

উত্তর: রাইহান অর্থ সুগন্ধি। আব্দুল্লাহ রাইহান নাম রাখা যেতে পারে।

---

[৩] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৩৭৬; সুনান নাসায়ি, হাদীস নং-৪৮৮৬।

[৪] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৮১৪; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-৩৮০২; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস নং-৬৫৮।

প্রশ্ন-৪৪৬: মধ্য বয়সে পৌঁছে গেছি। পারিবারিক অসচেতনতার কারণে কুরআন শিখতে পারি নি। এখন শেখার ইচ্ছা আছে, কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশ পাচ্ছি না। এ ব্যাপারে কি আপনার কোনো প্রজেক্ট হাতে নেয়ার সম্ভাবনা আছে?

উত্তর: আমার জন্য বসে থাকলে হবে না। আজকেই কুরআনের তালিবে ইলম হয়ে যান। আপনার নিকটবর্তী মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে অনুরোধ করেন, যেন সপ্তাহে একদিন দুইদিন করে পড়িয়ে কুরআন শিখিয়ে দেয়। আমার সহযোগিতা চাইলে আমার সঙ্গে দেখা করেন। আপনারা যদি দশজনের মতো থাকেন, বোলেন, আপনাদের জন্য শিক্ষক ঠিক করে দেব। এইটুকু সহযোগিতা আমি করতে পারব।

প্রশ্ন-৪৪৭: আমি আপনার একজন ছাত্র। আপনার রাহে বেলায়াত বহুবার পড়েছি। আপনার কত ছাত্র আপনার বই পড়ে ভালো হয়েছে, কিন্তু আমি ভালো হতে পারি নি। আমি পেয়েছি হতাশা। আমি ভালো হতে চাই।

উত্তর: কিছু ভালো তো হয়েছ। এই যে খারাপ লাগছে, এটাও তো ভালো হওয়ার লক্ষণ। আমরা দুআ করি তোমার জন্য। বই পড়তে থাকো। বই একটা সোহবত। আলিমদের সোহবতে যাও। তোমার কোনো সমস্যা থাকলে আলোচনা করো। হতাশ হবে না। হতাশা শয়তানের অস্ত্র। শয়তানের দুটো বৈশিষ্ট্য আছে। একটা হল, শয়তান নিজে কখনো হতাশ হয় না। একটা মানুষ জান্নাতে ঢুকে গেছে, পা-টা বেরিয়ে আছে, সে পা ধরে টানে। যদি জান্নাত থেকে বের করা যায়! কিন্তু শয়তানের পাঠশালার প্রথম পাঠ হল হতাশা– 'আমার দিয়ে আর হবে না'!

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ[৫]

এই যে হতাশা দারিদ্রের ভয় দুশ্চিন্তা ভবিষ্যৎ নিয়ে টেনশন, আমি বোধ হয় ভালো হতে পারবো না, এটা হবে না– এগুলো সব শয়তানের পাঠশালার প্রথম পড়া। সব সময় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে। পীর সাহেবের কাছে গিয়ে একজন বলছে, হুযুর, জীবনে একটাও ভালো কাজ করতে পারলাম না। পীর সাহেব বললেন, কেন, তুমি নামায পড় না? সে বলল, নামায তো পড়ি, কিন্তু সেটা কোনো কাজের নামায নয়। ও দিয়ে কিছু হবে না। পীর সাহেব বললেন, তাহলে নামাযের মধ্যে যে বেকার সিজদা কর, অমন দুটো সিজদা আমাকে করো। লোকটা বলল, তাই আবার হয় নাকি হুযুর! পীর সাহেব বললেন, তোমার সিজদা তো কোনো কাজের সিজদা না, অমন সিজদা আমাকে করলে সমস্যা কী? তো যে সিজদা আমাকে করছ না, ওটাকে কেন বেকার বলছ! আশাবাদী হও। কিছু করেছ। আরো ভালো করতে হবে। কিন্তু নিরাশ হোয়ো না।

---

[৫] সূরা [২]: বাকারাহ, আয়াত, ২৬৮।

প্রশ্ন-৪৪৮: মাদরাসার একটা ছেলে দাবি করছে, প্রতিদিন রাতে নারী জিন এসে তার সাথে মিলিত হয়। এটা কি সম্ভব?

উত্তর: এটা শয়তানের ওয়াসওয়াসা।

প্রশ্ন-৪৪৯: ভাড়া করা মসজিদে ভাড়াদাতা মসজিদের সভাপতি হতে পারবে কি না?

উত্তর: উদ্ভট কথা। আজ নতুন শুনলাম। ভাড়া জায়গায় মসজিদ হয়, মুসলিমরা মসজিদ বানায়– এটা জীবনে শুনি নি। নামাযের ঘর হতে পারে। আপনি একটা জায়গা ভাড়া নিয়ে নামাযের ঘর করে দিলেন– এটা হতে পারে। নামাযের জায়গায় নামায হবে, জুমুআর নামাযও হবে, কিন্তু মসজিদ হবে না। মসজিদ হতে গেলে ওয়াকফ লাগে।

প্রশ্ন-৪৫০: জীবিত এবং মৃত উভয় অবস্থায় কি আমাদের পিতামাতা আমাদের নেক কর্মের সাওয়াব পাবেন?

উত্তর: জি, পাবেন। কারণ সন্তান পিতামাতার মাধ্যমেই নেক কর্মগুলো করার সুযোগ পেয়েছেন।

প্রশ্ন-৪৫১: পিতামাতা কি আমাদের খারাপ কর্মের গোনাহ পাবেন?

উত্তর: খারাপ কর্মের গোনাহ সব সময় পাবেন কি না, এটা নিশ্চিত নয়। যদি পিতামাতা সন্তানকে নেক কর্ম না শেখান, পিতামাতার কারণে যদি খারাপ কর্মগুলো করে, তাহলে পিতামাতা তার গোনাহ পাবেন। কিন্তু পিতামাতা তাদের দায়িত্ব পালন করে মারা গেছেন, এখন যদি সন্তান খারাপ কাজ করে, তাহলে তারা কোনোভাবেই গোনাহ পাবেন না।

প্রশ্ন-৪৫২: সমাজকল্যাণ মন্ত্রী বলেছেন, মাদারাসা যারা পড়ে, শিরনি খাওয়া ছাড়া তাদের কোনো কাজ নেই। মাদরাসা শিক্ষার আর দরকার নেই। বর্তমান পৃথিবীর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে মাদারাসা শিক্ষা পরিহার করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। তার কথাটা কতটুকু যুক্তিপূর্ণ?

উত্তর: সম্পূর্ণ মিথ্যা, অযৌক্তিক, রাষ্ট্র এবং ইসলামবিরোধী কথা। তিনি বলেছেন কি না আমি জানি না। যদি বলে থাকেন, তবে ভুল বলেছেন। মাদারাসায় পড়া ছেলেরা ডাক্তার হয়েছে, ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে, বড় বড় ব্যারিস্টার হয়েছে– এমন অসংখ্য উদাহরণ আছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নিজের দেশ জাতিকে চেনেন না। মেডিকেল কলেজে প্রায় ১০% ছেলে আছে মাদরাসায় পড়া। খুঁজে দেখেন, ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ে যান, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে যান, বড় বড় প্রতিষ্ঠানে যান– সবখানে মাদরাসার ছাত্ররা আছে। মাদারাসায় কী পড়ানো হয়, উনি জানেনই না। দ্বিতীয় কথা হল, বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য মাদরাসায় বেশি বেশি পড়তে হবে। কারণ বর্তমান পৃথিবীতে মাদকতা, সন্ত্রাস, অশ্লীলতা, এইডস, গুলি করে মারা, পারিবারিক অশান্তি– এই সবকিছু বৃদ্ধির মূল কারণ হল ধর্মীয় এবং নৈতিক মূল্যবোধের অনুপস্থিতি। কাজেই সারা পৃথিবী এখন ধর্মীয় এবং নৈতিক শিক্ষার জন্য পাগল হচ্ছে। কাজেই এই কথাগুলো যিনি বলেছেন, অযৌক্তিক কথা বলেছেন। তিনি নিজের মূর্খতা প্রমাণ করেছেন। তিনি জানেনই না যে মাদরাসায় কী পড়ানো হয়।

প্রশ্ন-৪৫৩: সন্ধ্যায় বাচ্চাদেরকে বের হতে দেয়া হয় না। এতে নাকি তাদের ক্ষতি হয়। এটা কি হাদীসে আছে?

উত্তর: জি, সন্ধ্যার সময় জিনেরা বের হয়। এই সময় বাচ্চাদের একা ছেড়ে দিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন।

প্রশ্ন-৪৫৪: পড়ে পাওয়া অর্থের মালিকের খোঁজ পাওয়া না গেলে করণীয় কী?

উত্তর: সদকা করে দিতে হবে। নিজেও ব্যবহার করতে পারেন। তবে মালিক এসে চাইলে ফেরত দিতে হবে।

প্রশ্ন-৪৫৫: মানুষের বিভিন্ন ধরনের দাড়ি ওঠে। কেউ বলে চাপ দাড়ি, কেউ বলে ছাগলা দাড়ি। এভাবে বলাটা কি ঠিক?

উত্তর: এগুলো বলা ঠিক না। দাড়ি সুন্নাত। দাড়িকে ছাগলা দাড়ি বললে রাসূল ﷺ এর সুন্নাতের অবমাননা হয়।

প্রশ্ন-৪৫৬: জান্নাতের দরজা কী দিয়ে তৈরি করা হয়েছে?

উত্তর: জান্নাতের বর্ণনা হল:

مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ

জান্নাত এমন জিনিস, যা কোনো চোখ দেখে নি, যা কোনো কান শোনে নি, যা কোনো অন্তর কল্পনাও করে নি।[৬]

[৬] সহীহ বুখারি, হাদীস নং-৩২৪৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৮২৪; সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-৩১৯৭; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং-৪৩২৮।

প্রশ্ন-৪৫৭: সামনে পরীক্ষা। তাই পরীক্ষা দেয়ার সুন্নাত তরীকা বলে দিলে উপকৃত হব।

উত্তর: পরীক্ষা তো দুনিয়ার জাগতিক কাজ। আর সবচে' মজা হল রাসূল ﷺ এর যুগে পরীক্ষা ছিল না। সবাই পড়ত, পড়ে আলিম হয়ে যেত। সাহাবিদের যামানায় পরীক্ষা ছিল না। এ জন্য প্রথম যখন পরীক্ষা আসে, আলিমরা অনেকে বিদআত বলতেন। এটা তো আগে ছিল না। এখন অবশ্য সব মাদরাসায় পরীক্ষা এসে গেছে। তো পরীক্ষা হল উপকরণ। ছাত্রদের ইলম যাচাইয়ের, উৎসাহ দেয়ার উপকরণ। তবে অন্যান্য ইবাদতের মতো, অন্যান্য জাগতিক কাজের মতো রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে দুআ চাইবে, তাওফীক চাইবে, বিসমিল্লাহ বলে যাবে। 'বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ' বলে শুরু করবে। কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হলে বেশি বেশি দরূদ শরীফ পড়বে। এগুলো করা যেতে পারে।

প্রশ্ন-৪৫৮: ছাত্রজীবন চলছে। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পড়ালেখা ঠিকমতো করতে পারছি না। খুব দ্রুত সময় চলে যায়। সময়ের বরকত পাচ্ছি না। কী করলে সময়ের বরকত পাব?

উত্তর: সময়ের নিয়মের জন্য আল্লাহর নিয়মে চলতে হবে। ফজরের নামায জামাআতের সাথে পড়তে হবে। ফজরের নামাযের পর ঘুমানো যাবে না। এটা হারাম না হলেও সারাদিনের বরকত চুষে ফেলে। আর কোনো বরকত থাকে না। ফজরের আগে তাহাজ্জুদ পড়তে পার না পার, ফজরের নামায জামাআতে পড়তে হবে এবং ফজরের পরে ঘুমানো যাবে না। ঘুমাতে হলে নয়টা দশটার পরে। আগে নয়। তাহলেই বরকত এসে যাবে। নামাযগুলো ওয়াক্তমতো পড়তে হবে। এর বাইরে আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে বরকতের জন্য। ইনশাআল্লাহ বরকত এসে যাবে।

প্রশ্ন-৪৫৯: মাওলানা শব্দের অর্থ তো আমার প্রভু। তাহলে বাংলাদেশের আলিমদেরকে কেন 'মাওলানা' বলা হয়?

উত্তর: মাওলানা শব্দের অর্থ অমন না। মাওলানা শব্দ রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। مَوْلَانَا زَيْدٌ। যায়েদ মাওলানা। মাওলা শব্দ মানুষ, রব, খাদেম, আত্মীয় সবার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। হাদীসে ব্যবহার আছে। কিছু কিছু বিষয় আল্লাহ এবং বান্দা উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। যেমন, সামীউন, বাছীরুন, রাহীমুন, রউফুন– এগুলো বান্দার ক্ষেত্রে, আবার আল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। শোনে, দেখে, মুতাকাল্লিমুন, কালিমুন ব্যবহার করা যায়। কিন্তু আল্লাহর কিছু সিফাত আছে– রাহমানুন, কাইয়ুমুন– এগুলো আল্লাহ ছাড়া [illegible]রা ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় না।

লেখকের প্রকাশিত কয়েকটি বই

০১ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা
০২ এহইয়াউস সুনান: সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ'আতের বিসর্জন
০৩ রাহে বেলায়াত: রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যিকির ও ওযীফা
০৪ হাদীসের নামে জালিয়াতি: প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা
০৫ ফুরফুরার পীর আবু জাফর সিদ্দিকী রচিত আল-মাউযূআত: একটি বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা
০৬ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে, পোশাক, পর্দা ও দেহসজ্জা
০৭ খুতবাতুল ইসলাম: জুমুয়ার খুতবা ও সমকালীন প্রসঙ্গ
০৮ বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত: গুরুত্ব ও প্রয়োগ
০৯ ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ
১০ ইমাম আবু হানিফা (রাহ) রচিত আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা
১১ সিয়াম নির্দেশিকা
১২ ইসলামে পর্দা
১৩ মুসলমানী নেসাব: আরাকানে ইসলাম ও ওযীফায়ে রাসূল ﷺ
১৪ সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর
১৫ সহীহ মাসনূন ওযীফা
১৬ আল্লাহর পথে দাওয়াত
১৭ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শবেবরাত: ফযীলত ও আমল
১৮ সালাতের মধ্যে হাত বাঁধার বিধান
১৯ মুনাজাত ও নামায
২০ বুহুসুন ফী উলূমিল হাদীস (আরবি ভাষায় রচিত)
২১ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পোশাক ও ইসলামী পোশাকের বিধান
২২ তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও কুরআনের আলোকে কুরবানী ও জাবীহুল্লাহ
২৩ কিতাবুল মোকাদ্দস, ইঞ্জিল শরীফ ও ঈসায়ী ধর্ম
২৪ পবিত্র বাইবেল পরিচিতি ও পর্যালোচনা
২৫ মুসনাদ আহমাদ (ইমাম আহমাদ রচিত) বঙ্গানুবাদ, (আংশিক)
২৬ ইযাহারুল হক্ব বা সত্যের বিজয় (আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কিরানবী রচিত), বঙ্গানুবাদ
২৭ ইসলামের তিন মূলনীতি: একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা (বঙ্গানুবাদ)
২৮ ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার (মুফতি আমীমুল ইহসান রচিত হাদীস ভিত্তিক ফিকহ গ্রন্থ), বঙ্গানুবাদ
২৯ A Woman From Desert
৩০ জিজ্ঞাসা ও জবাব (১ম খণ্ড)
৩১ জামায়াত ও ঐক্য
৩২ ঈদে মিলাদুন্নবী
৩৩ হজ্জের আধ্যাত্মিক শিক্ষা
৩৪ রামাদানের সাওগাত
৩৫ সালাত, দু'আ ও যিক্র
৩৬ জিজ্ঞাসা ও জবাব (২য় খণ্ড)
৩৭ জিজ্ঞাসা ও জবাব (৩য় খণ্ড)

আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট, পৌর বাস টার্মিনাল, ঝিনাইদহ-৭৩০০
মোবাইল: ০১৭৮৮৯৯৯৯৬৮
dr.khandakerabdullahJahangir sunnahtrust
www.assunnahtrust.com